জিহাদের ময়দানে হযরত মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

ডক্টর হামিদুল্লাহ্

মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্

... ...

জিহাদের ময়দানে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

মুহাম্মদ লুতফুল হক

অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

জিহাদের ময়দানে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)
মূলঃ মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্
অনুঃ মুহাম্মদ লুতফুল হক

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন ঃ ৮৯
ই. ফা. বা. প্রকাশনা ঃ ১৬৫৮
ই. ফা. বা. গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.৬৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
মাঘ ১৩৯৭
রজব ১৪১১
ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

প্রকাশক ঃ
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে ঃ
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ মোঃ আজিজুর রহমান

দাম ঃ তেত্রিশ টাকা

JEHADER MAIDANE HAZRAT MUHAMMAD (SM) : Hazrat Muhammad (Sm.) in the battlefields, written by Muhammad Hamidullah in English translated by Muhmmad Lutful Haque into Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka. February 1991

Price : Tk. 33·00 U.S. Dollar : 1.50

আমাদের কথা

তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় তোমাদের জানমাল দিয়ে জিহাদ কর—এই চেতনায়ই উদ্ভাসিত হয়ে ইসলামের জিহাদ নীতি প্রবর্তিত হয়েছে। জিহাদের দুটি দিক রয়েছে (১) নফসের সংগে জিহাদ (২) কিতাল বা সশস্ত্র লড়াই। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে সমস্ত সশস্ত্র লড়াইয়ে স্বশরীরে নেতৃত্ব দান করেছেন, তাকে বলা হয়েছে গাজোয়া। আলোচ্য গ্রন্থটিতে বিশেষ বিশেষ গাজোয়ার বিবরণ বিশেষ করে যে সব স্থানে গাজোয়া সংঘটিত হয়েছিলো সে স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও তথ্যবহুল করে উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'দি ব্যাটল ফিল্ড অব প্রফেট মুহাম্মদ (সঃ)'। এটি লিখেছেন মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ। গ্রন্থটির গুরুত্ব বিবেচনা করে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ এর বাংলা তরজমা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অনুবাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন জনাব লুতফুল হক। এই অনূদিত গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পারায় আমরা আনন্দিত। আমরা আশা করি পড়ুয়াদের কাছে যেমন এটি সমাদৃত হবে তেমন এটি ইসলামের ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সহায়ক গ্রন্থ হিসাবেও বিবেচিত হবে।

আল্লাহ্ জাল্লাহ্ শানুহু আমাদের এই প্রয়াস কবুল করুন।

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

লেখকের আরয

১. সমাজে এমন কিছু পণ্ডিত আছেন, যাঁরা রাসূলে করীম (সঃ)-এর জীবন ও কর্মের উপর তীব্র কটাক্ষ করে থাকেন। এ পুস্তকে তাঁদের উগ্র সমালোচনার জবাব দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে অনুসন্ধিৎসু এবং নিরপেক্ষভাবে যাঁরা যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রেক্ষাপটে রাসূলে করীম (সঃ)-এর কর্মকে দেখতে চান, তাঁদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রকৃত সত্যকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

২. সমালোচকদের প্রশ্নের জবাব এবং অনুসন্ধিৎসু মনকে পরিতৃপ্ত করার ব্যাপারে কোন রকম সফলতার দাবি আমি করছি না। শুধু এটুকুই বলব যে, আমি আমার সাধ্যানুসারে সত্যকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এ কাজটি করতে গিয়ে আমি যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি নিয়ে নির্ভরযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ ও পুস্তকসমূহের সাহায্য নিয়েছি।

৩. সামরিক বিভাগের বেশ কিছু সংখ্যক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আমার মত অপেশাদার একজন লেখকের রচনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অন্যান্য ভাষায় পুস্তকটি তরজমার ব্যাপারেও অনুকূল মন্তব্য করেছেন। তবু দুঃখ এই যে, আমার একটি স্বপ্ন এখনো অপূর্ণ রয়ে গেল। আমার একান্ত আশা ছিল যে, রাসূলে করীম (সঃ) ব্যক্তিগতভাবে যে সমস্ত যুদ্ধে শরীক হয়েছেন, সে সব যুদ্ধ ক্ষেত্র সরেজমিনে পরিদর্শন করব। ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় এ ধরনের ২৫টি যুদ্ধের বিবরণ রয়েছে। আমি আশা করি, অনাগত ভবিষ্যতে সমর-বিশেষজ্ঞের একটি দল প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণসহ যুদ্ধ ক্ষেত্রগুলো ব্যাপকভাবে পরিদর্শন করবেন। গোটা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। তাঁদের সহযোগিতায় থাকবেন ঐতিহাসিকবৃন্দ। এভাবেই তাঁরা তৈরী করবেন রাসূলে করীম (সঃ)-এর যুদ্ধের একটি পরিপূর্ণ বিবরণ।

৪. প্রসংগক্রমে এখানে একটি প্রশ্নের প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে। প্রশ্নটি প্রায়ই উত্থাপিত হয় এবং অসচেতন মানুষকে ঠেলে দেয় ভ্রান্তির দিকে। প্রশ্নটি হল একজন নবীর কি যুদ্ধ করা উচিত?

মানব সমাজে যুদ্ধের ইতিহাস একটি বিশাল বিষয়। আলোচনার সুবিধার্থে এখানে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়া যাক। হিন্দু আইনে যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। ওল্ড টেস্টামেন্ট মূলত নবী-রাসূলগণ কর্তৃক আয়োজিত যুদ্ধের কাহিনী সম্বলিত একটি গ্রন্থ এবং হযরত ঈসা (আঃ) যে যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করেছেন এ কথাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। যেমন সেন্ট লুক (১৯২৭) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ "কিন্তু আমার যারা শত্রু, যাদের উপর আমার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না, তাদের এখানে ধরে আন এবং আমার সম্মুখে বধ কর।" সেন্ট পল (করিনথিয়ান্স্-১৫ ঃ ২৫)-এর মত ব্যক্তিত্বও এ বক্তব্যকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, "সমস্ত শত্রুকে পদানত না করা পর্যন্ত তাকে অবশ্যই রাজত্ব করতে হবে।" মেথিউ (১০ ঃ ৩৪) সূত্রে ঈসা (আঃ)-এর আরেকটি উক্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, "ভেবো না যে, ধরা বুকে শান্তি প্রেরণের জন্যে আমি এসেছি; আমি এসেছি তলোয়ার নিয়ে।" এমনকি মার্ক (১২/১-৯) এবং লুক (২০ ঃ ৯-১৬)-এর উপদেশমূলক ছোট গল্পের বক্তব্য অনুসারে যে সব অত্যাচারী সংশোধন হবার নয় তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার অনুমোদন রয়েছে। উপরন্তু পোপেরা ক্রুসেডের নামে যে যুদ্ধের আঞ্জাম দিয়েছিল, ইতিহাসের পাতায় তা চিহ্নিত হয়ে আছে—'পবিত্র বা ধর্ম যুদ্ধ' হিসাবে এটা আলোচনার একটি দিক।

অপরদিকে যুদ্ধকে যদি আনাড়ী অধিনায়কদের উপর ন্যস্ত করা হয় তাহলে যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের কাছ থেকে মানবিক আচরণ খুব সামান্যই প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু যুদ্ধের অধিনায়কত্ব নবী-রাসূলগণের হাতে থাকলে তার প্রকাশ ঘটবে মানবিকভাবে; কারণ তাদের প্রতিটি কাজকর্ম মূলত ঐশী প্রেরণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

বস্তুতপক্ষে সে কারণেই একটি সামরিক বাহিনীর খ্যাতিমান এবং অসাধারণ প্রতিভাধর একজন সেনানায়ক অপেক্ষা সেনাপতি হিসেবে একজন নবীর কার্যাবলী পর্যালোচনা করা মানবতার স্বার্থেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। 'জিহাদের ময়দানে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)' পুস্তকের মধ্য দিয়ে এ পার্থক্যই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

প্যারিস, রবিউল আউয়াল ১৪০০ হিজরী

মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্

অনুবাদকের আরয

দুনিয়ার বুকে কি এমন কোন জনপদ আছে, যেখানে দ্বন্দ্ব নেই, সংঘাত নেই। এমন কে আছে যে যুদ্ধ-বিগ্রহের কোপানল থেকে মুক্ত? বস্তুতপক্ষে পৃথিবীতে এমন কোন জনপদ পূর্বেও ছিল না, এখনো নেই। ধরা বুকে সমাজ পত্তনের সূচনা-লগ্নে হাবিল-কাবিলের মাধ্যমে খুন-জখমের যে সূত্রপাত ঘটে; কালের পরিক্রমায় তা ব্যাপ্তি লাভ করে গোটা বিশ্বজুড়ে। কখনো এটা সীমিত থাকে ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে, কখনো আবার সমাজ রাষ্ট্রের ভৌগোলিক বাধা বন্ধন অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিশ্বে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে সংঘাত। আহত-নিহত হয় অগণিত আদম সন্তান, বিনষ্ট হয় আল্লাহর অপূর্ব নিয়ামত। যারা প্রাণে বেঁচে যায় তারাও বেঁচে থাকে অসহনীয় গ্লানি ও দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে। তবু মানুষ যুদ্ধ করে, যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কখনো স্বেচ্ছায় কখনো বা বাধ্য হয়ে। কেবল মাত্র সাধারণ মানুষের নয়, নবী-রাসূলদেরও যুদ্ধ করতে হয়েছে। শক্ত হাতে তলোয়ার ধরতে হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে। দশ বছরের মাদানী জীবনে তাঁকে উন্মুক্ত প্রান্তরে শত্রুর মুকাবিলা করতে হয়েছে অন্তত ২৫টি যুদ্ধে।

বিভিন্ন সময়ে দুনিয়ার বুকে সংঘটিত হয়েছে অসংখ্য যুদ্ধ। খ্যাতনামা সেনানায়করা ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রয়েছেন নিজেদের সাহস ও শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করে। এ সমস্ত যুদ্ধের কারণে বারবার পাল্টে গেছে বিশ্বের মানচিত্র। ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবয়বে। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অধিনায়ক রাসূলে করীম (সঃ)-এর পরিচালিত যুদ্ধের সংগে অন্যান্য খ্যাতিমান সেনাপতিদের যুদ্ধের রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। এ পার্থক্য যতখানি না যুদ্ধের প্রস্তুতি, কলা কৌশল ও ফলাফলের মধ্যে, তার চেয়ে বেশি রয়েছে মানবিক আচরণ ও মূল্যবোধের ব্যাপারে। বস্তুতপক্ষে

এটাই হল ইসলামের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি। এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই যুদ্ধের ময়দানে শত্রু হাতে তলোয়ার ধরে একজন আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হওয়ার সুযোগ পান, আরেকজন পরিচিতি লাভ করে জালিম হিসাবে। কেবলমাত্র রক্তক্ষয়ী বড় বড় যুদ্ধের বেলায় নয়, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের ছোট খাট দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বেলায়ও এ কথা সত্য। মনোযোগের সংগে জিহাদের ময়দানে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে সাধারণ বিবেকবান যে কোন মানুষের কাছেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পুস্তকটির এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে সাধারণ পাঠকদের সামনে তুলে ধরার নিয়্যতেই পুস্তকটি বাংলা তরজমার উদ্যোগ নিয়েছি।

অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ ইসহাক এবং জনাব শামসুল আলম সাহেবের কাছ থেকেই প্রথম এ পুস্তকটির কথা জানতে পারি। বস্তুত পক্ষে তাঁদের আলোচনায় উৎসাহিত হয়েই পুস্তকটির তরজমার কাজে হাত দেই। অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুমের সম্পাদনা ও পরিমার্জনা এর মানকে উন্নত করেছে। পুস্তকটি প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন মাওলানা আবদুস সামাদ, মাওলানা রবিউল ইসলাম ও জনাব আব্দুর রাজ্জাক। তাঁদের উৎসাহ ও সহযোগিতার জন্যে আমি তাঁদের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ্ আমাদের শ্রমকে ইবাদত হিসাবে কবুল করুন। আমীন।

সূচী

অধ্যায় ১

পূর্বাভাস

বর্তমান শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসামান্য উন্নতির সাথে সাথে যুদ্ধের কলাকৌশল ও রীতিনীতির এতো ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে যে, অতীতের অভিযানগুলো সেকালে যত যুগান্তকারী ঘটনাই হোক না কেন বর্তমানের তুলনায় তা মামুলী বলে মনে হবে। বর্তমান যুগে বৃহৎ শক্তিবর্গের কলমের এক খোঁচায় বিবদমান যে কোন পক্ষে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের সমাবেশ করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। যুদ্ধের মারণাস্ত্রের আকার-আকৃতিতে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে তাতে আমাদের বাল্য বয়েসে যে সব অস্ত্র সবচাইতে বেশি ভয়াবহ এবং মারাত্মক ছিল, সেগুলো এখন যুদ্ধের ময়দানে অপেক্ষা যাদুঘরে রাখার জন্যে অধিকতর উপযুক্ত হয়ে পড়েছে। অনুরূপ পরিবর্তন এসেছে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে। যোগাযোগ ব্যবস্থা, তথ্য সরবরাহ এবং পরিবহন পরিস্থিতি পূর্বের অবস্থায় নেই। এগুলোরও শক্তি, সংখ্যা ও গতিশীলতার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে যে কাজগুলো করতে পূর্বে মাসের পর মাস লেগে যেত, এখন সে কাজগুলো সম্পন্ন করা যায় কয়েক ঘন্টায়, এমনকি কয়েক মিনিটের মধ্যে।

সে কারণেই একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি হয় তো এ রকম একটা ধারণা পোষণ করবে যে, একজন ঐতিহাসিকের কাছে অতীত কালের যুদ্ধের বিবরণ যত গুরুত্বপূর্ণ বা আকর্ষণীয় হোক না কেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাস্তবে তার কোন সামরিক মূল্য নেই। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু সে রকম নয়। উদাহরণ হিসাবে বৃটেনের কথা বলা যেতে পারে। এখনো সেখানে নতুন সৈন্য এবং ক্যাডেটদের প্রথমেই যে পাঠ দেয়া হয় তা হচ্ছে ঃ

"প্রত্যেক অফিসারকে এটা অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে, তাঁরা নিজেরা যে কাজ করে সেটাই হল তাঁদের ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের প্রশিক্ষণ বা অনু-

শীলনে সামরিক ইতিহাসের স্থান সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যুদ্ধের রীতিনীতির প্রকৃত অর্থ এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের এটাই সর্বাপেক্ষা উত্তম মাধ্যম। তাছাড়া যে কোন অভিযানেরই এমন কতগুলো অধিকতর প্রভাব সম্পন্ন বিষয় আছে, যেগুলো মানুষের স্বভাবজাত কারণ থেকে সংগঠিত এবং যেগুলো শিক্ষার ক্ষেত্রে সামরিক ইতিহাস অধ্যয়ন করা খুবই জরুরী। আগেই বলা হয়েছে যে, সামরিক অফিসারদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সামরিক ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতপক্ষে এজন্যেই প্রতি বছর ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ কোর্সে একটি বিশেষ প্রচার অভিযান বা অভিযান চলাকালীন সময়ের একটি বিশেষ অংশকে সাধারণ অনুশীলনের জন্যে নির্বাচন করা হয়। সামরিক ইতিহাস অধ্যয়নের মূল লক্ষ্য হল অতীতের অভিযানগুলোর তথ্য ও বিবরণ থেকে কেবলমাত্র সে শিক্ষাগুলো গ্রহণ করা, যেগুলো বর্তমান সময়েও প্রয়োগ করা যায়। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের জন্যে ইতিহাস পাঠের কোন মূল্য নেই। একটি আধুনিক সামরিক বাহিনীর আকার এবং সৈন্যসংখ্যা, তাদের ব্যবহৃত মারণাস্ত্রসমূহ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা এমন অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছে যে, অতীতের যুদ্ধ সম্পর্কিত জ্ঞান ও শিক্ষাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজকের দিনে প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি এবং যুদ্ধের অন্তর্নিহিত নীতিগুলো বদলায় না এবং সে কারণেই মানবেতিহাসের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অভিযানগুলো থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। (ওয়ার অফিস ট্রেইনিং রেগুলেশন্স, পৃষ্ঠা ২৩, লণ্ডন, ১৯৩৪)।

একজন সমরকুশলী সেনাধ্যক্ষের কাছে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধসমূহের গুরুত্ব

এটা সুস্পষ্ট যে, প্রাচীন কালের অভিযানগুলো যদি যত্নের সংগে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, অধিনায়কগণ কিভাবে যুদ্ধের রীতিনীতিগুলো প্রয়োগ করেছেন এবং এর ফলাফলই বা কি হয়েছিল আমরা যদি তা নির্ধারণ করতে পারি, তবেই অতীতের যুদ্ধ অভিযানসমূহ সম্পর্কে অধ্যয়ন পুরোপুরি কার্যকর হতে পারে। আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনে সংঘটিত যুদ্ধগুলো তাঁকে অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। নবী করীম (সঃ)-এর জীবনে আরো অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য যেমন অতীতে তাঁকে আকর্ষণীয় এবং অতুলনীয় করে তুলেছিল, তেমনি আকর্ষণীয় এবং অতুলনীয় করে

রেখেছে বর্তমান সময়ে। শত্রু পক্ষের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং নিজের বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা শত্রু সংখ্যা প্রায়ই তিনগুণ বেশি থাকত। কখনো কখনো আবার এই সংখ্যা হতো ১২ গুণ, এমনকি তার চেয়েও বেশি। কিন্তু প্রতিটি যুদ্ধে তিনি ছিলেন বাস্তব ক্ষেত্রে বিজয়ী বীর। এবার তাঁর সাম্রাজ্য প্রসংগে আসা যাক। শুরুতে নগর-রাষ্ট্র মদীনার গোটা অংশ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নি। তখন মদীনার গোটা কয়েক রাস্তা ও পাড়ার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর রাজ্য। এরপরই শুরু হয় রাজ্যের বিস্তার। গড় হিসাবে দৈনিক বিস্তারের পরিমাণ ছিল ৮৩০ কিলোমিটারেরও অধিক এবং দশ বছরের রাজনৈতিক জীবন শেষে যখন তিনি ইন্তিকাল করেন, তখন তিনি ছিলেন প্রায় ৩০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক। তার এই রাজ্যের পরিধি ছিল রাশিয়াকে বাদ দিয়ে বর্তমানের গোটা ইউরোপের সমান। সন্দেহ নেই যে, সে আমলেও লক্ষ লক্ষ লোকের বসতি ছিল এতদঞ্চলে এবং যুদ্ধের ময়দানে শত্রু পক্ষের অনধিক ২৫০ জন সৈন্যের রক্তের বিনিময়ে তিনি জয় করেন এই বিশাল অঞ্চল। অপরদিকে দশ বছরের গড় হিসাবে মুসলমানদের পক্ষে প্রতিমাসে ১ জন শহীদ হন। মানবেতিহাস তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও মানুষের রক্তের প্রতি এমন নির্মল সম্মানের দ্বিতীয় কোন নজীর মিলবে না। উপরন্তু কর্তব্য-কর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা, বিজিতদের মনোজগতের আমূল পরিবর্তন, তাদেরকে পূর্ণ আন্তরিকতার সংগে গ্রহণ এবং এই ধারায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা তৈরি করার ফলাফল দাঁড়াল খুবই সুদূরপ্রসারী। মহানবী (সঃ)-এর ইন্তিকালের মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপের লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা নির্যাতন-নিপীড়নের যাঁতাকল থেকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে চলে আসে। এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন চলত মদীনা থেকে। বস্তুতপক্ষে উপরোক্ত পরিস্থিতি এবং অনুরূপ ঘটনাগুলো, মহানবী (সঃ)-এর আমলে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহগুলোর গভীর অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের জন্যে আমাদের মধ্যে তীব্র কৌতূহল সৃষ্টি করে। রাসূলে করীম (সঃ)-এর যুদ্ধ-গুলোর সংগে আমাদের এই জগৎকেন্দ্রিক যুদ্ধগুলোর সংগতি কেবলমাত্র নামকরণে। আর সব ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে রয়েছে প্রচুর প্রভেদ। রাসূলে করীম (সঃ)-এর আমলে সংঘটিত যুদ্ধগুলো থেকেই ফুটে উঠে তাঁর কথার তাৎপর্য ও সত্যতা—"আমি হলাম যুদ্ধের নবী, আমি হলাম দয়ার নবী।"[১]

১. ইবনে তাইমিয়ার আস্ সিয়াসাহ আশ-শরীয়াহ, পৃঃ ৮।

রাসূলে করীম (সঃ)-এর যুদ্ধের ময়দান সম্পর্কে বিবরণ প্রদানে সমস্যাসমূহ

নবী করীম (সঃ)-এর যুদ্ধের ময়দান সম্পর্কে বিবরণ দেয়া খুব সহজ কাজ নয়। কুরআন মজীদে যাকে 'মানব জাতির জন্যে কল্যাণ' (২১ঃ১০৭) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর মাতৃভাষায় (আরবীতে) তাঁর সম্পর্কে অসংখ্য জীবনী রচিত হয়েছে। তাছাড়া বিশ্ব জগতের প্রতিটি উন্নত ভাষায়ই তাঁর উপর লেখা অনেক বই-পুস্তক পাওয়া যাবে। অবশ্য কোনটির কলেবর বড়, কোনটির ছোট। কেউ কেউ তাঁর জীবনী রচনা করেছেন নিরপেক্ষভাবে, অনেকেই আবার কলম ধরেছেন বিরূপ এবং শত্রুতার মনোবৃত্তি নিয়ে। সে কারণেই নবীজীর আমলে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে তথ্যের কোন কমতি নেই। তবু এ কথা সত্য যে, অদ্যাবধি আমি তাঁর যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে সামরিক বিজ্ঞান অথবা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা ভাল কোন বই পড়িনি। অথবা ভাল কোন বইয়ের সন্ধানও জানি না। বস্তুতপক্ষে ১৩০০ বছর পূর্বের যুদ্ধ সম্পর্কে কোন কিছু রচনার জন্যে প্রয়োজন ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং পর্যাপ্ত সামরিক প্রশিক্ষণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি ইতিহাসের ছাত্র নই। এক সময়ে সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্যে প্রার্থী হলেও শারীরিক কারণে আবেদন নামঞ্জুর হয়ে যায়। ফলে সৈনিক জীবন যাপনের সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবু আমি মনে করি যে, একই সাথে ইতিহাস ও সমর বিশারদ কোন বিশেষ ব্যক্তিত্বের অপেক্ষায় থেকে এ জাতীয় পুস্তক রচনার উদ্যোগ পরিহার করলে সেটা হবে নেহায়েত সময়ের অপচয়।

গভীর মনোযোগের সংগে নিয়মিত অধ্যয়ন এবং যুদ্ধের সংগে সংশ্লিষ্ট স্থানগুলো পরপর দু'বার পরিদর্শনের মাধ্যমে আমি বেশকিছু তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের সংগে তা প্রকাশও করেছি। অবশ্য আমার মত একজন অপেশাদার লোকের জন্যে এ ধরনের উদ্যোগ সত্যিকার অর্থেই একটি চ্যালেঞ্জস্বরূপ। কিন্তু সাধারণ পাঠকগণের উপকারার্থে আমি এটা প্রকাশ করিনি। বরং যাঁরা আমার সংগৃহীত তথ্যাবলী সংশোধন ও পরিমার্জন করতে পারেন, ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং মন্তব্য প্রদানে যাঁরা সিদ্ধহস্ত, তাঁদেরকে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করাই আমার লেখনী ধারণের মূল উদ্দেশ্য।

বিগত ৫০ বছর যাবত উপরিউক্ত বিষয়ে কেবলমাত্র ঐতিহাসিক গবেষণা এবং চর্চাই অব্যাহত রাখিনি, বরং এই সুদীর্ঘ সময়ে সংশ্লিষ্ট স্থানগুলো

ভূমধ্যসাগর
সিরিয়া
ইরাক
মাদায়েন
পারস্য
দুমাতুল জান্দাল
তাবুক
খায়বার
মদীনা
মক্কা
তায়েফ
ইয়ামামা
পারস্য উপসাগর
ওমান
নাজরান
ইয়ামন
হাদরা মাউত
আবিসিনিয়া
আরব সাগর
এডেন
মিসর
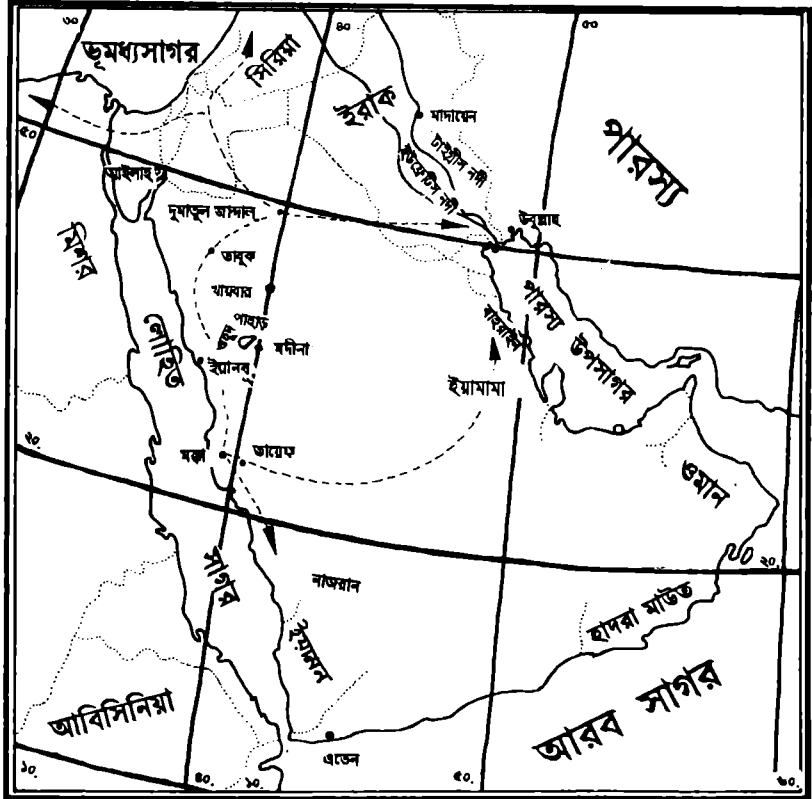
আরবের মানচিত্র

আরও তিনবার সরেযমীনে দেখার পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এমনকি স্বল্প সময়ের জন্যে খায়বর যাওয়ারও সুবর্ণ সুযোগ আমি পেয়েছি। এটা আমার রচিত পুস্তকটির আরও সংশোধন এবং নতুন নতুন তথ্য ও বিষয়বস্তু সংযোজনে সহায়ক হয়েছে। তৃতীয় সফরের সময় সংগৃহীত তথ্যাবলী সংযোজন করেছি ইংরেজি প্রথম সংস্করণে। চতুর্থ ও পঞ্চম সফরের তথ্যাবলী দিয়ে সমৃদ্ধ করেছি এই পুস্তকটিকে। তবু বলতে দ্বিধা নেই যে, এই পুস্তকের আলোচিত সমস্ত বিষয়বস্তুই আগামী দিনের সামরিক বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ কোন মুসলমানের জন্যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও সহায়ক সামগ্রী মাত্র। সংক্ষেপে শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি, তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করুন।

সাধারণ পর্যালোচনা

রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর আল্লাহ্‌র একত্ব প্রচারের বিরুদ্ধে মক্কা ও তায়েফবাসীর প্রতিরোধ

এটা সর্বজনবিদিত যে, রাসূলে করীম (সঃ) হিজরী ১৩ পূর্বাব্দে অর্থাৎ ৬১০ খৃস্টাব্দে হেরা পর্বত গুহায় আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে ঐশী প্রত্যাদেশ বা ওহী লাভ করেন এবং আল্লাহ্‌র একত্ব সম্পর্কে তাঁর এই শিক্ষা প্রচারের কাজ মক্কা নগরীতে আরম্ভ করেন। একদিকে তাঁর এই আহ্বান ছিল সমাজে বিদ্যমান বংশানুক্রমিক পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদস্বরূপ, অপরদিকে তাঁর এই উদাত্ত আহ্বান বা দাওয়াত কবুল করার অর্থ দাঁড়ায় নেতা হিসাবে তাঁকে মেনে নেয়া। অর্থাৎ তাঁকে নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দিলে মক্কা নগরীর লোভনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের পদটি চলে যায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাতে। একথা চিন্তা করেই শহরের নেতৃস্থানীয় এবং প্রভাবশালী ধনাঢ্য পরিবারগুলো এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এমনকি বনু হাশিম-এর বয়স্ক লোকেরা যারা নাকি রাসূল (সঃ)-এর আত্মীয়-স্বজন, তারাও যোগ দেয় তাদের সংগে। রাসূলে করীম (সঃ)-এর আহ্বানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন মক্কার উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা। সাধারণ লোকদেরও বাধ্য করা হল তাদের সংগে যোগ দিতে। তাদের অবস্থা ছিল প্রবল ঝড়ের মুকাবিলায় শুকনো খড়-কুটোর মত।

রাসূলে করীম (সঃ) একটি মাত্র উদ্দেশ্যে তাঁর সমস্ত সময়, শক্তি ও সম্পদ একত্রে নিয়োগ করলেন এবং তা হল সংস্কার আন্দোলনকে জোরদার করা। এমনিভাবে কেটে গেল ৮ থেকে ১০টি বছর। তবু মক্কার মত ছোট শহরে তাঁর সংস্কার আন্দোলনের প্রচেষ্টা বড় একটা কার্যকর হল না। অথচ মক্কা নগরী ছিল তাঁর জন্মস্থল। বরং দিনে দিনে কাফির-মুশরিকদের প্রতিরোধ ও বিরোধিতা তীব্রতর হতে লাগল। এক সময়ে প্রচণ্ড হুমকি এল

তাঁর জীবনের প্রতি। বিরোধী পক্ষের চরম শত্রুতা সত্ত্বেও এমন কিছু লোক ছিলেন যাঁরা সংগোপনে ইসলাম গ্রহণ করলেন। ব্যাপারটা জানাজানি হতেই তাঁদের পরিচিত জন এবং নগরবাসীরা আক্রোশে ফেটে পড়ল। শুরু হল পর্বত প্রমাণ নির্যাতন-নিপীড়ন। তাদের নির্যাতনের মুখে একজন নারীসহ অনেকেই প্রাণ হারালেন, শহীদ হলেন। এই মহিলা ছিলেন আম্মার ইবনে ইয়াসিরের মাতা পামিখ সুমাইয়া। সম্ভবত জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন তুর্কী। (বালাযুরী, আনসার আল-আশ্‌রাফ, প্রথম খণ্ড, ৪৮৯ এবং ৭১৮)। অনেককেই শত্রু পক্ষের অগোচরে দেশ ছাড়তে হল। তাঁরা গিয়ে আশ্রয় নিলেন খৃস্টান রাজ্য আবিসিনিয়ায়।

মুহাম্মদ (সঃ)-এর স্নেহময়ী স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) এবং তাঁর শ্রদ্ধেয় চাচা ও অভিভাবক আবূ তালিব খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে ইন্তিকাল করেন। এই দু'জনকে হারানোর পরই তাঁর উপর নেমে আসে ভীষণ দুর্যোগ এবং অপ্রত্যাশিত কতগুলো সমস্যা। কারণ আবূ তালিবের ইন্তিকালের পর চাচা আবূ লাহাবকে বসান হল কুরায়শ গোত্রের অধিপতির আসনে। গোড়া থেকেই সে ছিল রাসূলে করীম (সঃ)-এর আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ও এক নম্বর শত্রু। এবার শুরু হল আনুষ্ঠানিক ভর্ৎসনা, তিরস্কার ও গালাগাল। অতঃপর তাঁকে সমাজচ্যুত করা হল, বয়কট করা হল। নিরুপায় হয়ে মুহাম্মদ (সঃ)-কে শহর ছাড়তে হল, খুঁজতে হল নিরাপদ আশ্রয়। তাঁর মাতুল কুলের বনু আব্দ ইয়ালিল বসবাস করতেন তায়েফে। (আবূ নুয়াইম, দালালাইল আন-নুবুওয়াহ্ ২০ অথবা আবূ নুয়াইম রচিত আল-মুনতাকা ২০)

কোন কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, রাসূলে করীম (সঃ)-এর ছোট চাচা এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু আব্বাস (রাঃ)-এর তায়েফ অঞ্চলে পোদ্দারীসহ আরও অনেক ব্যবসা ছিল। সে কারণে সেখানে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাছাড়া মক্কা থেকে তায়েফের দূরত্ব খুব বেশি নয়, মাত্র ৫০ মাইল। ১৯৩৯ সালের কোন একদিন বিকেল পাঁচটায় আমি গাধার পিঠে চড়ে তায়েফের পথে রওয়ানা হই এবং কারা পর্বতের পাদদেশে যখন পেঁৗছি তখন মধ্যরাত। পরের দিন খুব সকালে পুনরায় পাহাড়ের উপর দিয়ে যাত্রা শুরু করি এবং সূর্য মধ্য গগনে আসার পূর্বেই পেঁৗছে যাই তায়েফে। উটের পিঠে সওয়ার হয়ে জাইরানাহ্-এর পথ ধরে তায়েফে আসতে সময় লাগে দু'দিন। মোটরগাড়ি চালিয়ে যাওয়ার নতুন পথটি খানিকটা দীর্ঘ। প্রায়

৭০ মাইল। এই পথে ডাক গাড়িতে চড়ে মক্কায় ফিরে আসতে আমার সময় লেগেছিল প্রায় চার ঘন্টা। গ্রীষ্মকালে প্রাচ্যের পার্বত্য স্টেশনের প্রতি আমাদের যেমন একটা আকর্ষণ থাকে, তৎকালীন সময়ে মক্কাবাসীদেরও তায়েফের প্রতি অনুরূপ আকর্ষণ ছিল। কিন্তু রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) তায়েফের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। মুক্তদাস ও গৃহভৃত্য হযরত যায়েদ বিন হারিস (রাঃ)-কে সংগে নিয়ে তিনি তায়েফ সফর করেন। তাঁর ডাকে তায়েফবাসী সাড়া দেবে এমন একটি প্রত্যাশা তাঁর ছিল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা দাঁড়াল সম্পূর্ণ উল্টো। অপরিচিত জনদের চাইতেও তায়েফে বসবাসকারী তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা অধিকতর খারাপ ব্যবহার করলো। আসলে মক্কা-বাসীদের তুলনায় তায়েফের লোকেরা ছিল অধিকতর বস্তুবাদী। তৎকালীন সময়ে মক্কা ছিলো তায়েফের উৎপাদন-সামগ্রীর একচেটিয়া বাজার। প্রতি বছর গ্রীষ্ম মৌসুমে মক্কার ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তায়েফের পার্বত্য অঞ্চল সফর করতো। এটা ছিলো তাদের জন্যে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এই সুযোগে তায়েফবাসীরাও উপার্জন করত প্রচুর অর্থ। সম্ভবত সে দিকটি বিবেচনা করেই মুহাম্মদ (সঃ)-এর আহবানে সাড়া দিয়ে অথবা তাঁর প্রতি সদয় হয়ে তায়েফবাসীরা মক্কা বাসীদের বিরক্তি ভাজন অথবা তাদের ক্ষিপ্ত করতে চায়নি। তাছাড়া আল্লাহ্র একত্বের আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে মক্কায় যে অসুবিধা ছিল তায়েফেও বিরাজ করছিল সেই একই অবস্থা। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং ক্ষমতাবানরা তাঁর আহবানের মধ্যে যেন অশনিসংকেত শুনতে পেল। তাঁরা এই সংস্কার আন্দোলনকে গ্রহণ করল তাদের কায়েমী স্বার্থ, ক্ষমতা ও মান-সম্মানের মুকাবিলায় একটি প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ বা ভীতি হিসাবে। রাসূলে করীম (সঃ) যে মিশন নিয়ে মক্কা থেকে তায়েফে এসেছিলেন অন্তত তা প্রকাশ না করার জন্যেও তিনি মাতৃপক্ষের আত্মীয়-স্বজনদের অনুরোধ করেন। কিন্তু নবী করীম (সঃ)-এর সেই অনুরোধটুকুও বিফলে গেলো।

রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর স্মরণীয় সেই সফরের সংগে যে সমস্ত বাগান এবং স্থানের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, তায়েফে সেগুলো এখনো সযত্নে সংরক্ষিত হচ্ছে। তায়েফের দুষ্ট ছেলেরা যখন দলবেঁধে তাঁর পিছু নিল, অবিরাম পাথর ছুঁড়ে তাঁকে ও তাঁর সফরসংগী যায়েদ বিন হারিসকে আহত ও রক্তাক্ত করল, তখন তাদের নিষ্ঠুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভের আশায় যে বাগানে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন, এখনো তায়েফে সেই বাগানটি দেখতে পাওয়া যাবে। জানা যায় যে, এই বাগানের মালিক ছিলেন খুবই সদাশয়। তিনি নবী

করীম (সঃ)-কে আশ্রয় দেন। তাঁর এক ভৃত্যের নাম আদ্দাস, সে ছিলো খৃস্টান। আদ্দাসকে দিয়েই তিনি নবী করীম (সঃ)-কে আংগুর ফল দিয়ে আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। তায়েফের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ওয়াজ উপ-ত্যকার দিকে প্রবাহিত নদীর তীরে এই বাগান ও কৃষি ক্ষেত্রটি অবস্থিত। এটাকে বর্তমানে দেয়াল দিয়ে ঘিরে শহরের বাইরে রাখা হয়েছে। ১৯৩৯ সালে নবী করীম (সঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলোতে ছোট ছোট মসজিদ নির্মাণ করে তাঁর স্মৃতি ধরে রাখার আয়োজন করা হয়। অবশ্য অধিকাংশ মসজিদের এখন সংস্কার প্রয়োজন।

মক্কার অদূরে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক মেলায় রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর আহবানের প্রতি সমবেত জনগণের বিদ্বেষী মনোভাব

রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর তায়েফ সফর এতটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল যে, মক্কার মাটিতে সমাজচ্যুত হয়েও তিনি মক্কায় ফিরে আসাটাই শ্রেয় মনে করলেন। তিনি মক্কার সীমান্তবর্তী এলাকায় পৌঁছে স্থানীয় বিশিষ্ট অমুসলিম ব্যক্তিবর্গের সংগে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের নিকট থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার জন্যে উপর্যুপরি চেষ্টা চালান। সাধারণত আরবদের আত্মমর্যাদাবোধ এত প্রবল ও তীক্ষ্ণ যে, যে কেউ এ ধরনের সাহায্য প্রত্যাশা করুক না কেন, তারা কখনো তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। এমনকি নিজের জীবন বিপন্ন হওয়ার সমূহ আশংকা থাকলেও তারা এ ধরনের অনুরোধে সাড়া না দিয়ে পারে না। কিন্তু মহানবী (সঃ)-এর সত্যের আহবানকে কেন্দ্র করে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যে, একজন হৃদয়বান এবং অসাধারণ ব্যক্তি-ত্বের পক্ষেও নবী করীম (সঃ)-এর অনুরোধের প্রতি মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করাটাও দুষ্কর হয়ে পড়ে। অবশেষে নবীজীর তৃতীয় উদ্যোগ সফল হল। মুতীম ইবনে আদী এবং তাঁর ছেলেদের কড়া প্রহরায় তিনি নিরাপদে কাবা ঘরে যান এবং সালাত আদায় করেন। সেখান থেকে তিনি চলে আসেন নিজের গৃহে। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৫১, ইউরোপিয়ান সংস্করণ) অবশ্য এই নিরাপত্তা প্রাপ্তির বিনিময়ে তাঁকে ওয়াদা করতে হয়েছিল যে, তিনি মক্কা নগরীতে প্রকাশ্যে এবং জনসমক্ষে প্রচারের কাজ থেকে বিরত থাকবেন। এমনিভাবেই নবী করীম (সঃ)-এর মিশনের দশটি বছর অতিক্রান্ত হল।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই সেখানে তীর্থযাত্রার প্রথা চালু ছিল। এ ছাড়া মক্কার অদূরে উকায, মাজান্নাহ, যুল মাযায প্রভৃতি স্থানে বসতো

বার্ষিক মেলা। মক্কার কেন্দ্রস্থল থেকে দুই কি তিন মাইল পূর্বে অবস্থিত মিনায় তীর্থযাত্রীদের সমাবেশ ঘটতো। এখানে তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাস পর হিজরী-পূর্ব তৃতীয় বছরে যিলহজ্ব মাসে তিনি মিনার তীর্থ কেন্দ্রে গিয়ে উপস্থিত হন। এখানকার তীর্থযাত্রীরা এসেছিলেন আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে। রাসূলে করীম (সঃ) একে একে অন্তত ১৫টি দলের সংগে অতি গোপনে সাক্ষাৎ করেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৮২—৩. ইবনে সা'দ ১/১, ১৪৫, আবু নুয়াইম, আল-মুনতাকা ১০৫—১৭, দালায়াইল আন-নুবুওয়াহ্ পৃঃ ১০০—১০৪) একদিকে তিনি তীর্থযাত্রীদের কাছে তৌহিদের বাণী তথা ইসলামের আদর্শ-উদ্দেশ্যর ব্যাখ্যা তুলে ধরেন, অপরদিকে তিনি তাদেরকে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করার, তাদের দেশে নিয়ে যাওয়ার এবং সেখান থেকে দাওয়াতের কাজ পূর্ণোদ্যমে শুরু করার জন্যে অনুরোধ জানান। সবশেষে তিনি তাদেরকে এই ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন যে, যাঁরা তাঁর অনুসরণ করবেন, ইসলামের রীতিনীতি ও আদর্শ মেনে চলবেন, পারস্য সম্রাট খসরু এবং রোমান সম্রাট সীজারের সম্পদরাজি তাঁদের দখলে চলে আসবে। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৭৮) তখন তাঁর এই কথাগুলো সকলের কাছে খুবই হাস্যকর মনে হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে লোকজনে ব্যংগ-বিদ্রুপ করে টিপ্পনী কাটত, অনেকেই আবার সরাসরি নবীজীকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করত। কেউ কেউ আবার বিনয়-নম্র কণ্ঠে ক্ষমাসুলভ ভংগীতে বলত—মক্কার কুরায়শদের সংগে শত্রুতা সৃষ্টি করার মত দুঃসাহস তাদের নেই।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন অপরিসীম ধৈর্যশীল ও অধ্যবসায়ী। এক এক করে তিনি ১৫টি তীর্থযাত্রী দলের সংগে কথা বললেন। তাদের কাছে পৌঁছে দিলেন তাঁর দাওয়াত। কিন্তু প্রতি বারেই একজন কাফির কুরায়শ সারাক্ষণ তাঁর পেছনে লেগে থাকত। আসলে এই লোকটি ছিল নবীজীর আপন চাচা আবু লাহাব। সে ছায়ার মত নবীজীকে অনুসরণ করত। প্রিয়নবী (সঃ) কোন গোত্র বা দলের সংগে কথা বললেই আবু লাহাব তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলত যে, 'সে তো বদ্ধ পাগল, একজন যাদুকর। ওর কথায় আমল দেয়া একেবারেই নিরর্থক।' একই সময়ে সে এসব কথা বলে মক্কাবাসীদের জন্যে একটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে। (ইবনে হিশাম, ২৮২)

মিনা শহর
কূয়া
মসজিদ
মক্কার পথ
মানচিত্রে আকাবা এর স্থানটি দেখান হয়েছে।
বাম প্রান্তের বৃত্তাকার স্থানটিতেই ঐতিহাসিক
আকাব-এর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এখানকার
ঐ মসজিদটি "মসজিদে আশারা বা দশজনের
মসজিদ হিসাবে পরিচিত। খলিফা মনসুরের
আমলের একটি লিপি এখনো এখানে সংরক্ষিত
আছে।
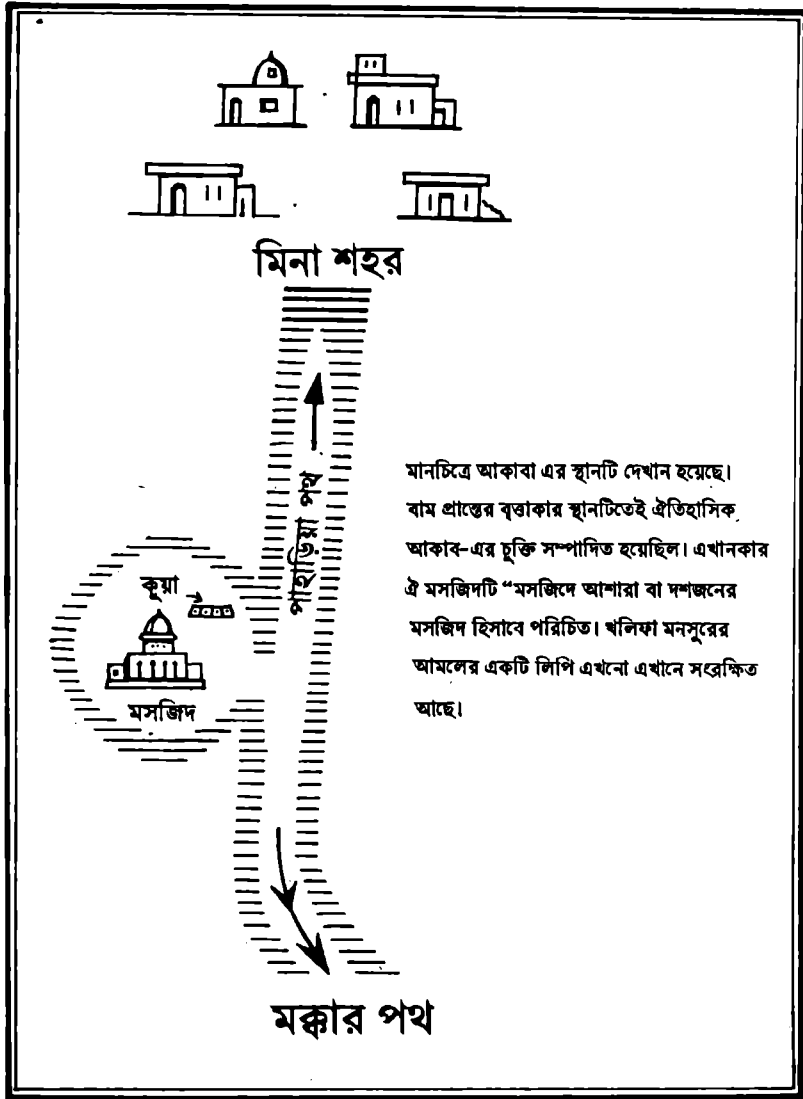
আকাবার অবস্থান এবং আকাবা চুক্তি

মক্কা থেকে মিনার দিকে আসতে মিনার সমতল ভূমির কাছাকাছি রাস্তার দু'পাশে রয়েছে সুশৃংখল পর্বতমালা। এগুলো এমনভাবে আকাশের দিকে উঠে গেছে যে, এগুলোকে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রাচীরের মত মনে হয়। মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার পরে এবং মিনায় প্রবেশের ঠিক এক ফার্লং পূর্বে রাস্তার বাম পাশের পার্বত্য দেয়াল খানিকটা বাঁকা হয়ে গেছে। বাঁকা অংশটি দেখতে অনেকটা অর্ধ বৃত্তাকার বা ধনুকের মত। এই অংশটি এত প্রশস্ত যে, দিল্লীর জুমা মসজিদ বা লণ্ডনের সেন্ট পলের গির্জা এর মধ্যে সহজেই স্থান সংকুলান হতে পারে। অর্ধ বৃত্তাকারের এই স্থানটিকে বলে আকাবা। আকাবার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে গিরিপথ। অর্থাৎ সমান্তরাল দুটি পর্বতের মধ্য দিয়ে একটি পথ যখন উপরের দিকে উঠে যায়, তখন তাকে বলে আকাবা। আর সঠিক অর্থে একে 'আকাবার সন্নিকটে' বলাই অধিকতর যুক্তিসংগত। প্রথম যুগের ঐতিহাসিকগণ এই স্থানকে বলতেন 'ইন্দ-আল-আকাবা'।

আকাবার অর্ধবৃত্তের মধ্যে বড় একটি কুয়া আছে এবং এই কুয়ার জন্যে এলাকাটি চাষাবাদে খুবই সমৃদ্ধ। আকাবার যে স্থানে রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, সুদূর অতীতকাল থেকে মাঝারি আকারের একটি মসজিদ সে স্থানের স্মৃতি বহন করছে। মসজিদে রক্ষিত 'কুফিক' শিলা-লিপিগুলো থেকেই এর প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়। মুহাম্মদ আলফার কিছু কিছু শিলালিপির পাঠ উদ্ধার করেছেন এবং তাঁর গবেষণার ফসল তুলে ধরেছেন 'আল-খাত্তাল-আরাবী' শীর্ষক একটি আরবী প্রবন্ধে। (রিসালা আল-মসজিদ, মক্কা, ১/২, ১৯৭৯, ৭৯—৯৩) মসজিদের উপরে কোন ছাদ নেই। আছে শুধু চারপাশের দেয়াল। ১৯৪৭ সালে শেষ বারের মত যখন আকাবা সফর করি তখনও মসজিদটি ঐ অবস্থায় ছিল। বর্তমানে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে মসজিদটির পরিচয় মসজিদ আল-আশারা (দশ জনের মসজিদ) হিসাবে। যা হোক, এটা যে আকাবা চুক্তির মসজিদ তাতে কোন সন্দেহ নেই। মক্কার ইতিহাসের উপর খ্যাতনামা ঐতিহাসিক তকী আদ-দীন আল-ফসী পবিত্র মক্কা নগরীর উপর রচিত তার গ্রন্থ 'তহসিল আল-মারাম ফী আখবার আল-বালাদ আল-হারাম' (পাণ্ডুলিপি কারাউইইন ফেস)-এর তৃতীয় সংস্করণেও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"আর এ চুক্তির মসজিদ...এই মসজিদ মিনার গিরিপথের (আকাবা) সন্নিকটে অবস্থিত এবং আকাবা থেকে মসজিদের দূরত্ব খুবই সামান্য। মক্কা থেকে মিনার পথে হাতের বাম দিকে এর অবস্থান। ১৪৪ হিজরীতে খলীফা আল-মনসুর এটি নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে ৬২৯ হিজরীতে আব্বাসীয় খলীফা আল-মুনতাসির এই মসজিদের সংস্কার করেন।"

সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, আকাবার বাঁকটি এত বড় ছিল যে, পথযাত্রীদের দৃষ্টি এড়িয়ে ২০-৫০ জন লোক অনায়াসেই সেখানে মিলিত হতে পারত। এখানেই রাসূলে করীম (সঃ) মদীনার জনাছয়েক তীর্থযাত্রীর সংগে মিলিত হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁরা কি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে এখানে ছাউনি ফেলেছিলেন অথবা প্রিয় নবী (সঃ)-এর সংগে কথা বলা, নাকি তাঁর কথা শোনার জন্যেই আকাবার বাঁকে মিলিত হয়েছিলেন তা স্পষ্ট নয়। তবে এই দলটি ছিল অন্যান্য দলের চেয়ে স্বতন্ত্র। তাঁরা গভীর মনোযোগের সংগে ইসলামের আহবান এবং আল্লাহ্‌র একত্ব সম্পর্কিত প্রিয়নবী (সঃ)-এর কথা-গুলো শোনেন। অতঃপর প্রিয় নবী (সঃ)-এর এই কথাগুলোকে সাদরে গ্রহণ এবং তাঁর সংগে সহযোগিতা করাকে জরুরী বলে মনে করলেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৮৬)

কিন্তু প্রশ্ন হল, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রতি এই দলটি কেন সহানুভূতি-সুলভ আচরণ করল? অপর আরবদের চেয়ে এই দলটির চিন্তার পার্থক্য হল কেন? তাঁরা ছিলেন মদীনার খাযরাজ গোত্রের লোক এবং রাসূলে করীম (সঃ)-এর নানীও ছিলেন এ গোত্রেরই মহিলা। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ১০৭) আমা-দের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যখন বয়সে কেবল মাত্র একজন বালক তখন তিনি মায়ের সংগে খাযরাজ গোত্রে বেড়াতে আসেন এবং বেশ কিছুদিন এখানে অবস্থান করেন। এখানে তিনি বনু আল-নাজ্জার-এর সুবিস্তৃত কূপে ভালভাবে সাঁতার শেখার সুযোগ লাভ করেন। (সিরাহ্ শামিয়াহ্) তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ছোট চাচা আব্বাসকে সিরিয়া যেতে হত। যাত্রা বা ফিরতি পথে প্রতিবারেই মদীনার খাযরাজ গোত্রের আতিথ্য গ্রহণ করতেন এবং এখানে কাটিয়ে দিতেন বেশ কয়েকটা দিন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৯৪) এভাবেই তিনি খাযরাজ গোত্রের আত্মীয়তার সম্পর্ককে সজীব রাখেন। উপরন্তু খাযরাজ গোত্রের সংগে স্থানীয় কতগুলো য়াহূদী গোত্রের মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল। আবার অনেকের সংগে তাদের সম্পর্ক

ছিল শত্রু ভাবাপন্ন। ফলে সব সময় তারা একথা শুনত যে, য়াহুদীরা একজন নবীর আগমনের অপেক্ষায় আছে। নবীকে অনুসরণ করার ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ও দৃঢ় এবং নবীর নেতৃত্বেই সমস্ত শত্রুকে তারা বশে আনবে। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৮৬) খাযরাজ গোত্রের এই দলটি ভাবল যে, নবীর আগমন যখন নিশ্চিত ও সম্ভাবনাপূর্ণ, তাঁকে আগেভাগে মেনে নিয়ে সম্মান ও বিজয়ের দাবী-দার হইনা কেন? একবার রাসূল (সঃ)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব এবং তাঁর চাচা নওফেল মস্তবড় এক বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। মক্কায় বিরাজ করতে থাকে চরম উত্তেজনা। তখন মদীনার খাযরাজ গোত্র আবদুল মুত্তালিবের পক্ষে সামরিক সাহায্য নিয়ে মক্কায় ছুটে আসেন। (তাবারী, ইতিহাস-১, পৃঃ ১০৮৪-৮৬) আকাবার চুক্তি সম্পাদনকালে মদীনার আউস গোত্রের সংগে খাযরাজ গোত্রের বিবাদ চলছিল। সম্ভবত তারা আউস গোত্রের বিরুদ্ধে রাসূলে করীম (সঃ)-এর বংশের সাহায্য-সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছিল।

মূল কারণ বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যাই থাক না কেন, প্রকৃত পক্ষে তারা আল্লাহ্র রহমত দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং তাদের বিচার-বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি তাদেরকে অবিলম্বে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিলো।

মদীনার আরব গোত্রসমূহের জাতিগত বিবাদ ছিল খুবই মারাত্মক। একবার শুরু হলে সহজে তা শেষ হত না। আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে বংশ পরম্পরা ধরে বিদ্যমান বিবাদ ও খুন-খারাবীর মূলেও ছিল এই একই কারণ এবং উভয় গোত্রই এতদিনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, নিঃশেষ হয়ে আসছিল তাদের শক্তি ও মনোবল। উভয় পক্ষের শান্তিপ্রিয় এবং চিন্তার দিক থেকে প্রকৃতিস্থ লোকেরা যে কোন মূল্যেই হোক না কেন, যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই বিবাদের সমাপ্তি টানার জন্যে উদগ্রীব ছিলো। তারা তৈরী ছিল পারস্পরিক সম্পর্ক সুসংহত করার জন্যে। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৮৭) এটা স্পষ্ট যে, তাদের মধ্যকার ঈর্ষা এবং বাদ-বিসংবাদের কারণে একজন নিরপেক্ষ এবং মদীনার অধিবাসী নয় এমন ব্যক্তির পক্ষে উভয় দলকে একতাবদ্ধ করার সম্ভাবন বেশি ছিল। সকলের মধ্যে তার পক্ষেই শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করা সহজতর হয়ে উঠে।

ইসলাম বিস্তারের সূচনা এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

ইসলাম গ্রহণ করার পর খাযরাজ গোত্রের সেই ছয় ব্যক্তি মদীনায় নিজেদের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন। মদীনায় ফিরে আসার পর পরই শুরু

হল নতুন ধর্ম সম্পর্কে দাওয়াতের কাজ। অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ কিছু লোককে ইসলাম কবুল করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হলো। পরবর্তী বছরে হজ্জ মৌসুমে ১২ জন লোক মক্কায় আসেন। তাঁরা মক্কায় এসে ছিলেন আউস ও খাযরাজ গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে। পূর্ববর্তী বছরে যে ছয়জন ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন এই প্রতিনিধি দলে—রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর সংগে তাঁরা দেখা করেন মিনার নিকটবর্তী আকাবায়। তারা নিজে-দের ও পরিবারের তরফ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট আনুগত্য প্রকাশ করেন। রাসূলে করীম (সঃ) তাঁদেরকে নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ্র একত্বের প্রতি ঈমান আনার, নৈতিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার নীতিকে সমুন্নত করার এবং প্রতিটি ভাল কাজে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর অনুগত থাকার নির্দেশ দেন। [ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৮৯, ৩০৫, ইবনে হাম্বল (১ম সংস্করণ) তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৪১]

এভাবেই এক ধরনের সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) মদীনার অন্তত ১২ টি পরিবারের প্রধান এবং নেতৃত্বের দায়িত্ব লাভ করলেন। নও-মুসলিমগণের অনুরোধক্রমে তিনি মক্কার একজন মুসলমানকে তাঁদের সংগে মদীনায় যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি হবেন তাঁদের শিক্ষক। মদীনার মিশনারী কার্যক্রম থাকবে তাঁর তত্ত্বাবধানে। তাছাড়া তিনি নও-মুসলিমগণকে নতুন ধর্ম ইসলামের রীতিনীতি, আচার-আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে শিখাবেন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৮৯) মক্কা থেকে আগত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত দাওয়াতী কর্মসূচীর ফলে নও-মুসলিমগণের সংখ্যাই বৃদ্ধি পেলো। উপরন্তু তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা এবং লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার কারণে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, নও-মুসলিমগণ পরস্পরের প্রতি সর্বান্তকরণে সহযোগিতা প্রদানের জন্যে উম্মুখ থাকলেন। এমনকি আউস ও খাযরাজের মত চির বিবদমান দলের লোকেরাও ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার পর অনুরূপ আচরণ প্রদর্শন করলেন।

এমনিভাবে কেটে গেল একটি বছর। প্রথম হিজরী সালের পূর্বের বছর মদীনা থেকে ৫০০ জনের একটি দল মক্কায় এলেন হজ্জ করতে। তাঁদের মধ্যে মহিলা ও পুরুষ মিলিয়ে ৭৩ জন ছিলেন মুসলমান। মদীনায় কর্তব্যরত সেই শিক্ষকও ছিলেন এই দলে। তাঁরা মক্কায় এসেছিলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে তাঁদের ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জানাতে এবং তাঁদের মরূদ্যানে যাবার জন্যে দাওয়াত দিতে। অথচ তখনো মদীনায় ইসলাম ছিল সংখ্যালঘু

লোকের ধর্ম এবং মদীনার হজ্জযাত্রী দলের বেশির ভাগ লোকই মক্কায় এসেছিল সাধারণ কুরায়শদের সংগে একটি সাময়িক মৈত্রী স্থাপনের প্রত্যাশায়। চন্দ্রালোকিত রাত যখন গভীর তখন মদীনার মুসলমানগণ এক এক করে দল থেকে সরে পড়েন। তাঁরা সমবেত হলেন পবিত্র আকাবার সেই স্থানে। পূর্ব নির্ধারিত সময়ে রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)ও এসে হাজির হলেন সেখানে। সংগে এলেন পার্থিব জগতের বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পর্কে অভিজ্ঞ চাচা আব্বাস (রাঃ)। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর মিশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। প্রতি উত্তরে মুসলমানগণও উচ্চকণ্ঠে তাঁদের ঈমান সম্পর্কে ঘোষণা দিলেন। সাক্ষ্য দিলেন তাঁর মিশনের সত্যতার বিষয়ে। অতঃপর তাঁরা নবীজীকে এবং মক্কায় অবস্থানরত অনুসারিগণকে (তফসীরে তাবারী, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৬৩) মদীনায় হিজরত করার জন্যে সবিনয় আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁরা আরো নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন যে, "আপনি যদি হিজরত করেন, তাহলে আমরা যেভাবে আমাদের পরিবার-পরিজনদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি, তেমনিভাবে আপনারও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেব।" মদীনার নও-মুসলিমগণকে যখন সতর্ক করে বলা হলো যে, এ ধরনের একটি কাজের ফলশ্রুতিতে গোটা বিশ্বের সংগে তোমাদের যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে, তখনো তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকলেন এবং সমস্ত দ্বিধা-সংশয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন যে, তাঁরা কখনো তাঁদের ওয়াদা থেকে পশ্চাদপসরণ করবেন না। চুক্তিতে সম্মতি জানিয়ে নবী করীম (সঃ) এক এক করে সকলের সংগে হাত মিলালেন এবং বললেন ঃ এখন থেকে আমিও তোমাদের মাঝে অবস্থান করছি। তোমাদের রক্ত, আমার রক্ত অভিন্ন এবং তোমাদের প্রশান্তি আমার প্রশান্তি। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৯৭) অতঃপর তিনি নও-মুসলিম গণকে প্রতি গোত্রের জন্যে একজন করে গোত্রপ্রধান নির্বাচন করতে বললেন। ১২টি গোত্রের জন্যে ১২ জন গোত্র প্রধানের নাম পেশ করা হলো। নবীজী তাঁদের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৯৭) সবশেষে তিনি ১২ জন গোত্রপ্রধানের নেতা হিসাবে একজন গোত্রপ্রধানকে মনোনীত করলেন। (বালাযুরী, আনসাব, সংস্করণ-১, কায়রো, পৃঃ ২৫৪/আসাদ ইবনে যুরারাহ্)

ইহাই সেই ঐতিহাসিক চুক্তি যা জনশক্তি, ভৌগোলিক সীমারেখা এবং সংগঠনসহ স্পষ্টতই একটি ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল। কুরায়শরা যখন এই চুক্তির কথা জানতে পারল তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হল। এই চুক্তিকে তারা গ্রহণ করল একটি প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ

এবং তাদের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত জোট হিসাবে। কিন্তু মদীনার অমুসলিম তীর্থ যাত্রীদের কাছে গোটা বিষয়টি ছিল অজ্ঞাত। তারা উপর্যুপরি কুরায়শদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল। অস্বীকার করল কোন প্রকার মৈত্রী চুক্তির অস্তিত্বকে।

ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধির কারণে মক্কার কুরায়শদের মধ্যে বিরক্তি ও উত্তেজনার সৃষ্টি

মক্কার মুসলমানগণ কখনো প্রকাশ্যে কখনো আবার গোপনে মাতৃভূমি ছেড়ে দেশান্তরে যেতে শুরু করে। অনেকে আবার কুরায়শদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের যাঁতাকল থেকে পালিয়ে যায়। ফলে দিনে দিনে কুরায়শদের উত্তেজনা বাড়তে থাকে।

বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে মক্কাবাসীরা সকল প্রকার বাদ-বিসম্বাদ হতে বিরত থাকত। তারা বিশ্বাস করত যে, এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত বিরতির সময়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই সময়টাকে মক্কার মুসলমানগণ ঘর-বাড়িগুলোকে অক্ষত এবং নিরাপদে রেখে অন্যত্র চলে যাওয়ার কাজে ব্যবহার করেছেন। এদিকে মক্কাবাসীরা মুসলমানগণের স্বদেশ ছেড়ে দেশান্তরে গমন করল। অনেকে গিয়ে সমবেত হল তাদের বাণিজ্য পথের উপরে অবস্থিত মদীনায়। অবশ্য রাসূল পরিবারের অনেক সদস্য ছিলেন ভীষণ রকমের মক্কাকেন্দ্রিক। এদের মধ্যে অনেকে আবার শহরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যেমন আব্বাস (রাঃ) ছিলেন পবিত্র যমযম কূপের প্রধান। ইসলামের একজন ঘোর শত্রু আবু লাহাব ছিল গোত্রপ্রধান। ফলে তাদের পক্ষে মাতৃভূমি মক্কা পরিত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। তৎ সত্ত্বেও মদীনায় মুসলমানদের সমবেত হওয়াকে মক্কার কাফিররা বিরূপ চোখে দেখল। এ ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভংগিও ছিল ভীষণ রকমের কঠোর। কুরায়শরা তখন রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবন নাশের ব্যাপারে ভয়ানক রকমের এক ষড়যন্ত্র পাকাতে শুরু করে। ফলশ্রুতিতে কোন রকম শান্তি স্থাপন বা ধৈর্য ধারণ করার ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকুও নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এটা ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের একটি প্রকাশ্য যুদ্ধ তৎপরতা। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৩২৩)

রাসূলে করীম (সঃ)-ও এমন এক সময় নিজের বসতবাটি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হলেন যখন প্রকৃত অর্থেই কাফির-মুশরিকরা তাঁর গৃহকে

অবরোধ করে ফেলেছে এবং তারা এসেছে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে হত্যা করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে। (ইবনে হিশাম, ৩২৭) ইবনে হাম্বল (১-৮৪) এবং অন্যদের মতানুসারে হযরত আলী (রাঃ)-কে নিয়ে তিনি প্রথমে কাবা ঘরে যান। সেখানে কাবার চূড়ায় স্থাপিত কুরায়শদের প্রধান মূর্তিটি ধ্বংস করেন। অতঃপর তিনি মক্কা নগরী পরিত্যাগ করেন। যাত্রা পথে তিনটি রাত অতিবাহিত করেন সওর গুহায় এবং শহরের উত্তেজনা প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি এখানেই অবস্থান করেন। অবশেষে রবিউল আউয়াল মাসের ১ তারিখে মদীনার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। পথ চলার জন্যে তিনি এমন একটি সড়ক বেছে নিলেন, যে সড়ক দিয়ে লোকেরা সচরাচর যাতায়াত করে না। এক নাগাড়ে পথ চললেন ১২টি রাত। অবশেষে তিনি পৌঁছে গেলেন নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে। নবীজী মদীনায় পৌঁছার পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গেল মক্কা থেকে তার অন্তর্ধানের খবর এবং মদীনার মুসলমানরা সহজেই তাঁর গন্তব্যস্থল সম্পর্কে অনুমান করে নিলেন। তারপর থেকেই চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এবং আশা-নিরাশার মধ্য দিয়ে কাটতে থাকে তাঁদের দিনগুলো।

মদীনার দক্ষিণ প্রান্তের একটি গ্রামের নাম কুবা। একদিন কুবার লোকেরা বেশ খানিকটা দূরে দুটি উটের ছোট একটি মরুযাত্রীদল দেখতে পেলেন। প্রখর রোদের মধ্য দিয়ে তাঁরা এগিয়ে আসছে শহরের দিকে। এবার তাঁদের দেখায় কোন রকম ভুল হয় নি। তাঁরা দেখলেন, এই দলে রয়েছেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং তাঁদের পথ চলায় সাহায্য করছেন ভাড়া করা একজন পথপ্রদর্শক বা রাহাবার। তাদের ধর্ম এবং রাষ্ট্রের মহাননেতা রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর আগমনে কুবার অধিবাসীরা যে কতখানি উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ। নারী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ সবাই পরিধান করেছেন উত্তম পোশাক, হাতে নিয়েছেন তলোয়ার এবং দলে দলে সমবেত হয়েছেন মদীনার দক্ষিণ প্রান্তের একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়ের পাদদেশে। গৌরবময় স্মৃতির স্মরণার্থে এই পাহাড়টিকে বলা হয়, 'ছানিয়াতুল বিদা'। যে ভালবাসা ও আন্তরিকতা নিয়ে তাঁরা মহান নেতাকে খোশ আমদেদ জানানোর জন্যে সমবেত হয়েছিলেন—মানব ইতি-হাসে তার দ্বিতীয় নজীর খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রিয়নবী (সঃ)-কে খোশ আমদেদ জানিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দফ্ বাজিয়ে গাইতে লাগলো ঃ "পূর্ণ চন্দ্র উদিত হয়েছে আমাদের উপর 'ছানিয়াতুল বিদা' থেকে/জরুরী

আমাদের জন্যে শুকরিয়া জানানো/যতক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করে আল্লাহ্‌র কাছে।/ হে আমাদের প্রতি প্রেরিত পুরুষ/আপনি এমন বিষয় নিয়ে এসেছেন যা আমাদের মানতেই হবে।"

কোন কোন আরব ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, মদীনায় যাওয়ার সময় পথিমধ্যে রাসূলে করীম (সঃ) বুরায়দা আল-আসলামী এবং তাঁর কয়েক-জন সংগী-সাথীর সাক্ষাৎ পান। তাঁরাই নবীজীকে শোভাযাত্রা সহকারে এবং তাঁর দেহরক্ষী হিসাবে তাদের প্রহরায় নিয়ে আসেন। (ইবনে কাসীর, বিদায়া, ২১৬-৭, মাকরিযী, ইমতা, ১মঃ ৪২-৩, সিরাহ্ শামিয়াহ্) কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাসূলে করীম (সঃ)-এর মদীনার বাইরে অবস্থানকালীন বর্ণনায় বুরাইদা আল-আসলামী-এর সংগী-সাথীদের প্রসংগ উল্লেখ আছে কিন্তু নবীজীর কুবায় উপস্থিতি সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁদের সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। সম্ভবত বিষয়টি এমন হয়ে থাকবে যে, বুরাইদা আল-আসলামী এবং তাঁর সংগী-সাথীরা কিছু সময়ের জন্যে নবীজীর সফর সংগী হয়েছিলেন। পরে অবশ্যই তাঁদেরকে নবীজীর অনুমতিক্রমে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল।

রাসূলে করীম (সঃ)-এর স্বদেশ ত্যাগের পরিকল্পনা সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় মক্কার কুরায়শগণ স্বাভাবিকভাবেই ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে রাসূলে করীম (সঃ) এবং অন্যদের মক্কায় রেখে যাওয়া স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত বিষয়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে। (বুখারী শরীফ, ৬৪ : ৮৪, নং ৩; ইবনে হিশাম, পৃঃ ৩২১-২২, ৩৩৯, সারাকসী-এর মাবসুত, দশম খণ্ড, পৃঃ ৫২) তাছাড়া যে সমস্ত দরিদ্র মুসলমান মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তাঁদের উপর কাফির-মুশরিকদের নির্যাতনের মাত্রা আরো তীব্র আকার ধারণ করে।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মুহাজির সমস্যার সমাধান এবং বিশ্ব ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান প্রসংগে কিছু কথা

নবী করীম (সঃ) এতদিন যা প্রচার করেছিলেন, এবার তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে যাচ্ছেন এবং সে কারণেই এ সময়টা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত রাসূলে করীম (সঃ) মক্কার মুহাজির এবং মদীনার খাযরাজ ও আউস গোত্রের ধনাঢ্য আনসারগণের সংগে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলেন। (ইবনে হিশাম পৃঃ ৩৪৪) এভাবেই তিনি ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন সমস্যার

সমাধান করেন। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলার নীতি ছিল এই যে, চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পর তাঁদের সম্পদ যৌথ মালিকানায় এসে যাবে এবং উভয়ে যৌথভাবে তা ভোগ করবেন। তাঁদের পারিশ্রমিক বা সমস্ত উপার্জন সাধারণ তহবিলে জমা হবে। এই নীতির বিস্তৃতি এত ব্যাপক ও গভীর ছিল যে, তারা প্রচলিত রীতি অনুসারে আপনজনদের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেত, এ স্থলে তাদের পরস্পরের নিকট থেকে প্রাপ্তির পরিমাণ দাঁড়াল তার চেয়ে অনেক বেশি। (তাফসীরে তাবারী, প্রসংগে, ৮ ঃ ৭৫) সরকারও এই বিষয়-টির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন এবং কোথাও কোন সরকারী অভিযান প্রেরণের জন্যে যোদ্ধা নির্বাচনের সময় চুক্তিবদ্ধ দু' ভাইয়ের মধ্যে সরকার কেবলমাত্র একজনকে নির্বাচনের ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন। অন্যজন বাড়িতে থাকতেন। তিনি-ই দুই পরিবারের দেখাশুনার দায়িত্ব নিতেন ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে শাসক এবং নাগরিক সাধারণের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বলিত একটি সনদপত্র স্বাক্ষরিত হয় যা মদীনার সমভূমিতে যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ধরনের নগর-রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে। এমনকি এটাকেই চুক্তিবদ্ধ বিভিন্ন জাতি বা রাজ্যসমূহের রাষ্ট্রও বলা যেতে পারে। এই সনদপত্রের বিষয়বস্তু ছিল খুবই ব্যাপক ও বিস্তৃত। সামাজিক নিরাপত্তা, বিচার ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা, কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয়, সর্বোপরি ব্যক্তিগত বিবাদ-বিসংবাদ মিটমাটের সর্বোচ্চ ক্ষমতা নবীজীর উপর ন্যস্ত করাসহ সমুদয় বিষয় ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৩৪১-৪৪, আবু উবায়েদ, কিতাব আল-আমওয়াল, ৫১৭; দি ইসলামিক রিভিউ, ওয়ার্কিং ১৯৪১, আগস্ট-নবেম্বর)।

অতঃপর মদীনায় বসবাসকারী য়াহূদী গোত্রগুলোর সংগে চুক্তি স্থাপন করা হয়। এই চুক্তিপত্রের মাধ্যমে য়াহূদীরা নগর-রাষ্ট্রের সংগে সম্পর্কিত হয়। সামরিক এবং রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ছিল য়াহূদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। তাছাড়া এই সনদের মাধ্যমেই হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে য়াহূদীরাও মেনে নেয়—যা সনদে বিধৃত ছিলো। মদীনার আরবদের মত য়াহূদীরাও বিবদমান কতগুলো দলে বিভক্ত ছিলো। ফলে তৃতীয় পক্ষের কোন ব্যক্তি যদি নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন, বিচার-আচার করতে পারেন পক্ষপাতহীন-ভাবে, দেশে ফিরিয়ে আনতে পারেন শান্তি ও শৃংখলা—তাহলে য়াহূদীদের পক্ষে

এমন ব্যক্তিত্বকে অভিনন্দন জানানোটা ছিল খুবই প্রত্যাশিত। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সনদে য়াহূদীদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে 'আরবগোত্রের য়াহূদী' হিসাবে। অর্থাৎ মদীনায় য়াহূদীদের স্বাধীন ও স্বনির্ভর কোন অস্তিত্ব ছিলো না। বরং সেখানে তাদের বসবাসের ব্যাপারে মদীনাবাসীদের আন্তরিক সম্মতির অভাব ছিলো, কারণ বিভিন্ন আরব গোত্রের আশ্রিত বলে। য়াহূদীদের সংগে সম্পাদিত চুক্তিপত্র এবং মদীনার মুসলমানগণের জারিকৃত বিধি-বিধানগুলো একটি সহিফায় সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। ওয়েলহাউসেন-এর ভাষায় (জেমেইন ডোরডানাগন মদীনা) এই সহিফা বা সংবিধানই অরাজকতাপূর্ণ একটি নগরকে রাষ্ট্রের মর্যাদায় উন্নীত করে বিশ্বের ইতিহাসে একটি রাষ্ট্রের প্রথম লিখিত সংবিধান হিসাবে পরিচিত এই সনদটি ঐতিহাসিকগণ কোন রকম পরিবর্তন বা পরিমার্জন ব্যতীত হুবহু একই অবস্থায় সংরক্ষণ করেছেন। আর শত শত বছর পরও সংবিধানটি অবিকল একই অবস্থায় আমাদের হাতে এসে পেঁৗছেছে। বস্তুত পক্ষে এটাকে আমাদের একটি সৌভাগ্য বলতে হবে। লিখিত সংবিধানটি মদীনার এই ভূখণ্ডকে ভূষিত করেছে একটি হেরেম হিসাবে। এ একটি পবিত্র অঞ্চল ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এই সংবিধানই[১] মদীনার বুকে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখাসহ একটি রাজনৈতিক অস্তিত্ব বা সরকার গঠন করে একটি নগর রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে। এই সংবিধানটি ছিল খুবই স্থিতিস্থাপক। রাসূলে করীম (সঃ)-এর জীবদ্দশাতেই সমগ্র আরবের লোকেরা ইসলাম ধর্ম কবুল করে। সেদিনের নগর-রাষ্ট্র পরিণত হয় একটি বিশাল-বিস্তৃত সাম্রাজ্যে। মদীনা গড়ে ওঠে রাজধানী হিসাবে। অথচ তখনো এই সংবিধান বিশাল সাম্রাজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজন মিটাতে সমর্থ হয়।

হেরেম শব্দের অর্থ ঃ সহজবোধ্যতার জন্যে 'হেরেম' শব্দের কিছু ব্যাখ্যা দেয়া আবশ্যক। শব্দটির তাৎপর্য ও গুরুত্ব দ্বিবিধ—প্রথমত ধর্মীয়, দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক। ইসলাম-পূর্ব যুগেও এ শব্দটির প্রচলন ছিল। তখনকার দিনে কেবলমাত্র আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেই এটা সীমিত ছিল না। বরং এর ব্যাপ্তি ছিল ফিলিস্তিন, গ্রীসসহ আরও বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব এত বেশি ছিলো যে, হেরেমের সীমানার মধ্যে সব কিছুই পবিত্র বলে বিবেচিত হবে। এখানে পাখি বা পশু কিছুই বধ করা

---

১. বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান, ৩য় সংস্করণ, আশরাফ, লাহোর, ১৯৭৫।

যাবে না। কাবায় কুড়াল দিয়ে গাছ-গাছালি কাটা যাবে না, বিন্দুমাত্র রক্তপাতের অনুমোদন দেয়া যাবে না, সর্বোপরি এখানে যারা আসে, এমনকি তাদের মধ্যে যদি কোন অপরাধীও থাকে, তবুও কোন কারণে তাকে উৎপীড়ন বা অসুবিধায় ফেলা যাবে না। রাজনৈতিকভাবে[২] হেরেম বলতে শহর রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখাকে বুঝাতো। বলা হয়ে থাকে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর যামানাতেই মক্কার হেরেমের সীমা নির্ধারণী খুঁটি নির্মাণ করা হয়েছিল। যেভাবেই হোক না কেন, ইসলাম-পূর্ব যুগেও এগুলোর অস্তিত্ব ছিল। পরবর্তীতে ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম (সঃ) এর সংস্কার করেন। (ইবনে সাদ, ২/১ খণ্ড, পৃঃ ৯৯, আল-আযরাকী, আখবার মক্কা, পৃঃ ৩৫৭) তার পর থেকেই প্রয়োজন দেখা দেয়ার সংগে সংগে এর মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে এবং অদ্যাবধি এর অস্তিত্ব বিরাজমান।

নগর-রাষ্ট্র মদীনার সংবিধান এখানে আলোচ্য বিষয়। এই সংবিধানেও মদীনাকে হেরেম হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ৯ম হিজরীতে তায়েফ দখল করার পরও এই শহরটিকে হেরেম বলে ঘোষণা দেয়া হয়। রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) এবং তায়েফবাসীদের মধ্যে যে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক চুক্তিপত্র সম্পন্ন হয় তাতেও এ বিষয়টির স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। (আবু উবায়েদ, কিতাব আল-আমওয়াল, ৫০৬) তাছাড়া রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর তরফ থেকে একটি বিশেষ বিধান জারি করে সংবিধানের এই ধারা লংঘন করার অপরাধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়। (বিস্তারিত জানার জন্যে নিম্নোক্ত বইগুলো অধ্যয়ন করা যেতে পারে—ডকুমেন্ট সুর লা ডিপ্লোম্যাটি মুসলমানে নং ১৬০, ১৬১ এবং আল-ওয়াথাইক, নং ১৮১-১৮২, কানযুল-উম্মাল, খণ্ড-২ নং ২১৩২)।

প্রশ্ন হল, মদীনার চারপাশেও কি অনুরূপ খুঁটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এ প্রসংগে সহীহ আল-বুখারীতে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে যে, রাসূলে করীম (সঃ) মদীনা শহরের সীমান্ত অঞ্চলে একটি খুঁটি নির্মাণ করার জন্যে তাঁর একজন সহচরকে প্রেরণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক বিবরণ এবং হাদীস গ্রন্থ অনুসারে মদীনার হেরেমের অবস্থান ছিল দুটি লাবাহ অথবা হাররাহ্-এর ঠিক

---

২. ১৯৩৮ সালে হায়দ্রাবাদ থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক ইসলামিক কালচারে লেখক ডঃ হামীদুল্লাহ্‌র আইয়ামে জাহিলিয়াত যুগের শহর রাষ্ট্র মক্কার রাজনৈতিক ব্যবস্থা শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

মাঝখানে, অন্যভাবে বলা হয় যে, সাওর এবং 'এয়ার'-এর ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় কোন স্থানে। প্রাচীন আরবী শব্দ লাবাহ্-এর অর্থ লাভা। আগ্নেয়-গিরির লাভা দিয়ে গঠিত বিস্তৃত সমতল ভূমিকেও বলা হয় লাবাহ। অপরদিকে লাভার উত্তাপে চারপাশের পোড়া পাথর বা মাটিকে বলে হাররাহ। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এ ধরনের দুটি সমতল ভূখণ্ডের ঠিক মাঝখানে মদীনা শহরটি অবস্থিত। খুব বেশি একটা চিন্তা-ভাবনা না করে স্বাভাবিকভাবেই তারা একে বলে থাকে পূর্বাংশ এবং পশ্চিমাংশের লাবাহ বা হাররাহ। শহরের উত্তর দিকে এবং উহূদ পর্বতের পশ্চিম দিকের সাওর নামের পাহাড়টি ছোট এবং শহরের দক্ষিণ দিকের 'এয়ার' পাহাড়টি অপেক্ষাকৃত বড়।

আল-মাতারী 'আল-তারিফ বিমা আনসাত আল-হুজরাহ মিন মা'আলিম দার আল-হিজরাহ' শিরোনামে মদীনা শহরের উপর একটি প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন (পাণ্ডুলিপি শায়খুল ইসলাম লাইব্রেরীতে, মদীনায়)। ঐতিহাসিক জনাব আল মাতুরী অষ্টম শতাব্দীতে ইন্তিকাল করলেও পরবর্তী সময়ের সব লেখক অহরহ ঐ গ্রন্থটির বরাত দিয়েছেন। বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যে ঃ

> হযরত কাব ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলে করীম (সঃ) আমাকে মদীনার হারাম-এর সীমানার স্তম্ভ সদর স্থানে স্থাপনের জন্যে পাঠান। যাতুল জায়শ, মুশায়রিব, মাখিদ, আল-হুফায়য়া, যুল-উশায়রা এবং তায়ম-এর উঁচু অংশে স্তম্ভ নির্মাণ করলাম।

যাতুল জায়শ মক্কা-মদীনার রাস্তার উপর আল-হুফায়য়ার একটি পার্বত্য পথ যাতুল জায়শ-এর বামদিকের পর্বতটির নাম মুশায়রিব। মুশায়রিব এবং খালায়ক-এর মাঝখানেই রয়েছে আদ-দাবুয়াহ। সিরিয়ায় যাওয়ার সময় রাস্তার উপর দেখা যাবে মাখিদ পর্বত মালার উঁচু অংশ। মদীনার উত্তরে আল-গাবাহ (বনাঞ্চলে)-এ রয়েছে আল-হুফায়য়া। জুল -উশায়রা আল-হুফায়য়া অঞ্চলের একটি পার্বত্য পথ এবং মদীনার পূর্বদিকের একটি পাহাড়ের নাম তায়ম।

> এসব দেখে মনে হয় লম্বায় অথবা পাশে হেরেমের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত প্রায় একদিনের পথ। যাত আল-জায়শ আল-বাইদা-এর ঠিক মাঝ-খানে অবস্থিত। এবং আল-বাইদা হল সে স্থান যেদিকে হজ্জযাত্রীরা মুখ

করে দাঁড়ান। হজ্জযাত্রীরা যুল হুলায়ফায় বসে হজ্জের পোশাক পরিধান করে অর্থাৎ ইহরাম বেঁধে পথ চলতে থাকেন পশ্চিমে উপরের দিকে।

মরহুম ইবরাহীম হামদী খারপুতলি ছিলেন মদীনার একজন বিজ্ঞ পর্যটক এবং শায়খুল ইসলাম গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক। তিনি এই পুস্তকের লেখক ডঃ হামিদুল্লাহ্‌কে ১৯৩৯ সালে বলেছিলেন যে, মদীনার পূর্ব দিকে এ সব স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ এখনো দৃশ্যমান। ভূমি থেকে এগুলোর উচ্চতা প্রায় দেড় ফুট। রাসূলে করীম (সঃ)-এর পর থেকে এগুলোর সংস্কার সম্পর্কে কোথাও কিছু উল্লেখ নেই। তাই অনুমান করা যায় যে, এগুলো হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আমলে নির্মিত পবিত্র স্তম্ভগুলোর ধ্বংসাবশেষ।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাতে মদীনার নগর-রাষ্ট্রের সুসংহতকরণ

অপ্রাসংগিক বিষয়ের আলোচনা আর না বাড়িয়ে এবার মূল কথায় ফিরে আসা যাক। হিজরতের পরে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রথম কাজ ছিল মদীনার নগর-রাষ্ট্রের ভিত্তিকে সুসংহত করা। অভ্যন্তর ভাগের জরুরী কাজগুলো সম্পন্ন করার পরপরই তিনি নজর দিলেন চারপাশের অঞ্চলসমূহের উপর। আরবের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, মক্কার লোকদের সিরিয়া অথবা মিসর সফরে যেতে হলে তাদের পথ চলতে হবে মদীনার উপকূল ভাগ দিয়ে। এমতাবস্থায় মদীনা এবং ইয়ানবু বন্দরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী গোত্রগুলোর সংগে যদি আঁতাত গড়ে তোলা যায় তাহলে মক্কার বাণিজ্য বহরের চলাচল হয়ত কার্যত রুদ্ধ হবে না। কিন্তু এই পথের ব্যবহার তাদের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে পড়বে। ইসলাম-পূর্ব সময়ে মদীনাবাসীদের সংগে এতদঞ্চলের কোন গোত্রের হয়ত সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল, কোনটির সংগে হয়ত বা ছিল না। সে যাই হোক না কেন, রাসূলে করীম (সঃ) বিভিন্ন গোত্রের সংগে অতীতে সম্পাদিত চুক্তিগুলো নবায়ন করেন, কোন কোন ক্ষেত্রে আবার গোত্রগুলোর সংগে নতুনভাবে চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং সামরিক সাহায্য-সহযোগিতা সংক্রান্ত ধারাগুলোও চুক্তিপত্রে সন্নিবেশ করেন। (বিশদ বিবরণের জন্যে ডঃ হামিদুল্লাহ রচিত 'ডকুমেন্টস সুর লা ডিপলোম্যাটি মুসলমানে নং ১৪০-১৪৫ এবং আল-ওয়াথাইক, ১৫৯-১৬৪ দেখা যেতে পারে)

বেশ কয়েকটি মাস কেটে গেল সাংগঠনিক তৎপরতা এবং প্রস্তুতি গ্রহণের কাজে। এর পরই নগর-রাষ্ট্র মদীনা থেকে শুরু হল ছোট ছোট দলে সৈন্য

প্রেরণের পালা। এদের কাজ ছিল কুরায়শ বাণিজ্য বহরকে হয়রানির মধ্যে রাখা। (ইবন সাদ ২/১, পৃঃ ২-৭) এ সমস্ত তৎপরতার মূল উদ্দেশ্য ছিল কুরায়শদের একথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, ইসলাম প্রভাবিত অঞ্চলের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করার জন্যে দরকার হযরত মুহাম্মদ (সঃ) অর্থাৎ যিনি মদীনার শাসক তাঁর সদয় সহানভূতি ও সহযোগিতা। রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর এই আয়োজনের প্রতি কুরায়শরাও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল। উদ্যোগ নিল বলপূর্বক বাণিজ্য পথকে বিপদ মুক্ত করার জন্যে। কুরায়শ ও মুসলমানদের এই সংঘাতই কতগুলো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রূপ নিল। এ সব ভয়াবহ যুদ্ধ অর্থাৎ যে সব ময়দানে যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করাই বর্তমান পুস্তকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

অধ্যায় ২

বদর—ইতিহাসের অন্যতম বিজয় প্রান্তর

(হিজরী ২য় বছরের ১৭ রমযান/খৃঃ ৬২৩ সালের ১৮ নবেম্বর শুক্রবার
মতান্তরে ৬২৪ খৃস্টাব্দের ১৭ মার্চ)

ভৌগোলিক অবস্থান

সমগ্র পশ্চিম আরব জুড়ে রয়েছে পাহাড় আর পর্বত। হিজাযের অবস্থাও তদ্রূপ। এতদঞ্চলে উপত্যকা এবং গিরিপথগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে সড়ক এবং যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে। মরুযাত্রীরা সাধারণত প্রশস্ত উপত্যকা-গুলোকে চলাচলের পথ হিসাবে বেছে নেয়। গিরিপথ ধরে পথ চলা অধিকতর কষ্টকর এবং প্রয়োজনের সময় উপত্যকা পথের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, এতদঞ্চলে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করতে সব সময়ই অনেকগুলো পথ ও উপপথ ধরে চলা যায়। বদরের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম কিছু ছিল না। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আমলে মক্কা-বদর এবং মদীনায় যাতায়াতের জন্যে যে পথটি ব্যবহৃত হতো, অবস্থার পরি-বর্তনের সংগে সংগে সে পথটিও অবিরত পরিবর্তন করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের প্রসারের সংগে সংগে হজ্জের মৌসুমে পবিত্র স্থানগুলোতে আগত হজ্জ-যাত্রীর সংখ্যা শত-সহস্রগুণে বেড়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে দশ-পনেরো হাজার উষ্ট্রারোহী মরুযাত্রীর এখানে আসাটা ছিল খুবই মামুলী ব্যাপার। তাই স্বাভাবিকভাবেই সফরের সময় বিরতিস্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছাউনি ফেলার মত স্থান, পানীয় জলের সহজলভ্যতা এবং এ জাতীয় আবশ্যকীয় বিষয়গুলো ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারই ফলশ্রুতিতে তুর্কী আমলে নির্মিত হল তারিক সুলতানিয়া বা রাজকীয় সড়ক। আজকালকার যামানায় হজ্জযাত্রীদের মধ্যে উটের ব্যবহার প্রায় উঠে গেলেও তারিক সুলতানিয়া দিয়ে এখনো উট চলাচল

করে। বিশেষ করে সউদী আরবের আধুনিকীকরণের সংগে সংগে হজ্জযাত্রী-দের পরিবহন ব্যবস্থায়ও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বাস্তবিক পক্ষে হেযাজের অভ্যন্তরভাগে হজ্জযাত্রীদের চলাচল একচেটিয়াভাবে মোটর গাড়ির মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাদের প্রয়োজন এবং চাহিদাগুলোও সম্পূর্ণরূপে পাল্টে গেছে। বহুল প্রচারিত হুদায়বিয়া অভিযানের সময় রাসূলে করীম (সঃ) যে পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, মক্কা বিজয়ের সময় তিনি সেই একই পথে অগ্রসর হননি। এ সময়ে মক্কাবাসীদেরকে তাঁর অভিযান সম্পর্কে অন্ধকারে রাখার প্রয়োজনে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন একটি পৃথক পথ ধরে। আবার বিদায় হজ্জ উপলক্ষে মদীনা থেকে মক্কা সফরকালে তাঁর অনুসৃত পথটি ছিল পূর্বের পথগুলোর চেয়েও পৃথক। এ সময়ে তিনি ১ লক্ষ ৪০ হাজার অনুসারীর সমাবেশে ঐতি-হাসিক ভাষণ দেন। ইবনে হিশাম এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক যে সমস্ত পথে এই অভিযানগুলো পরিচালিত হয়েছিল, সে সব পথের বিভিন্ন স্টেশনের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ স্টেশনের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে এখন আর জানা যায় না।

তুরস্কের শাসনামলে হজ্জযাত্রীরা বদরে যাওয়ার সুযোগ পেত। কিন্তু সউদী সরকার গোড়ার দিকে তাদের বিশেষ একটি চিন্তা-ধারার কারণে হজ্জ-যাত্রীদের বদর সফর করার অনুমতি দিত না। কিন্তু বদরের প্রান্তর দিয়ে নিচের (রাস্তা নির্মাণের জন্যে বালি বা পাথর চূর্ণের সংগে আলকাতরার মত কালো পদার্থ মিশিয়ে তৈরী) রাস্তা নির্মাণের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে ইচ্ছা করলে যে কেউ বদরের প্রান্তরে বিরতির এবং ঐতিহাসিক স্থান-গুলো ঘুরেফিরে দেখার সুযোগ পায়। এতদঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে অনেক বালি-য়াড়ি ছিল। ফলে মোটরগাড়ি চলাচলের উপযোগী রাস্তা নির্মিত হওয়ার পূর্বে এই স্থানটিকে মোটর চালকগণ বিরক্তি এবং অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত। উষ্ট্রা-রোহী মরুযাত্রীদলের ব্যবহৃত ইমপেরিয়াল রোড (রাজকীয় সড়ক)-এর সংগে আসফাল্ট সড়কের পার্থক্য খুবই সামান্য। লেখক তাঁর সংগী-সাথীদের সংগে জেদ্দা থেকে মদীনা সফর করেছেন। তাঁর হিসাবে জেদ্দা থেকে মদীনার দূরত্ব দাঁড়িয়েছে ৪০০ কিলোমিটার। তাঁর দেওয়া বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

দাহবান	৫০ কিঃ মিঃ
রাবিয়	১৫০ কিঃ মিঃ
মাসতুরাহ	১৯০ কিঃ মিঃ

মদীনা
দারবিশের কুয়া
মুমায়জিদ
হামরা
শুফাইয়াহ
ইয়ানবু
বদর
হিসানির কূয়া সমূহ
শাইখের কূয়া
উত্তর
মাসতুরা
রাবিঘ
কাজিমাহ
দফ
উসফান
দাহবান
জেদ্দা
মক্কা
বাহরাহ
হোদায়বিয়া
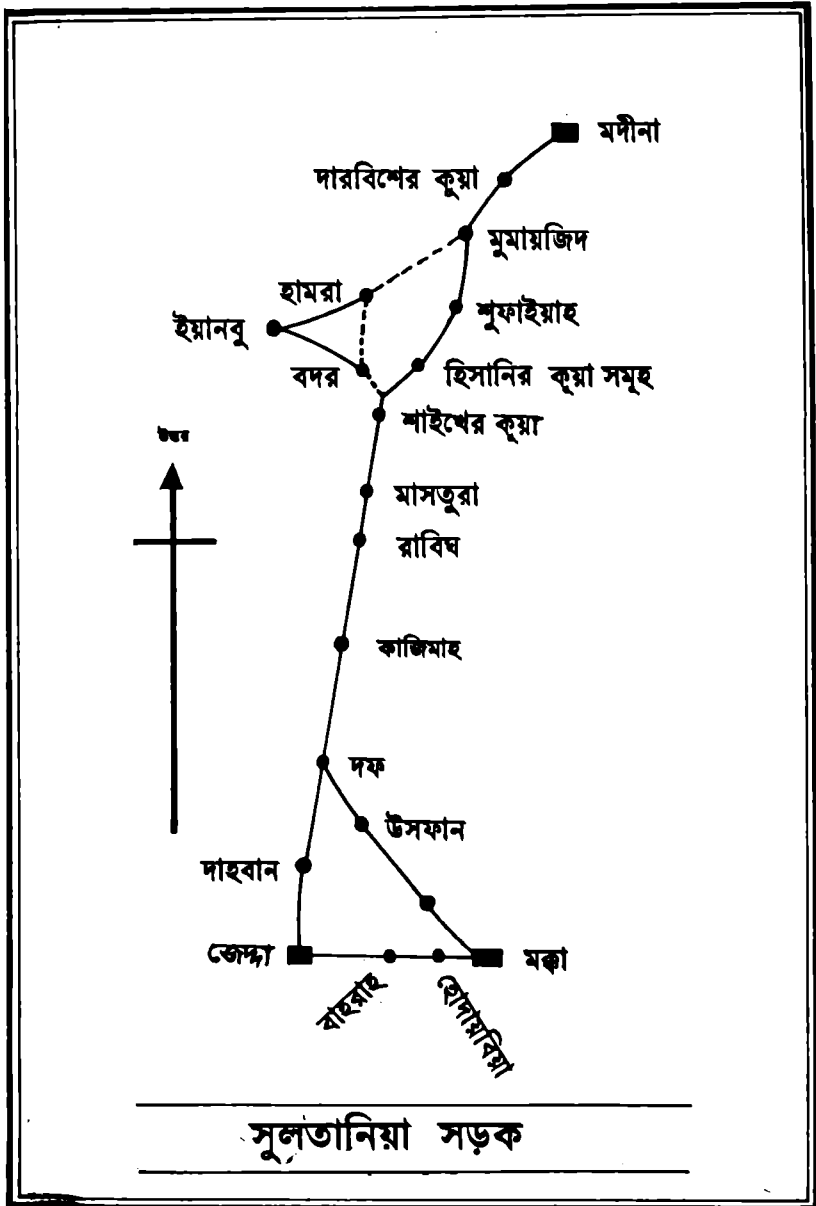
সুলতানিয়া সড়ক

বদর ২৭৪ কিঃ মিঃ
মুসায়্যিদ ৩৩০ কিঃ মিঃ
বির আর রাহাহ ৩৫০ কিঃ মিঃ
ফুরায়শ ৩৭৭ কিঃ মিঃ

মদীনা মনওয়ারা থেকে কেউ তারিক সুলতানীয়া (ইমপেরিয়াল ক্যামেল রোড বা রাজকীয় সড়ক) ধরে রওয়ানা দিলে মুসায়্যিদে এসে তাকে বদরের দিকে মোড় নিতে হবে। বেশ কিছুকাল পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ এই সংযোগস্থলে হজ্জ-যাত্রীদের জন্যে কতগুলো বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হয়েছিল। বিশ্রামাগারের নির্মাণ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করেছিলেন হায়দরাবাদের (ভারত) মুসলমানরা। বিশ্রামাগারের জন্যে নির্মিত সাদা ভবনগুলো এখনো এতদঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হিসাবেই বিরাজ করছে। অবশ্য ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে অনেক ভবন পুলিশ দখল করে নেয়। কতকগুলো ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়। ফলে অনেক হজ্জযাত্রীকেই রাত্রি যাপন করতে হয় খড়-পাতা দিয়ে তৈরি কুঁড়ে ঘরে। মুসায়্যিদের পর তাকে পথ চলতে হবে খাইফের মধ্য দিয়ে। বর্তমানে খাইফ ছোট্ট একটি গ্রামের রূপ নিয়েছে। তবু এখানকার বিশাল মসজিদ-এর অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এককালে এই অঞ্চলটি ছিল খুবই আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ। অতঃপর আল-হামরা নামের ছোট্ট একটি গ্রামে এসে তাকে বিরতি নিতে হয়। সেখান থেকে আল-হাসকাফীয়াহ হয়ে পরের দিন সে পৌঁছে বদর প্রান্তরে। মক্কা হতে আসার সময় বির আল-শায়খ (মানচিত্র, শায়খ-এর কুয়া) অতিক্রম করে খানিকটা পথ অগ্রসর হলেই দারব আল্-আজ্‌রাহ। এখান থেকে রাজকীয় সড়ক ছেড়ে তাকে বাম দিকে মোড় নিতে হয় এবং উটের পিঠে চড়ে বদরে পৌঁছতে সময় লাগে দশ ঘন্টা। বদর থেকে মদীনার সড়কটি ভারী চমৎকার। এখানকার ভূমি বেশ উর্বর। মরূদ্যানগুলোও বড় বড়। লম্বায় কয়েক মাইল হবে। বিশেষ করে বদর থেকে আল-হামরার মধ্যবর্তী অঞ্চল জুড়ে রয়েছে একটি গভীর ঘন বন। এটা 'আল-ইস' নামে পরিচিত। সম্ভবত এখানে 'আল-ইস' নামে কোন স্থান আছে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মক্কার অভিযানগুলোতে এই নামটি প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া এতদঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণ মিষ্টি পানি ও চারণভূমি রয়েছে। বড় বড় এক একটা উট, ভেড়া ও ছাগলের পাল এ সমস্ত ভূমিতে চারণ করে বেড়ায়।

আধুনিক শহর বদর

বদর শহরের ইতিহাস আলোচনায় অধিক সময় ক্ষেপণের অবকাশ নেই। বর্তমানে এটা একটি বৃহৎ গ্রাম। এখানে রয়েছে পাথর দিয়ে তৈরি শত শত ঘরবাড়ি। স্থানীয়ভাবে এগুলোকে বলা হয় 'কাসর'। এখানে দুটি মসজিদ আছে। একটি পাঞ্জেগানা নামায আদায়ের জন্যে। মসজিদের মিনারটি ছোট। এই মিনার থেকেই নামাযের জন্যে আহ্বান করা হয়। অবশ্য বর্তমানে মিনারটির সংস্কার আবশ্যক। অন্য মসজিদটিকে সাধারণত বলা হয় মসজিদুল গামামা। একে মসজিদুল 'আরিশও বলা হয়। এ মূলত জুমা মসজিদ। শুক্রবারে এখানে জুমার নামায পড়া হয়।

এই মসজিদটি একটি ঐতিহাসিক নিদর্শনের ধারক। কারণ, বদর যুদ্ধের সময় রাসূলে করীম (সঃ) যে স্থানটিতে পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন, এই মসজিদটি ঠিক সেস্থানে নির্মিত। এর অবস্থান ছোট একটি পাহাড়ের উপরে। এখানে দাঁড়িয়ে নিম্নে সমতল ভূমিতে যেখানে ঐতিহাসিক যুদ্ধটি সংঘটিত হয় তা স্পষ্টভাবে অবলোকন করা যায়। কিন্তু কার্যত খেজুরের বনের জন্যে এবং অন্যান্য গাছপালার জন্যে সম্মুখের ঐদিকে সব কিছু দেখতে পারা যায় না। কুয়াগুলো থেকে উৎসারিত নহরটি ক্রমান্বয়ে উঠে এসেছে ভূমির উপরে। নহরের পানি দিয়েই চারপাশের বাগানগুলোতে সেচের কাজ চলে। নহরটি প্রবাহিত হয়েছে দুটি মসজিদের নিম্নভাগ দিয়ে। এই নহরের পানি মুসল্লীদের অযুর জন্যে ব্যবহৃত হয়। এখানকার মরূদ্যানটি কয়েক মাইল লম্বা। মরূদ্যানে প্রচুর শাকসব্জি উৎপন্ন হয়। শুক্রবারের বাজারটি খুবই জমজমাট। সপ্তাহের এই দিনটিতে দূর-দূরাঞ্চলের বেদুঈনরাও বাজারে আসে। ঘি, চামড়া, গাছ থেকে তৈরি তেল, গবাদিপশু যেমন উট, ভেড়া, ছাগল, কখনো কখনো আবার গরু, পশমী কম্বল, নানা বর্ণের পোশাক আরো হরেক রকমের দ্রব্যসামগ্রী তারা বাজারে কেনাবেচা অথবা বদল করে। বলা বাহুল্য, এ সমস্ত পণ্যসামগ্রী স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত। ইসলাম-পূর্ব যুগে এখানে বিরাটাকারের একটি বাৎসরিক মেলা বসত। (তাবারী ১, পৃঃ ১৩০৭ ও ১৪৬০) যিলকদ মাস-এর প্রথম তারিখে মেলা বসত এবং ঐ মাসের আট তারিখে তা শেষ হত। (ইবনে সা'দ, খণ্ড ২/১, পৃঃ ৪২) মূর্তি পূজারীদের জন্যে এখানে অবশ্যই একটি মন্দির ছিল। যদিও সময়ের ব্যবধানে এখন আর তার চিহ্ন পাওয়া যায় না। তবে বির আল-শায়খ থেকে বদরে আসার মাইল খানেক পূর্বে অদ্ভুত আকৃতির

বদর-এর যুদ্ধ ক্ষেত্র
সিরিয়ার পথ
মদীনার পথ
মক্কার পথ
আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা
উত্তর
সাগর
লোহিত
ছোট পাহাড়
আল-উদওয়াত
আল-দুনয়া
ছোট পাহাড়
আল-উদওয়াত
আল-কুছওয়া
মুসলিম শিবির
মুসলিম বাহিনী
শত্রু শিবির
আসফালের শৃঙ্গ
স্কেল
০ ১ ২ ৩ ৪
কিলোমিটার
সংকেত চিহ্ন
১। আধুনিক দুর্গ
২। বদর টাউন
৩। খেজুর বাগান
৪। আরিশের মসজিদ
৫। বেসরকারী ঘর সমূহ
৬। গণ কবর স্থান
৭। শহীদগণের কবর স্থান
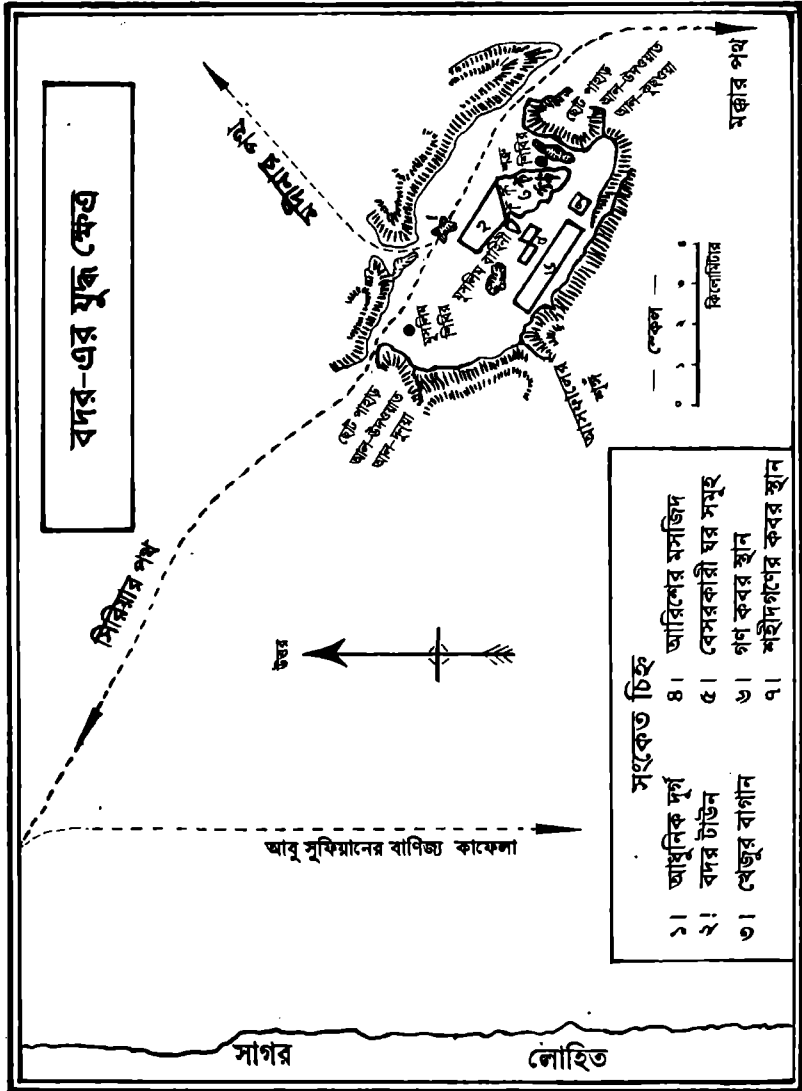
একটি পাহাড় নজরে পড়ে। একটি উট বসে থাকলে যেমন দেখায়, পাহাড়টির আকৃতিও ঠিক তদ্রূপ। আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে কাফির-মুশরিকরা তুচ্ছ সাধারণ জিনিসগুলোকেও গ্রহণ করত মূর্তি বা ভক্তিযোগ্য বস্তু হিসাবে। এমতাবস্থায় এক সময়ে অদ্ভুত আকৃতির এই পাহাড়টির পূজা-অর্চনা হওয়া বিচিত্র কোন ব্যাপার নয়।

ভৌগোলিক অবস্থান ও স্থানসমূহের বিশদ বিবরণ

বদর প্রান্তর সমতল এবং দেখতে ডিম্বাকৃতির। প্রান্তরটি লম্বায় প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল এবং পাশে চার মাইলের মত। বদরের চারপাশে রয়েছে উঁচু উঁচু পাহাড়। ওয়াদি সাফরা উপত্যকার সন্নিকটে এর অবস্থান। মক্কা, মদীনা এবং সিরিয়া অভিমুখী রাস্তাগুলো বিভিন্ন দিক থেকে এসে এখানে এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। তুর্কী শাসনামলে গভর্নর শরীফ আবদ-আল মুত্তালিব বদরের ঠিক মাঝখানে একটি মজবুত দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৯৩৯ সালে দুর্গটি ভগ্নপ্রায় অবস্থায় ছিল। শুনেছি যে, পরবর্তীতে এখানে একটি স্কুল ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। বদরের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য পাথর অথবা নুড়ি। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত ভাগের মাটি নরম। কোথাও কোথাও বালুর স্তূপ। রাসূল (সঃ)-এর আমলেও এই একই অবস্থা ছিল। বদরের যুদ্ধের দিনে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা মতে, বৃষ্টিপাতের ফলে কুরায়শদের সেনা ছাউনি পানিতে ভেসে যায়। অপরদিকে যেখানে মুসলমানদের ছাউনি ছিলো সেখানকার আলগা বালু জমাট বেঁধে শক্ত হয় এবং এটা ছিল মুসলমানদের জন্যে খুবই খুশির ব্যাপার। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৩৯) বদর প্রান্তরের সেই নরম ভূমি এখন একটি সমৃদ্ধ মরূদ্যানে রূপান্তরিত হয়েছে।

বদরের চারদিকের পাহাড়গুলোর বিভিন্ন নাম রয়েছে। পাহাড়গুলোর মধ্যে দুটি রয়েছে উষর বালিয়াড়ি। বালুকারাশি স্তূপীকৃত হয়েই এগুলো সৃষ্টি হয়েছে। বালিয়াড়ি দু'টি উপত্যকার দুপাশে অবস্থিত। ১৪০০ বছর পূর্বে কুরআন শরীফ নাযিল হওয়ার সময় থেকে যেমন একটিকে নিকট প্রান্ত (আদ উদওয়াতুদ দুনয়া) এবং অপরদিকে দূরপ্রান্ত (আল-উদওয়াতুল কুসওয়া) (৮ঃ৪২) অভিহিত হয়ে আসছে। এখনো পাহাড় দুটিকে এ নামেই ডাকা হয়। এ দুটির মাঝে রয়েছে একটি উঁচু পাহাড়। বর্তমানে এটা জাবাল আসফাল বা নিচু পাহাড় বলে পরিচিত। এই পাহাড়ের নিম্ন বা পশ্চাৎ ভাগেই আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা থেমেছিল।

(৮ ঃ ৪২) অতঃপর বদর অতিক্রম করে বাণিজ্য কাফেলা সমুদ্র উপকূল ভাগের পথ ধরে চলে যায় এবং এভাবেই তারা ওত পেতে অবস্থানরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর বাহিনীর চক্ষু এড়িয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আল-ওয়াকিদী বলেন, (আল মাঘাযী পাণ্ডুলিপি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ৩০) সমুদ্র উপকূল থেকে বদরের দূরত্ব এক দিবসের অংশ বিশেষের পথ। আসফাল পাহাড়ের উঁচু শৃংগ থেকে লোহিত সাগরকে বেশ ভালভাবেই দেখা যাবে। স্থান দু'টির মধ্যে দূরত্ব প্রায় ১০/১২ মাইল এবং এটা নিশ্চিত যে, উটের বহরের পক্ষে এক দুপুরের মধ্যে এতটা পথ অতিক্রম করে সমুদ্র উপকূলভাগে পেঁীছা সম্ভব নয়। তাই বলা যেতে পারে যে, সময়ের ব্যবধানে হয় সমুদ্র উপকূল দূরে সরে গেছে নয়ত লেখক অর্থাৎ আল-ওয়াকিদি নেহায়েত অনু-মানের ভিত্তিতে এ বক্তব্য রেখেছেন।

যুদ্ধের কারণসমূহ ও পটভূমি

মক্কাবাসীদের মধ্যে যাঁরা নতুন ধর্ম ইসলাম কবূল করেন, কুরায়শরা তাঁদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালায়। তাদেরকে স্বদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে। বাজেয়াপ্ত বা জবরদখল করে নেয় তাদের বিষয়-সম্পদ। নও-মুসলিমগণ যেসব দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কুরায়শরা সে সব দেশের শাসক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। আশ্রিত ব্যক্তিগণকে তাদের হাতে সমর্পণ করা নয়ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা নেয়াই ছিল তাদের লক্ষ্য। প্রথমে আবিসিনিয়া পরে মদীনার প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। কিন্তু তাদের সব প্রয়াস-প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। (তাবারী, ইতিহাস ১ম খণ্ড, ১৬০৩ ; ইবনে হিশাম, পৃঃ ২১৭, মসনদে ইবনে হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯৮, ইবনে হাবীব, মুহাববার পৃঃ ২৭১-৩)। অপরদিকে মুসলমানরাও হিজরতের পর মদীনা থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা নেন। তারা কুরায়শদের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেন। ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বা প্রভাবিত অঞ্চল দিয়ে কুরায়শদের বাণিজ্য বহর চলাচলের পথ বন্ধ করে দেন। এই কারণগুলোই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরায়শদের আক্রমণাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মত উত্তেজনা সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট ছিল।

কুরায়শ বাণিজ্য কাফেলার উপর মুসলমানদের আক্রমণকে সাধারণভাবে লুটতরাজ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। এ ঘটনার ব্যাপারে কুরায়শরা

নির্দোষ বা নির্বোধ ছিল না। আবার আক্রমণকারীরাও ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্যে দলবদ্ধ হয়নি। আসলে পূর্ব থেকেই দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিরাজ করছিল যুদ্ধাবস্থা। এ অবস্থায় বিবদমান দল শত্রু পক্ষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এবং শত্রু পক্ষের যে কোন প্রকার স্বার্থ নষ্ট করার অধিকার রাখে।

এ কারণেই যে সব দুর্বল চিত্তের লোক আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্যে কারণ অনুসন্ধান করে এবং কুরায়শদের বাণিজ্য কাফেলার মালামাল হস্তগত এবং তাদের হয়রানি করার জন্যে পরিচালিত অভিযানসমূহের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, আমি তাদের সাথে একমত নই। প্রিয়নবী (সঃ)-এর সীরাত-এর উপর ভারতের প্রখ্যাত জীবনী লেখক মরহুম প্রফেসর শিবলী নুমানী একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেখানে তিনি কুর'আনুল করীম হতে সুস্পষ্ট দলিল উপস্থাপন করে অন্তত বদর যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ও অভিমতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে কুর আনুল করীম থেকে আল্লামা শিবলী নুমানীর উদ্ধৃতি নিম্নরূপঃ "মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন মৃত্যুর দিকে চলে যাচ্ছে এবং তারা যেন উহা প্রত্যক্ষ করছে।" (৮ঃ৬) তিনি তাঁর গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলে করীম (সঃ) বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করার জন্যে অভিযান পাঠাননি, বরং কুরায়শদের সশস্ত্র প্রহরী বা সামরিক বাহিনীকে প্রতিহত করাই ছিল তার লক্ষ্য। এ প্রসংগে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুটি দলের একটি দল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে, অথচ তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক।" (৮ঃ৭) এই আয়াত থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, দুটি দলের মধ্যে মুসলমানরা কি সশস্ত্র বাহিনীর মুকাবিলা করবে, না বাণিজ্য কাফেলার উপর চড়াও হবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলো না। দুটি সম্ভাবনাই সমান ছিল। কুরায়শদের বাণিজ্য কাফেলায় উটের সংখ্যা ছিল এক হাজার। তাদের বাণিজ্য সামগ্রীর মূল্য ছিল ৫ লাখ দিরহাম। (ইবনে সাদ ২/১ পৃঃ ২৫ ; আল-ওয়াকিদী, মাগাজী ৮ এ)। কুরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা যাত্রালগ্ন থেকেই মুসলিম বাহিনী কর্তৃক তাদের পশ্চাদ্ধাবনের বিষয়টি জানত। আবার মুসলিম বাহিনী এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে, মক্কাবাসীরা বাণিজ্য কাফেলার নিরাপত্তার জন্যে তাদের সাধ্যের বিন্দুমাত্র ত্রুটি করবে না। এ উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী এবং মিত্র শক্তির পূর্ণ সহযোগিতা গ্রহণ করবে। সে কারণেই মদীনা ছেড়ে মক্কার পথে খুব বেশি দুর অগ্রসর হওয়াতে অনেকের কাছে স্বাভাবিকভাবেই মনে হচ্ছিল যে, তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে।

(৮ ঃ ৬) কিন্তু তাঁরা মৃত্যু ভয়ে ভীত ছিলেন না। তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এত প্রবল ছিল যে, উমায়ের (রাঃ) স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যেতে চাইলেও রাসূলে করীম (সঃ) ছোট বলে তাঁকে সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেননি। উমায়ের তখন দুঃখ-হতাশায় এমনভাবে কাঁদতে শুরু করেন যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিতে বাধ্য হন। তিনি তখন খুশি আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। তাঁর বড় ভাই সা'দ ইবনে আবীওয়াক্কাস (রাঃ) তাঁকে যুদ্ধের সাজ পরিধান করতে সাহায্য করেন। (কানযুল-উম্মাল, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫৩-৫৭, নং ৫৩৭৫)

মুসলিম বাহিনী সিরিয়া থেকে আগত বাণিজ্য কাফেলাকে হয়ত মদীনার পশ্চিম দিকে এমনকি উত্তর দিকে থাকতেই পথ রোধ করতে পারতো। রাসূলে করীম (সঃ) সিরিয়ায় বিশেষ গোয়েন্দা বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা পথ চলছিলেন বাণিজ্য কাফেলার সিরিয়া যাওয়ার পথে তাদের পদচিহ্ন ধরে। মক্কায় ফিরতি পথে তাদের গতিবিধি সম্পর্কে মদীনাকে অবহিত রাখাই ছিল গোয়েন্দা বাহিনীর মূল উদ্দেশ্য। (ইবনে সা'দ, খণ্ড ২/১, পৃঃ ৬) তদানীন্তন আমলে টেলিগ্রাম, টেলিফোন অথবা অল্প সময়ের মধ্যে যোগাযোগ এবং খবর আদান-প্রদানের কোন ব্যবস্থা ছিলো না। কেবলমাত্র উষ্ট্রারোহীর পক্ষেই একটি উটের কাফেলা সম্পর্কে খবর দেয়া সম্ভব ছিল। সেক্ষেত্রে সিরিয়া থেকে ফিরতি পথে একজন উষ্ট্রারোহী উটের বহরের চেয়ে বড়জোর এক কি দুদিন আগে হয়ত মদীনায় খবর পৌঁছাতে পারত। এমনকি সেনাবাহিনী যদি সরাসরি পশ্চিম উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়, তবু বাহিনী সাজানো, যাত্রার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধানের কাজে দিন কয়েক সময় লেগে যাওয়ার কথা। এটা নিশ্চিত যে, একটি সামরিক বাহিনীর চেয়ে বড় আকারের একটি বাণিজ্য কাফেলা ছিল কম গতিসম্পন্ন তবু দলনেতাগণ দুটি স্টেশনের মাঝে বার বার তাদের গতি পরিবর্তন করেন এবং নিরাপদে থাকার জন্যে তাঁরা দক্ষিণের পথ ধরে মক্কার দিকে অগ্রসর হন। সেখানেই তারা মদীনার উত্তরের দেশ সিরিয়া থেকে আগত বাণিজ্য কাফেলার উপর চড়াও হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্তের পিছনে আরো কতগুলো কারণ থাকতে পারে। যেমন—দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের সংগে ইতিমধ্যে তাঁদের বন্ধুত্ব এবং মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে উঠে। কিন্তু উত্তরের অধিবাসীদের সংগে তেমন সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং বাণিজ্য কাফেলাকে অবরুদ্ধ করার ক্ষেত্রে দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদেরকে প্রতিবন্ধকতার পরিবর্তে হয়ত একটি সহায়ক শক্তি হিসাবে

কাজে লাগান যেত। তাছাড়া সেখানে তাঁদের উপস্থিতি ছিল স্থানীয় জনগণের উল্লেখযোগ্য উপার্জনের একটি উৎস। সম্ভবত বদর প্রান্তরের বিশাল বিস্তৃতির কারণে আত্মগোপন ও তৎপরতা চালানোর সুবিধা ছিলো বলেই তাঁরা এই পথটি গ্রহণ করে থাকবেন।

সময়টা ছিল রমযান মাস। দিনের বেলা সূর্যের উত্তাপ ছিলো অত্যন্ত প্রখর। এক কি দুদিন যাত্রার পর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সংগী-সাথীদেরকে সফরের সময়ে রোযা ভাংগার অনুমতি দিলেন। মদীনা থেকে যাত্রা শুরু করার সময় রাসূলে করীম (সঃ) তাঁর একজন ডেপুটি নিয়োগ করলেন। সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পন্ন করাই ছিলো তাঁর প্রধান কাজ। মুসলিম সেনারা তাঁদের নিজ নিজ গোত্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন দলে সংগঠিত হলেন। গুরুত্বপূর্ণ পশ্চাৎ বাহিনীর অধিনায়কের দায়িত্ব পেলেন হযরত কায়েস আল-মাযিনী (রাঃ) নামের একজন আনসার। (তাবারী ১, ১২৯৯) এখানে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। বদরের দিকে যাত্রাকালে রাসূলে করীম (সঃ) নির্দেশ দিলেন যে, উটের গলায় ঝুলন্ত ঘন্টাধ্বনি এবং এ জাতীয় সমস্ত জিনিস সরিয়ে ফেলতে হবে। স্পষ্টতই এটা ছিল একটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং রাতের আঁধারে বাহিনীর গতিবিধি গোপন রাখাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। (ইমতা, মাকরিযী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৮)।

সমুদ্র উপকূলের কাছেই বদর অবস্থিত। এটা ছিল বড় একটা স্টেশন। বাণিজ্য কাফেলাগুলো সাধারণত এখান দিয়েই যাতায়াত করত। এটা ছিল সিরিয়া, মক্কা ও মদীনার রাস্তাগুলোর মিলনস্থল। এতকিছুর পরেও কুরাশয়-দের বাণিজ্য কাফেলার যখন বদরে আসার কথা ছিল, তার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে তিনি সেখানে পৌঁছতে সমর্থ হন।

রাসূলে করীম (সঃ) অবশ্যই বরাবরের মতো একটি অপরিচিত পথে এসে-ছিলেন। চলতি পথে তিনি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষক বা সন্ধানী দল প্রেরণ করেন। (তাবারী, ১, ১২৯৯, ১৩০৩) কখনো কখনো আবার তিনি নিজে দল ছেড়ে পর্যবেক্ষণ বা গুপ্তচরের দায়িত্ব পালন করেন। দু'একজন সংগী-সাথী নিয়ে ঘুরে বেড়ান এক উপত্যকা থেকে অন্য উপত্যকায়। কখনো তার অভি-যান সফল হয়, কখনো আবার এমনিতেই ফিরে আসেন। একবার এভাবে ঘোরাফিরার সময় তিনি দামরাহ বেঈইনের নিকট থেকে শত্রু সম্পর্কে গুরুত্ব-পূর্ণ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। (ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ৩৬৪, ইবনে হিশাম,

পৃঃ ৪৩৫, তাবারী, প্রথম খণ্ড, ১৩০২) বদরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে উষ্ট্রারোহী যে পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ করেন (তাবারী, প্রথম খণ্ড, ১৩০৫, ইবনে সাদ খণ্ড ২/১ পৃঃ ১৬) তাঁরা বদরের একেবারে অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। ভাবটা এমন যে, তারা কুয়া থেকে পানি পান করার জন্যে যাচ্ছেন। তাঁরা সেখানে দুটি বালিকার কথোপকথন শুনতে পান। তাদের নিকট থেকেই জানতে পারেন বাণিজ্য কাফেলার আসন্ন উপস্থিতি সম্পর্কে এবং বাণিজ্য কাফেলার সেবাযত্ন করে একজনে যা উপার্জন করবে তা দিয়ে সে কিভাবে অন্য জনের পাওনা পরিশোধ করবে—সে বিষয়ে তারা কথা বলছে। পর্যবেক্ষক দলের জন্যে এ সংবাদ টুকুই ছিল যথেষ্ট। দ্রুত তারা শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানেই তারা শত্রুর অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকেন। সিদ্ধান্ত নেন যে, বাণিজ্য কাফেলা যখন উত্তর দিকের সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে বদরে প্রবেশ করবে, তখনই তাঁরা কাফেলার গতিরোধ করবেন।

আমরা দেখেছি যে, বাণিজ্য কাফেলা একথা জেনে যায় যে, ইতিপূর্বে মুসলমানরা যেভাবে আরো ৬-৭টি মক্কার বাণিজ্য বহরকে পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, সিরিয়া যাত্রাকালেও মুসলমানরা তাদের দলকে পশ্চাদ্ধাবন করে। যদিও তাদের সে প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে মুসলিম প্রভাবাধীন এলাকায় এসে আসন্ন সংকটের কথা ভেবে তাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়। প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইসলাম পূর্ব যুগে লুটতরাজের জন্যে গিফার অঞ্চলের গোত্রগুলোর কুখ্যাতি ছিল সর্বত্র। এমনকি তীর্থযাত্রার পবিত্র উটগুলোকে পর্যন্ত তারা লুট করতে দ্বিধাবোধ করত না। তারাও এই বদর অঞ্চলে বসবাস করত। (আবুযর গিফারী, মনজুর আহসান গিলানী, ২য় সংস্করণ, করাচী, পৃঃ ১৮) ইসলাম প্রচারের প্রথম লগ্নে আবুযর গিফারী (রাঃ) মক্কায় এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলে করীম (সঃ) অত্র এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্যে বছর কয়েক পূর্বে তাকে নিয়োগ করেছিলেন। আন্দাজ করা যেতে পারে যে, তাদের নতুন ধর্মের শত্রুদের হয়রানি ও উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখার জন্যে কিছু সংখ্যক নবদীক্ষিত মুসলমানের উদ্যোগ-উদ্দীপনাকে একই ধারায় এবং অন্যান্য উপায়ে পরিচালিত করা যেতো। এবং কুরায়শদের বাণিজ্য কাফেলাও ছিল শত্রু বলে চিহ্নিত দলের অন্তর্ভুক্ত। ফলে স্বাভাবিক কারণেই বাণিজ্য কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ান ছিলো উদ্বিগ্ন ও শংকিত। সুতরাং সে বদর-হুসাইন-এর (আল-শামী, সিরাহ) মোড়ে এসে যাত্রায় বিরতি

টানে এবং বদরে অবস্থান করাটা নিরাপদ হবে কিনা, না সরাসরি বদর অতিক্রম করে চলে যাবে, তা যাচাই করে দেখার জন্যে নিজেই শিবির থেকে বেরিয়ে পড়ে। সূর্যের উত্তাপ ছিল খুবই প্রখর। আবু সুফিয়ান কেবলমাত্র রাত্রিতে পথ চলতো, আর দিনের বেলা ছাউনি ফেলে বিশ্রাম করতো। আবু সুফিয়ান অবশ্যই সাজ-সকালের দিকে বদরে পৌঁছে ছিলো। এখানে কুয়ার আশেপাশে সব সময়ই লোকজন থাকতো। তারা কথা বলত নানা বিষয়ে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে আবু সুফিয়ানের পরিচিতি ছিলো। কুয়ার আশে পাশের কেউ কেউ হয়ত তাকে চিনে থাকবে। সম্ভবত জুহায়নী গোত্র প্রধান মাজিদী ইবনে আমর আবু সুফিয়ানের আগমন সংবাদ পেয়ে সে অবশ্যই আবু সুফিয়ানকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে এবং তার সংগে সাক্ষাৎ করার জন্যে নিজের তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে। (ইবনে কাসীর, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৬৫) মাজিদী বসবাস করত ইয়ানবুর নিকটে। বিরাট এই বাণিজ্য কাফেলা যাচ্ছিলো বদর দিয়ে। এমতাবস্থায় মাজিদীর বদরে উপস্থিতি থেকেই এই বাণিজ্য বহরের যে কত গুরুত্ব ছিলো তা বোঝা যায়। যাহোক বদরের এ সব লোক মুসলিম বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে কিছুই জানতো না। মাজিদী আবু সুফিয়ানকে জানান যে, কেবলমাত্র দুজন উষ্ট্রারোহী আগন্তুক পানি পান করার জন্যে কুয়ার কাছে অবতরণ করেছিলো। তারা ব্যতীত অন্য কেউ এখানে আসেনি এবং সন্দেহ করার মত আর কোন বিষয় তার জানা নেই। মুসলমান উষ্ট্রারোহীরা যেখানে অবতরণ করেছিলেন আবু সুফিয়ান সেখানে ছুটে যায় এবং পদচিহ্ন ধরে এমন এক স্থানে এসে পৌঁছে, যেখানে উটের কাঁচা গোবর ছিলো। সে একদলা গোবর হাতে নিয়ে তা ভেংগে ফেলে। অভ্যন্তরে দেখতে পেলো খেজুরের বীচি। অমনি সে চিৎকার করে বলে উঠলো, "প্রভুর শপথ! এই উটগুলো এসেছে মদীনা থেকে। কারণ এ স্থানীয় উটের খাবার হতে পারে না এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এগুলো মুহাম্মদ (সঃ)-এর উট।" অতঃপর আবু সুফিয়ান দ্রুত বাণিজ্য কাফেলার কাছে প্রত্যাবর্তন করে। বাণিজ্য কাফেলাকে উদ্ধার করার অনুরোধ জানিয়ে মক্কার দ্রুতগামী একজন উষ্ট্রারোহীকে পাঠিয়ে দেয়। আবু সুফিয়ান এবার কাফেলার গতিপথ পরিবর্তন করে। বদরে যাওয়ার পরিবর্তে অগ্রসর হয় সমুদ্র-উপকূল ধরে। এক নাগাড়ে দুই রাত পথ চলে। এভাবে মুসলমানদের আক্রমণ থেকে বাণিজ্য কাফেলাকে বাঁচিয়ে নিরাপদে পৌঁছে যায় মক্কায়। (ইবনে হিশাম, পৃঃ

৪৩৭) অবশ্য মক্কায় পেঁছার পূর্বেই আবার দূত পাঠিয়ে খবর দেয় যে, নিরাপত্তার জন্যে তার কোন সাহায্যকারী বাহিনীর দরকার নেই।

প্রথম সংবাদবাহী মক্কায় পৌঁছেই তাদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে একটি পাহাড়ের শীর্ষে আরোহণ করে। সে সম্পূর্ণ উলংগ হয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে এই দুর্যোগের কথা। সংবাদ শুনে মক্কাবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই ক্রধে-আক্রোশে ফেটে পড়ে। কারণ, মক্কার প্রায় সব পরিবারেরই কাফেলার সংগে বৈষয়িক বাণিজ্যিক অথবা অন্য রকম স্বার্থ জড়িত ছিলো। তারা ব্যাপক প্রস্তুতির সময় পেলো না। এমনকি তারা মিত্রদের আগমনের জন্যে অপেক্ষা পর্যন্ত করলো না। পার্শ্ববর্তী আহাবিশ এবং হাজার খানেক সৈন্য সমেত তারা তৎক্ষণাৎ বদরের উদ্দেশে যাত্রা করে। এদের মধ্যে এক শত ছিল অশ্বারোহী। অবশ্য আহাবিশকে তারা পরবর্তী সময়ে প্রত্যাখ্যান করে। যাহোক, বাণিজ্য কাফেলার নিরাপত্তার সংবাদ নিয়ে আবু সুফিয়ানের দ্বিতীয় দূত মক্কায় পৌঁছার পরও মক্কাবাসীরা তাদের বদর অভিযানের কর্মসূচী প্রত্যাহার করেনি। এটা দ্বারা এ কথাই বোঝায় যে, বাণিজ্য কাফেলা এবং বদর অভিমুখী কুরায়শ বাহিনী একই পথ ধরে চলাচল করেনি। বরং তাদের পথ ছিল দুটো। পথ একটি হলে মাঝপথে এ দু'টি দলের পরস্পরের সংগে সাক্ষাৎ হত। কিন্তু ইতিহাসে এ ধরনের কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবত তাদের কলংককে চিরদিনের জন্যে মুছে ফেলার লক্ষ্যেই বদরের উদ্দেশে তারা তাদের অভিযান অব্যাহত রাখে।

মক্কায় এই বাহিনী বদরে পৌঁছতে কম করে হলেও এক সপ্তাহ সময় লেগেছিলো। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বাণিজ্য কাফেলা নিরাপদে পালিয়ে যাওয়ার পরেও রাসূলে করীম (সঃ) কেন এতদিন বদরে অপেক্ষা করলেন? কেন তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন না? মদীনাইতো ছিল তার ঘাঁটি ও সুরক্ষিত স্থান। এই প্রশ্নের একটি উত্তর এ রকম হতে পারে যে, তিনি এই অভিযানের সুবিধাটুকুর সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় গোত্রগুলোর সংগে যোগাযোগ স্থাপন, সম্ভব হলে তাদের সংগে বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর চুক্তি সম্পন্ন করা। এভাবেই মক্কার বাণিজ্য কাফেলা যে অঞ্চল দিয়ে সিরিয়া আসা-যাওয়া করে সে অঞ্চল পর্যন্ত তার প্রভাব বলয় সম্প্রসারিত করা। ইতিপূর্বে প্রথম হিজরীতে জুহায়না গোত্রের একটি শাখার সংগে মুসলমানদের মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক বিবরণীতে দেখা

যায় যে, হিজরী দ্বিতীয় সালে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সংগে বনু দামরাহ, বনু মুদলিজ, বনু যুরাহ এবং বনু রাবিয়াহ-এর সংগে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে কিছু কিছু মৈত্রী চুক্তি হয়ত বদর অভিযানের সময় সম্পন্ন হয়ে থাকবে। এসব গোত্র বসবাস করতো লোহিত সাগর এবং বদরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং এ অঞ্চলের মধ্য দিয়েই চলে গেছে মক্কা থেকে সিরিয়া যাতায়াতের পথ।

এমনও হতে পারে যে, রাসূলে করীম (সঃ) যখন কুরায়শদের বাণিজ্য কাফেলার মুখোমুখি হওয়ার আশা করছিলেন, তখন তিনি উত্তর দিকের সংকীর্ণ পথের আশেপাশে কোথাও অবস্থান করছিলেন। সম্ভবত পরবর্তী সময়েও তিনি একই জায়গায় অবস্থান করতে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, মক্কা থেকে বিপুল সংখ্যক সৈন্য বদরের দিকে ছুটে আসছে, তখন তিনি তাদের মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেন। সাহাবায়ে কিরামের কারো কারো বদরের বিস্তৃত ভূ-খণ্ডের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভাল জানাশোনা ছিল। তাঁদের পরামর্শক্রমে প্রিয়নবী (সঃ) তাঁর বাহিনী নিয়ে চলে গেলেন বদরের দক্ষিণ সীমান্তে। প্রয়াস চালালেন পানির সরবরাহ ব্যবস্থাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার। ফলে শত্রুপক্ষ পানি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হলো (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৩৯)।

মক্কার কুরায়শরা বদরে এসেছিল বাদ্যযন্ত্র নিয়ে। তাদের অন্তরে ছিল নিশ্চিত বিজয়ের চিন্তা। অথচ সকল ব্যাপারে এমনকি যানবাহনের ব্যাপারেও মুসলিম বাহিনীর সীমাবদ্ধতা ছিল। দু'তিন জন সৈন্যের জন্যে বরাদ্দ ছিল একটি উট। কিন্তু তাদের মনোবল ছিল খুবই প্রবল। নিম্নের ঘটনা থেকেই তা প্রমাণ করা যায়ঃ হুযায়ফা ইবনে আল-ইয়ামন নামে একজন ইয়ামনী বর্ণনা করেছেন যে, "এমনিতে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আমার সামনে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল। বাধা এল এই ঘটনা থেকে যে, আমার পিতা এবং আমি যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি এবং মক্কার পথ ধরে অগ্রসর হই, তখন মক্কার লোকেরা আমাদের গ্রেফতার করে। তারা সন্দেহ করে যে, আমরা ইসলাম ধর্ম কবূল করেছি এবং আসন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্যে আমরা সেখানে যাচ্ছি। তখন আমরা তাদের এ ব্যাপারে নিশ্চিত করি যে, আমরা মদীনায় যাচ্ছি ব্যক্তিগত কাজে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার কোন প্রবৃত্তি আমাদের নেই। তারাও এই মর্মে

শপথ নেয়ার পরই আমাদের মুক্তি দেয়। অতঃপর আমরা বদরে আসি এবং নবীজীকে খুলে বলি সমস্ত ঘটনা। তখন তিনি আমাদের মদীনা যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। হুকুম দিলেন ওয়াদা পালনের এবং বললেন, কুরায়শদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন আমাদের সাহায্য করবেন।" (কানযুআল উম্মাল, খণ্ড ৫, নং ৫৩৪৮)।

বদরের অভ্যান্তরভাগে পৌঁছার পর রাসূলে করীম (সঃ) কয়েকজন সংগী-সাথী নিয়ে সমতল ভূমির উপর ঘোরাফেরা করলেন। যে স্থানে কুরায়শ বাহিনীর প্রধানরা নিহত হবে, অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তিনি সংগী-সাথীদেরকে সে স্থানটি দেখালেন। (তাবারী ১, ১২৮৮, ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৩৫) নবী-জীর এই অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন না করেও বলা যায় যে, রাসূলে করীম (সঃ) অবশ্যই শত্রু বাহিনীর বিভিন্ন সেনাপতি নিয়োগের ব্যাপারে অনুমান করতে পেরেছিলেন। মেধা এবং যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন পদ এবং প্রান্তভাগের সেনা পরিচালনার জন্যে কে কোন্ দায়িত্ব পাবেন প্রিয়নবী (সঃ) আন্দাজ করতে পেরেছিলেন সে সম্পর্কে। তিনি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও সাজিয়ে ছিলেন তদনুসারে। ইতিহাসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, শত্রু বাহিনীর সংগে যে সব প্রসিদ্ধ নেতা বদরে আসে, তাঁদের নাম জানার জন্যে রাসূলে করীম (সঃ) বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

যুদ্ধ-বিগ্রহ সাধারণত সকালের দিকে শুরু হয়। সে কারণেই প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মুসলিম বাহিনীর সমাবেশের জন্যে এমন একটি স্থান নির্বাচন করলেন যে, শত্রু সেনারা যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে আসলে উদীয়মান সূর্যের তীক্ষ্ণ রশ্মি যেনো মুসলিম বাহিনীর চোখে পড়ে চোখ ঝলসিয়ে না দিতে পারে। (মাগাজী, আল-ওয়াকিদী)। বরং সূর্যের রশ্মি শত্রু সেনাদের চোখের উপর প্রতিফলিত হবে এবং তাদের সহজ-স্বচ্ছন্দ গতিকে বিঘ্নিত করবে।

বদরের বিশাল ভূখণ্ড সম্পর্কে দেয়া প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের বিবরণ পূর্ণাঙ্গ এবং স্পষ্ট নয়। হতে পারে যে, বিগত ১৪০০ বছরে সেখানে কিছুটা প্রাকৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে তাদের উল্লিখিত নির্ঝরিণী উল্লেখ করা যেতে পারে। যা হোক প্রকৃতপক্ষে সেখানে একটি নালা আছে। এটা অনেকটা ভূগর্ভস্থ খালের মত এবং বদরের মূল অংশ থেকে আল-আরিশ পাহাড়ের দিকে প্রবাহিত। অতঃপর নালাটি চলে গেছে মরূদ্যানের দিকে এবং ক্রমান্বয়ে ইহা সমতল ভূমির দিকে উঠে এসেছে। আল-আরিশ মসজিদের

কাছাকাছি ত্রিশ ফুট দূর থেকে নালাটি প্রবাহিত হয়েছে ভূমির উপরিভাগ দিয়ে। আল-আরিশের মসজিদটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত বলে স্বাভাবিক কারণেই খানিকটা খনন কার্য করে অযুর জন্যে চৌবাচ্চা নির্মাণ করতে হয়েছে এবং ভূগর্ভস্থ নালা থেকেই চৌবাচ্চায় পানি আসে।

সম্ভবত রাসূলে করীম (সঃ) বদরের প্রান্তরে শত্রুসেনাদের পৌঁছার পর উপত্যকার নিকট প্রান্ত থেকে সরে এসেছিলেন। তিনি শিবির স্থাপন করে-ছিলেন আল-আরিশ পাহাড়ের আশেপাশে কোথাও। শত্রু সেনারা ছাউনি ফেলেছিলো দক্ষিণ প্রান্তে, উপত্যকার দূরপ্রান্তে। মুসলিম বাহিনী সেখানে বড় বড় কতগুলো গভীর গর্ত খনন করে। নালার পানির প্রবাহকে সরিয়ে দেয় গর্তের দিকে। এর পশ্চাতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল দু'টি। প্রথমত, শত্রু-শিবিরের দিকে যাতে পানির প্রবাহ না যায় তা বন্ধ করা এবং নালার পানি থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা। দ্বিতীয়ত, পানির মওজুদ ভাণ্ডার গড়ে তোলা এবং মুসলিম সৈন্যদের জন্যে পানি সরবরাহ অধিকতর সহজলভ্য করা। ঐতি-হাসিকগণের তথ্য বিবরণীতে জানা যায় যে, রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) থাকতেন বদরের প্রান্তরে একটি লাল তাঁবুতে।

যুদ্ধের বিবরণ

মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিলো তিন শতের কিছু উপরে। ঘোড়া ছিলো মাত্র দুই কি তিনটি। (ইবনে সা'দ, খণ্ড ২/১, পৃঃ ৬-৭, ১২, ১৫ ঃ তাবারী ১/১২৯৮, ১৩০৪) মুসলিম টহলদার বাহিনী শত্রুপক্ষের কয়েকজন পানি বহনকারীকে গ্রেফতার করেছিল। গোয়েন্দা বিভাগ তাদের নিকট থেকে জানতে পারে যে, শত্রু বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা নয় শ থেকে এক হাজারের মধ্যে। (ইবনে সা'দ, খণ্ড ২/১, পৃঃ ৯, তাবারী, তারিখ, ১, ১৩০৪) এই সূত্র মতে জানা যায় যে, তাদের অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিলো একশ। যুদ্ধ বিদ্যায় অতি পারদর্শী এবং সৈন্য পরিচালনায় অতি দক্ষ নেতৃত্ব ছাড়া এ ধরনের অসম যুদ্ধ বেশিক্ষণ স্থায়ী হওয়ার কথা নয়। তিরমিযী শরীফের (আবওয়াবুল জিহাদ) বিবরণ অনুসারে যুদ্ধের পূর্ব রাতেই যুদ্ধের ময়-দানে মুসলিম বাহিনীর শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানোর আয়োজন চূড়ান্ত করা হয়েছিল। খুব ভোরে রাসূলে করীম (সঃ) তাঁর ছোট বাহিনীকে অগ্রপশ্চাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন। সৈন্যরা তীরের মত সোজা ও বিন্যস্তভাবে দাঁড়াতে পারলো কিনা প্রিয় নবী (সঃ) অত্যন্ত যত্নের সংগে তা পরীক্ষা করে

দেখেন। তাঁর হাতে ছিলো ছোট মোটা একটি লাঠি। যখনই তিনি দেখেছেন যে, কোন সৈন্য যথাযথভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারেনি, তখনই তিনি প্রয়োজনবোধে তাঁকে লাঠি দিয়ে ঠেলে হয় সামনে নয়তো পেছনে সরিয়ে দেন। (তাবারী, ১/১৩১৯, ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৪৪) অতঃপর তিনি প্রান্তভাগের সৈন্যদের পরিচালনার জন্যে একজন করে সেনাপতি মনোনীত করেন। আল ওয়াকিদী (মাগাজী-র) বর্ণনা মতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন ডান প্রান্তের অধিনায়ক। কিন্তু এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ অন্য ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা মতে জানা যায় যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) সারাক্ষণ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সংগে পর্যবেক্ষণের জন্যে নির্মিত কুঁড়ে ঘরে অবস্থান করেছিলেন। অবশ্য হযরত আলী (রাঃ)-এর সূত্রে এ ধরনের একটি বর্ণনা আছে যে, বদরের যুদ্ধের দিনে মুসলিম সৈন্যরা প্রিয়নবী (সঃ)-এর পশ্চাতে গিয়ে আশ্রয় নেন। কারণ সেদিন তিনি ছিলেন সবচেয়ে সাহসী ও নির্ভীক যোদ্ধা। (সহীহ আল-মুসলিম ৩২/৭৯) মুসলমান সেনারা তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত ছিল। প্রথমটিতে ছিল মক্কার মুহাজিরগণ, দ্বিতীয়টিতে আউস ও তৃতীয়টিতে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা। যুদ্ধের ময়দানে তাঁরা অবস্থান নিয়েছিলেন নিজ নিজ গোত্রের পতাকা তলে। (তাবারী, ১/১২৯৭) দিনের বেলা ব্যবহারের জন্যে তিনটি দলের তিনটি সংকেত বাক্য ছিল বলে জানা যায়। (বালাজুরী, আনসাব, ১,২৯৩ ঃ ইবনে কাসীর, খণ্ড-৩, পৃঃ ২৭৪) তবে বিভিন্ন দলে তাদের সংখ্যা সমান ছিল না। যে কারণে সৈন্যদেরকে কেবলমাত্র গোত্রীয় বন্ধনের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ না করে কয়েকটি দল বা শাখায় বিন্যস্ত করাও হতে পারে।

মুসলিম বাহিনীর প্রতি প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নির্দেশাবলী

সাধারণ সৈন্যগণকে যথাযথভাবে সাজানোর পর রাসূলে করীম (সঃ) সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো নির্দেশ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, তদানীন্তন পৌত্তলিক ও নাস্তিক্যবাদী বিশ্বে এটাই যমীনের বুকে একমাত্র আপোসহীন সৈন্য বাহিনী যাঁরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতেন এবং বদরের যুদ্ধের দিনে স্বয়ং রাসূলে করীম (সঃ) আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করার সময় বলেন, "হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, তুমি তাঁদের সাহায্য কর। যদি তারা নির্মূল হয়ে যায় তাহলে ভবিষ্যতে আর কেউ তোমার ইবাদত-বন্দেগী করবে না।" (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৪৪) প্রিয়নবী

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর যুগে এমন প্রশংসাবাণী শুনে আদর্শবাদী মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা অবশ্যই বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিলো। রাসূলে করীম (সঃ) সৈন্যদেরকে কতগুলো বাস্তব নির্দেশ প্রদান করে বলেছিলেন যে, "ছোটাছুটি করে লাইন ভংগ করনা, বরং সঠিক জায়গায় অবস্থান কর, আমি নির্দেশ দেয়ার পূর্বে যুদ্ধ শুরু করবেনা। শত্রু সেনারা যখন নাগালের বাইরে থাকবে তখন তীরের অপচয় করো না, তারা যখন তোমার আয়ত্তের মধ্যে আসবে, কেবলমাত্র তখনই তীর ছুঁড়বে, শত্রুসেনারা যখন তোমাদের দিকে অগ্রসর হবে, তখন দু'হাতে সজোরে পাথর ছুঁড়বে, যখন তারা আরো কাছাকাছি আসবে, তখন বল্লম ও বর্শা নিক্ষেপ করবে, তলোয়ার কোষমুক্ত করবে একেবারে শেষে হাতে হাতে যুদ্ধের সময়।" (ইবনে হিশাম, ৪৪৩, বুখারী ও আবূ দাউদ হতে মিশকাত। কানযুল উম্মাল খণ্ড-৫, নং ৫৩৫০-এ বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে) প্রত্যেক মুসলিম সৈন্যকে তার পাশে যথেষ্ট পরিমাণ পাথর জমা করে রাখতে হয়েছিলো। বস্তুতপক্ষে এই পাথরগুলোই ছিল সে আমলের গ্রেনেড। মুসলিম বাহিনী প্রতিরক্ষা কৌশল অবলম্বন করেছিল বলে এ ব্যবস্থা ছিলো তাঁদের জন্যে খুবই বাস্তবসম্মত। কিন্তু শত্রুসেনারা ছিলো আক্রমণাত্মক ভূমিকায়। তারা এগিয়ে আসছিলো তাদের মূল ঘাঁটি থেকে। ফলে ইচ্ছা করলেও তারা দু'একটির বেশি পাথর বহন করতে পারতো না।

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বিখ্যাত অনুশাসন মূলক বাক্যটি ছিল নিম্নরূপঃ "আল্লাহ্ তা'আলা সকল বিষয়ে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন, সুতরাং তুমি যখন কাউকে হত্যা কর, তাকে হত্যা করবে সুন্দর ও শালীনভাবে।" বস্তুতপক্ষে তার এই অনুশাসনের মধ্যে যে নৈতিক রুচি ও সৌন্দর্যবোধ রয়েছে তার কোন তুলনা হয় না। (সহীহ্ মুসলিম, ৩৪/৫৭) ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ, যে যুদ্ধে নবী করীম (সঃ) ব্যক্তিগতভাবে অংশ নিয়েছিলেন—সম্ভবত সেই বদরের যুদ্ধের সময় তিনি এই বিধানটি জারি করেছিলেন। অকারণে অত্যাচার-উৎপীড়নের মাধ্যমে হত্যা এবং শিশু ও নারী হত্যাকে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে বাবুর্চি, কাজের লোক এবং শত্রুপক্ষের এমন লোকজনকে হত্যা না করতে যারা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ করছে না।

বদরের যুদ্ধ প্রসংগে কুরআনুল করীমে যুদ্ধের চমৎকার একটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। সূরা আনফালে উল্লেখ আছে যে, "এবং তাদের স্কন্ধে ও

সর্বাংগের সংযোগ স্থলসমূহে আঘাত কর।" (৮ঃ১২) এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুকে চরম পরিণতির দিকে ঠেলে না দিয়ে তাকে অক্ষম করে দেওয়া যাতে সে আর যুদ্ধ করতে না পারে। এ ধরনের ব্যবস্থা হাতা-হাতি যুদ্ধের রক্তপাতকে যথা সম্ভব কমিয়ে দেবে। অথচ যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্যও বিঘ্নিত হবে না।

মুসলমান সৈন্যদের একই ধরনের কোন পোশাক ছিল না। মুসল-মানদের যেটুকু ছিল, কুরায়শদের ছিল তার চেয়ে অনেক কম। শত্রু থেকে দলের লোকদের বিশেষভাবে পৃথক করার জন্যে তারা কতগুলো সংকেত বাক্য ব্যবহার করত। দ্বৈত যুদ্ধের সময় উভয়পক্ষই সজোরে এই সংকেত বাক্যগুলো উচ্চারণ করতো। আল ওয়াকিদী-এর বর্ণনা মতে (মাগাজী) মুসলমানদের এ রকম একটি সাধারণ সংকেত বাক্য ছিল—"হে বিজয়ী বীর, হত্যা কর।" ইবনে কাসীরের (খণ্ড-৩, পৃঃ ২৭৪) মতে 'আহাদ, আহাদ' ছিল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি বাক্য। অন্যান্য আরো সংকেত বাক্যের মধ্যে তাঁরা অশ্বারোহীর বেলায়, হে আল্লাহ্‌র অশ্বারোহী, মুহাজির-গণকে 'হে বনু আবদুর রহমান,' খাযরাজ গোত্রের লোকদের, 'হে বনু আবদুল্লাহ্', আউস গোত্রের সৈন্যদের, 'হে বনু উবায়দুল্লাহ্' বলে ডাকত। এ সংকেত বাক্যগুলোর ব্যাপারে কোনরকম রাখ-ঢাক ছিল না। কারণ, কেবলমাত্র নৈশ প্রহরার সময়ই এবং পূর্ণ দিবালোকে হাতাহাতি যুদ্ধের সময় এই সংকেত বাক্যগুলো দিয়েই তারা শত্রুদের মধ্য হতে নিজেদের লোকজনকে শনাক্ত করত। এখানে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো—মরণপণ লড়াইয়ের সময় শত্রুর মধ্য হতে বন্ধুকে কিভাবে চিহ্নিত করা হত? মুসলিম বাহিনীর পোশাকগুলো একই ধরনের না হলেও পোশাকের মাঝে একটি সাযুজ্যের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বদরের যুদ্ধ প্রসংগে আল্লাহ্ পাক যে আয়াত নাজিল করেছেন সেখানে 'চিহ্নিত ফেরেশতার' (৩ঃ১২৫) কথা বলা হয়েছে। এই আয়াতের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে তাফসীরে তাবারীতে বলা হয়েছে যে, এ সময়ে রাসূলে করীম (সঃ) নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে, "হে মুসলমানগণ, তোমাদের সাহায্যার্থে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন যে ফেরেশতাদের প্রেরণ করেছেন তাদের পার্থক্য-সূচক চিহ্ন রয়েছে। সুতরাং তোমাদেরও পার্থক্য সূচক চিহ্ন থাকুক।" তাফসীরকার আরও উল্লেখ করেছেন যে,----তোমাদের মধ্যে যাদের পক্ষে

সম্ভব তারা এক্ষণি পশমের গুচ্ছ জোগাড় করে শিরস্ত্রাণ এবং টুপিতে লাগাও। (তাফসীরে তাবারী [৩ ঃ ১২৫], কানযুল উম্মাল খণ্ড-৫, নং-৫৩৪৯)

কুরায়শ বাহিনীর গঠনশৈলী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। আল-ওয়াকিদী-এর বর্ণনা মতে (মাগাজী) ডানে এবং বামে তাদের পার্শ্ব বাহিনী ছিল মাত্র দুটি। একই সূত্র মতে আরও জানা যায় যে, কুরায়শ বাহিনীতে মোট তিনটি ব্যানার ছিল, যদিও এটা অদ্ভুত বিষয় ও কৌতূহলের ব্যাপার। সে আমলের প্রচলিত রীতি অনুসারে তারা বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় নির্দিষ্ট দূরত্বে এসে থাকে এবং দ্বৈত যুদ্ধের জন্যে চ্যালেঞ্জ করে। (ইবনে হিশাম-পৃঃ ৪৪৩)

রাসূলে করীম (সঃ) পূর্বের রাতটি আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগীর মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দিলেন। তার ছোট বাহিনীর গঠনশৈলী এবং অন্যান্য আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে সম্পন্ন করার পর নিকটস্থ স্টাফদের নিয়ে একটি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠলেন। এখান থেকে যুদ্ধের ময়দানের সম্পূর্ণ চিত্র সহজে নজরে পরত। তাঁর অনুমতিক্রমে এখানে একটি চালাঘর নির্মাণ করা হল। প্রসিদ্ধ 'আরিশ' পাহাড় একদিকে তাকে প্রখর রোদ থেকে আড়াল করে রাখছিল, অপরদিকে তাকে রক্ষা করেছিল শত্রু সেনাদের তীরবর্ষণ থেকে। কয়েকটি দ্রুতগামী উটকে সেখানে রাখা হল। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৩৯-৪০) এটা নিশ্চিত যে, প্রয়োজনের সময় প্রধান সেনাপতি এই উটগুলোর সাহায্যে অন্যান্য অধিনায়কের নিকট জরুরী নির্দেশগুলো প্রেরণ করতেন। তাছাড়া যুদ্ধ যদি অপ্রত্যাশিতভাবেই মুসলমানদের বিপক্ষে চলে যেত, তাহলে উর্ধ্বতন অধিনায়কবৃন্দ এই উটগুলোর সাহায্যেই যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে যেতে পারতেন। পাহাড়ের এই পর্যবেক্ষণ স্থান থেকে মদীনা যাওয়ার পথ ছিল উন্মুক্ত। তাবারীর (১,১৩২২) মতে আরিশের এই কুঁড়ে ঘরটা সযত্নে বাছাই করা সেনাদের দিয়ে প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বর্তমানে আরিশ পাহাড়ের নামকরণ করা হয়েছে এই কুঁড়ে ঘর থেকে।

আরিশ ও কবরস্থান পরিদর্শন

পরবর্তী সময়ে এই ঘরটিকে রূপান্তরিত করা হয়েছে একটি মসজিদে এবং মসজিদটিই রাসূল পাকের সেই ঘরের স্মৃতি বহন করছে। ১৯৩৯ সালে যেখানে একটি জুমা মসজিদ ছিল, যদিও মসজিদটির আকার-আয়তন ছিল বেশ ছোট। মসজিদে তিনটি শিলালিপি রয়েছে। তিনটিই আরবীতে লেখা।

একটি রয়েছে মিম্বরের উপরে দেয়ালের গায়ে, দ্বিতীয়টি মিহরাবের ঠিক উপরে এবং তৃতীয়টি মিহরাবের কাছে মেঝের উপরে। সাম্প্রতিককালের কোন সংস্কার ও পুনঃস্থাপনের কাজের কারণেই সম্ভবত তৃতীয় শিলালিপিটির এই অবস্থা হয়েছে। মসজিদের দেয়ালগুলো কাদামাটি দিয়ে ঢাকা। অভ্যন্তর ভাগে কোন ইট বা পাথর আছে কিনা তা দেখা যায় নি। অবশ্য মসজিদটির ভিত্তিভূমি পাথর দিয়ে তৈরী।

মিম্বরের উপরের শিলালিপিতে মামলুক রাজবংশীয় তুর্কী মিসর অফিসার কুশ কাদামের নাম লেখা রয়েছে। প্রতি লাইনে এক বা একাধিক ভুল শব্দ এবং বানান রয়েছে। তাতে মনে হয় এগুলো রচনার মূলে রয়েছে কোন অনারব। 'আহ্‌দ নববী কা ময়দানে জাংগ' শীর্ষক পুস্তকে (ডঃ কামালুদ্দীন) বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এখানে শুধু এ অনুবাদটুকু দেয়া হল যে, প্রথম লাইন—সেই আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময় এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষমাশীল।

দ্বিতীয় লাইন—এই পবিত্র স্থানের বেড়া নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন।

তৃতীয় লাইন—কুশ কাদামের দ্বারা, তিনি ছিলেন মিসরের একজন অফিসার এবং রাষ্ট্রীয় ভবনের নির্মাতা।

চতুর্থ লাইন—এই ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছিল ৯০৬ হিজরীর ২১শে রবিউল আউয়াল।

সউদী সরকার কর্তৃক পুরাতন মসজিদটি ভেংগে ফেলার পর এই ঐতিহাসিক শিলালিপিগুলো কি করা হয়েছে তা বলা যাচ্ছে না।

তাই বলা যেতে পারে যে, দশম হিজরীর শুরুতে এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিলো। মিহরাবের উপরের শিলালিপিটি তুঘরা স্টাইলে লেখা। আমার পক্ষে এর পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া পর্যাপ্ত আলোর অভাবে ছবি তোলাও সম্ভব ছিল না। এ ব্যাপারে বড়জোর এটুকু বলা যেতে পারে যে, লেখাটি ছিল মার্বেল পাথরের উপরে। পাথরটির আকার ৮০ বর্গ ইঞ্চির মত। তৃতীয় লিপিটি ছোট একটি বেলে পাথরের উপরে লেখা। হাতের লেখাটি খুবই খারাপ, যদিও বানানের দিক থেকে এটা অধিকতর নির্ভুল। লিপিতে উল্লেখিত কানলে-ফারাঘ থেকে প্রতীয়মান যে, এখানে মসজিদটির নির্মাণ প্রসংগেই বলা হয়েছে।

শহীদদের কবরগুলো বিশেষ ধরনের বেড়া দিয়ে ঘেরা। তুর্কী শাসনামলে মার্বেল পাথরের খুঁটি নির্মাণ করা হয়েছে। অতি উৎকৃষ্টমানের কারিগরি নৈপুণ্যের সংগে অংকিত ও লিখিত হয়েছে পাথরগুলো। এই স্থানটিকে অতি সুন্দর ও নয়নাভিরাম রূপ দেয়াই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। বর্তমানে এখানে ওখানে ছড়ানো ছিটানো মার্বেল পাথরের ভাংগা টুকরো ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট নেই। গোটা জিনিসটিই পরিণত হয়েছে একটি করুণা উদ্রেককর ধ্বংসাবশেষে। কবরস্থানের অনতি দূরেই রয়েছে ছোট একটি প্রস্তর। প্রস্তরের গায়ে উৎকীর্ণ অতীতের লিপিগুলো এখনো পড়া যায়।

পথপ্রদর্শকগণ জানিয়েছেন, যে স্থানে শহীদদের কবরস্থান রয়েছে, ঠিক সেখানেই বদরের যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করেছিলো। রাসূলে করীম (সঃ)-এর সেই প্রসিদ্ধ অনুশাসন বাণীর প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে পথপ্রদর্শকদের বক্তব্যকে সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়। নবী করীম (সঃ) বলেছিলেন, শহীদগণ যেখানে ইন্তিকাল করেছেন তাঁদের সেখানেই কবর দাও।

যুদ্ধের ফলাফল সকলেরই ভালভাবে জানা আছে। মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ১৪ জন মুসলমান যুদ্ধে শহীদ হলেন। কিন্তু তাঁদের ইন্তিকালের পূর্বে ৭০ জন কাফিরের মৃত্যু ঘটে। বন্দী হয় আরো ৭০ জন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫০৬-৫১৩) বন্দীদের প্রতি মুসলমানদের বিন্দুমাত্র আনুকূল্য প্রদর্শনের কোন কারণ ছিল না। তৎসত্ত্বেও তাঁরা বন্দীদের প্রতি দৃষ্টান্তমূলক ব্যবহার করেন। রাসূলে করীম (সঃ) বন্দীদেরকে মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেন। তাঁদের উপর অর্পণ করেন বন্দীদের নিরাপদ জিম্মাদারী। তাঁদেরকে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেন যে, বন্দীদের সংগে ভাল ব্যবহার করবে। (বুখারী ৫৬, ৪২) নবীজীর এই নির্দেশকে কেউ উপেক্ষা করলো না। যে সমস্ত বন্দীদের কোন পরিধেয় ছিল না, তাদেরকে পরিধানের জন্যে কাপড় দেওয়া হল, মুসলমানগণ যা খেলেন, তাদেরকেও সেই একই খাবার দেওয়া হল। কেউ কেউ আবার বন্দীদের রুটি খেতে দিলেন, আর নিজেরা ক্ষুধা মিটালেন সাধারণ খেজুর খেয়ে। এসব কিছুই তাঁরা করলেন ভাল ব্যবহার সম্পর্কে রাসূলে করীম (সঃ)-এর নির্দেশ অনুসারে। (তাবারী, ১,১৩৩৭, ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৫৯-৪৬০) কুরআনুল করীমে উল্লেখ আছে যে, বন্দীদের আহার দিতে হবে বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা না করে (৭৬ ঃ ৮-৯)

ইসলাম-পূর্ব যুগে বন্দীদের সংগে আচরণের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি ছিল না। কখনো তাদের হত্যা করা হত, কখনো আবার বাধ্য করা হত দাস জীবন গ্রহণে। বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রয়োগ করা হত। কখনো কখনো আবার কোনরকম বিনিময় ব্যতীত অথবা মুক্তিপণ পরিশোধের প্রেক্ষিতে অথবা শত্রুর হাতে বন্দী কারো বিনিময়ে তাদের মুক্ত করে দেওয়া হত। কিন্তু ইসলাম ধর্মে বদর যুদ্ধের পূর্ব থেকেই মুক্তিপণের নিয়ম চালু রয়েছে।

রাসূলে করীম (সঃ) মদীনার পথে দুই কি একদিন চলার পর তিনি পৌঁছে গেলেন ইসলামী হুকুমাতের অভ্যন্তরভাগে। সেখানে গিয়ে তিনি একটি পরামর্শ সভা ডাকলেন। বন্দীদেরকে হত্যা করার মত পর্যাপ্ত কারণ থাকা সত্ত্বেও মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। সাধারণ এক-জন বন্দীর মুক্তিপণ নির্ধারিত হল ৪০০০ দিরহাম। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৬২) এমনকি রাসূলে করীম (সঃ)-এর আপন আত্মীয় জনেরাও মুক্তিপণের এই বিধান থেকে অব্যাহতি পেল না। নবীজীর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) অবশ্যই ভাল কিছু পাওয়ার যোগ্য ছিলেন। কারণ তিনি ইসলামের পক্ষে মক্কায় একজন গুপ্তচর হিসাবে কাজ করতেন এবং স্থানীয় খবরাদি সম্পর্কে রাসূল (সঃ)-কে সব সময় অবহিত করতেন। তবুও তাকে মুক্তিপণ পরিশোধ করতে হয়। নওফল ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব নামে নবীজীর এক ভাইয়ের ছেলে ছিল। সে অস্ত্রের ব্যবসা করত। মুক্তিপণ হিসাবে তাঁকে এক হাজার বল্লম সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। (ইবনে হাজর, ইসাবাহ, নং ৮৩৩৬) এখানে বন্দী মুক্তির ব্যাপারে আরেকটি প্রথার উল্লেখ করা যেতে পারে। আরব বংশোদ্ভূত বন্দীদের উপর মুক্তিপণ হিসাবে ৪০ আউন্স রূপা দাবি করা হত (এক আউন্স রূপা ৪০ দিরহামের ওজনের সমান) এবং অনারবদের (নিগ্রো) জন্যে দাবি করা হত মাত্র এর অর্ধেক। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৫, নং-৫৩৬৭)। এতসব বিধি ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে যে নিয়মটি সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ছিল তা এই যে, রাসূলে করীম (সঃ) বন্দীদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তাদের প্রত্যেককে কেবলমাত্র দশ জন করে বালককে লেখাপড়া শেখাতে বললেন এবং তাদের এই শিক্ষাদানকেই গ্রহণ করলেন তাদের মুক্তিপণ হিসাবে। (ইবনে সা'দ, খণ্ড ২/১, পৃঃ ১৪, ১৭, ইবনে হাম্বল, খণ্ড ১, পৃঃ ২৪৬)। কিছুসংখ্যক বন্দীকে দারিদ্র্যের কারণে মুক্তিপণ ছাড়াই

ছেড়ে দেওয়া হল। তাদের নিকট থেকে শুধুমাত্র এই ওয়াদা নেওয়া হল যে, ভবিষ্যতে তারা আর কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসবে না। (তাবারী, ১, ১৩৪২-৫৪, ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৭১)। বদর যুদ্ধে এত সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল যে, বন্দীদেরকে চারদিনের পথ পায়ে হেঁটে মদীনায় আসতে হয় নি। (ইবনে সাদ, খণ্ড ২/১, পৃঃ ১৩)

মুসলমান এবং শত্রুপক্ষের সব মৃতদেহ কবরস্থ করা হলো। শত্রুপক্ষের কোন মৃতদেহের অংগ হানি বা কোনরকম অসম্মান অপমান করাকে কঠোর-ভাবে নিষিদ্ধ করা হলো।

রাসূলে করীম (সঃ) অবিলম্বে দু'জন সংবাদদাতাকে দ্রুতগামী উট নিয়ে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। একজন হলেন আলীয়াহ্ ও অপরজন সফিলাহ্। বদর যুদ্ধের মহান বিজয় সংবাদ সর্বত্র পেঁাছে দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৫৭) অনেকের কাছে ইহা অবিশ্বাস্য সুসংবাদ ছিল।

মদীনায় ফিরে আসার পথে এমন একটি ঘটনা ঘটে যা মানবিক দৃষ্টি-কোণ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামহুদী (২য় সংস্করণ, পৃঃ ১২৪৬) উল্লেখ করে-ছেন যে, যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে সুহায়ল ইবনে আমর ছিল ভীষণ রকমের ধূর্ত। ফিরতি পথে পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করার সময় সে একটা ফন্দি আঁটে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে তত্ত্বাবধায়কের কাছে অনুমতি চাইলো। তত্ত্বাবধায়কের দৃষ্টির আড়ালে যাওয়ার সংগে সংগে সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। পরে তাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু রাসূলে করীম (সঃ) তাঁর এ ধরনের প্রবঞ্চনা ও সামরিক অপরাধের জন্যে কোন শাস্তি দিলেন না। (পরবর্তীতে তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়েছিলেন)।

বিজয়ী বাহিনীর মদীনায় প্রবেশের সময়কার অবস্থা বর্ণনা করা অনা-বশ্যক। তাঁদের আনন্দ উল্লাসে অবশ্যই মিতাচারিতা ও সংযম ছিল। তবে এটা ছিল খুবই মহান এবং প্রাণবন্ত।

বদরের যুদ্ধের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াও নেহায়েৎ কম ছিলো না। জানা যায় যে, পর্যটকদের মাধ্যমে আবিসিনিয়ার রাজা মুসলিম বাহিনীর বিজয় সংবাদ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং ব্যাপকাকারে আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করেন। বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান শরণার্থী আবিসিনিয়ায় বসবাস করত। তাদের মাধ্যমেই নবীজীর সংগে আবিসিনিয়ার রাজার একটি অমায়িক এবং আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মুসলমানগণই ছিলেন আবিসিনিয়ায় তাঁদের

রাষ্ট্রদূত এবং ধর্মীয় নেতা। (ইবনে কাসীর, খণ্ড-৩, পৃঃ ৩০৭) সম্ভবত বদর যুদ্ধ সম্পর্কিত বর্ণনার এই অংশটি আশ শামীতে (সীরাহ ঃ বদর) বর্ণিত হয়েছে এভাবে যে, বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের পর মক্কাবাসীরা দুজন প্রতি-নিধিকে আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসীর কাছে প্রেরণ করে। এবং তাঁর রাজ্য থেকে মুসলমান শরণার্থীদের বের করে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানায়। সম্ভবত নবী করীম (সঃ) ও তাঁর গুপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে কুরাইশদের এই উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তিনি এই দুরভিসন্ধিমূলক উদ্যোগ মোকা-বিলার ব্যবস্থা নিলেন। তিনি দামরাহ গোত্রের আমর ইবনে উমাইয়াকে বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়ে দিলেন আবিসিনিয়ায়। মুসলমানদের রাজ্য থেকে বের করে দেয়ার জন্যে মক্কার তরফ থেকে আবিসিনিয়ার রাজাকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৭১৬)

অধ্যায় ৩

উহুদের ময়দানে

(৭ই শাওয়াল, তৃতীয় হিজরী। ২৪শে ডিসেম্বর, ৬২৪, সোমবার)

বদরের পরাজয়ের পর মক্কার কুরায়শদের মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ

স্থলপথে সিরিয়া এবং মিসরে যাতায়াতের পথটি মক্কার কুরায়শদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, বদরের প্রান্তরে প্রথম বিপর্যয়ের পরও তারা এই রাস্তাটি পরিত্যাগ করতে পারল না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক অভিযানের প্রস্তুতির জন্যে তারা আড়াই লক্ষ দিরহাম সংগ্রহ করে। এর মধ্যে তারা অপচয় বা অমিতব্যয়িতার কিছু দেখতে পায়নি। (আস-শামী, সিরাহ্, উহুদ) তাছাড়া বদরের যুদ্ধের সময় মুসলমানরা ৭০ জন কুরায়শ সৈন্যকে বন্দী করে। মুক্তিপণ দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে আনতে গিয়েও অনুরূপ অর্থ খরচ করতে হয়। গড়ে প্রত্যেক বন্দীর মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করতে হয় 4000 দিরহাম। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৫৫), আস-শামী (উহুদ)। অন্যান্য ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, কুরায়শরা তাদের স্থানীয় সেনাবাহিনী নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। এমনকি তারা পরিতৃপ্ত হতে পারেনি তাদের দীর্ঘদিনের ব্যবসায়ী বন্ধু আহা-বিশ গোত্রের সেনাবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে। তারা মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আরবের বিভিন্ন গোত্রের নিকট প্রেরণ করে। এদের মধ্যে ছিলেন আমর ইবনুল-আস, আবদুল্লাহ্ ইবনে আজ-জিবারা, হুবায়রা ইবনে ওয়াহাব, মুসাফি ইবনে আব্দ মানাফ, আবু আযযাহ্ আমর ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-জুহামী। তারা বিভিন্ন গোত্রের নিকট এমন একটি চিত্র তুলে ধরে যে, ইসলাম ধর্মের উত্থানের মধ্যে নিহিত রয়েছে একটি নবতর অশনি সংকেত। এখন প্রয়োজন মদীনার বিরুদ্ধে পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তারা তাদেরকে এই উদ্যোগে যোগ দেবার জন্যে আহবান জানায়। কুরায়শদের এই অভিযান এতখানি সফল হল যে, অসংখ্য বেদুঈন এই অভিযানে অংশ নেয়ার জন্যে তৈরী হলো।

মক্কায় রাসূল (সঃ)-এর গুপ্তচর হিসাবে কাজ করছিলেন তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)। বদরের যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ অন্যান্য মক্কাবাসীর সংগে তাঁকেও বন্দী করে। তাঁর নিকট থেকেও আদায় করে মুক্তিপণ। এত কিছুর পরেও গিফার গোত্রের একজন বেদুঈনের মাধ্যমে তিনি মক্কাবাসীদের সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন সম্পর্কে রাসূলে করীম (সঃ)-কে যথা সময়ে অবহিত করতে ভুল করলেন না। (ইবনে সা'দ, ২/১, পৃঃ ২৫) তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে কুরায়শ বাহিনী যখন অভিযান চালায়, মদীনার মুসলমানগণ তখন তৈরী হয়ে গেছেন। যাহোক কুরায়শ এবং তাদের মিত্র শক্তি মদীনা শহরের উত্তর দিকে উহুদ পর্বতের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করে।

উহুদ পর্বত

মদীনার উত্তর দিকের একটি পাহাড়ের নাম উহুদ। শহরের কেন্দ্রবিন্দু থেকে এর দূরত্ব প্রায় তিন মাইল। অপরদিকে মদীনার দক্ষিণে বহু দূরে মক্কা শহরে অবস্থিত কুরায়শ বাহিনী মক্কা থেকেই মদীনার বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। এটা একটি বিস্ময়ের ব্যাপার যে, মক্কার অবরোধকারী বাহিনী যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ দিক থেকে। কিন্তু তারা মদীনা মনওয়ারা আক্রমণ করার জন্যে মদীনার দক্ষিণে কোন ঘাঁটি স্থাপন করেনি। বরং তারা মদীনা অতিক্রম করে আরো কিছু দূর এগিয়ে যায়। তারা শিবির স্থাপন করে মদীনার উত্তর দিকে। ফলে তাদের পশ্চাদপসরণ এবং অতিরিক্ত শক্তি সংগ্রহের পথ বন্ধ হয়ে যায়। বিষয়টি সম্পর্কে আমি দেশী-বিদেশী অনেক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেছি। কিন্তু কেউ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

অবশেষে আমি যখন স্থানটি পরিদর্শন করার সুযোগ পাই, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করি বিস্তৃত ভূখণ্ড সম্পর্কে তখন যেন ব্যাপারটি আমার বোধ-গম্যতার মধ্যে এসে যায়। অথচ অতীতে বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য পুস্তকের পাতা উল্টান, প্রথিতযশা এবং সর্বজন স্বীকৃত পণ্ডিতবর্গের সংগে কথা ও যোগাযোগ সত্ত্বেও তা ছিল আমার কাছে অস্পষ্ট।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আমলে মদীনার অবস্থান এবং এর অবস্থা

লাভা দ্বারা গঠিত সমতল ভূমির উপর মদীনা অবস্থিত। লম্বায় ও প্রস্থে প্রায় দশ মাইল। এই অঞ্চলটির আদি নাম ছিল মদীনার প্রান্তর বা মদীনার

ওহুদ
উত্তর
মুসলিম শিবির
পাহাড়
নবীজীর গুহা
মুসলিম বাহিনীর আক্রমন পথ
রাসুল করীম (সঃ) এর
বিশ্রাম স্থল
মুসলিম বাহিনীর সমর সজ্জা
রাসুল করীম (সঃ) এর
দন্ত মোবারকের কবর স্থান
প্রাচীনকালের
একটি খেজুর বাগান
শত্রু বাহিনীর প্রধান আক্রমন পথ
শহীদগণের কবর স্থান
ঝর্ণা
মালভূমি
কোরেশদের পদাতিক ও
অশ্বারোহী বাহিনী
হামজা (রাঃ)
এর কবর স্থান
ওয়াদি কারাত
প্রাচীন পুল
হামযা (রাঃ) কে প্রথমে যেখানে কবর দেয়া হয়েছিল
হামযা (রাঃ) এখানে
আহত হয়েছিলেন
খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এর নেতৃত্বাধীন
শত্রু পক্ষের অশ্বারোহী বাহিনী
ওহুদের যুদ্ধক্ষেত্রের
মানচিত্র
০ ২৫ ৫০ ৭৫ ১০০০
স্কেল
মিটার
খেজুর বাগান
১৩৫৮ হিজরী

সমতল ভূমি। পরবর্তীতে রাসূলে করীম (সঃ) ইহার নামকরণ করেন 'হেরেম' বা পবিত্র শহর হিসাবে। সমতল ভূমিটির চতুর্দিক সুউচ্চ পর্বত শ্রেণী দিয়ে ঘেরা এবং যাতায়াতের জন্যে রয়েছে সংকীর্ণ উপত্যকাসমূহ। প্রাচীন লেখক-গণ এই অঞ্চলকে চিহ্নিত করেছেন 'এয়ার এবং সাওর'-এর মধ্যবর্তী অঞ্চল বলে। কিন্তু সমতল ভূমিটির সর্বত্র সমান নয়। এর মধ্যে রয়েছে সাল নামের বেশ বড় এবং ছোট ছোট আরো কতগুলো পর্বত। পাহাড়ের অবস্থানগুলো সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

বর্তমানে মদীনাকে যেভাবে একটি শহরের নকশার আকৃতিতে দেখান হয়, রাসূলে করীম (সঃ)-এর আমলে মদীনা ঠিক এরকম ছিল না। আধুনিক শহরের মত এখানে এত সড়ক, জনপথ এবং লোকালয় ছিল না। বরং তৎ-কালীন সময়ে মদীনায় বসবাস করত আরব ও য়াহূদীদের কতগুলো গোত্র। প্রতিটি গোত্রের লোকালয় বা গ্রামগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। একটি থেকে অপরটির দূরত্ব ছিল এক কি দুই বা ততোধিক ফার্লং-এর মত। 'এয়ার' পাহাড়ের চূড়া থেকে তাকালে ডান দিকে 'সাওর' পর্বত পর্যন্ত সারিবদ্ধভাবে গড়ে ওঠা অসংখ্য গ্রাম নজরে পড়তো। (ম্যাপ নং ৪)

প্রতিটি উপ-জাতীয় গ্রামেই ছিল এক বা একাধিক পানির কুয়া। তাদের বসবাসের ঘরগুলো পাথর দিয়ে তৈরী। বেশির ভাগ গৃহ আবার দোতলা। প্রতিটি গ্রামেরই ছিল কতগুলো শক্ত মজবুত কেল্লা। সাধারণভাবে তারা এগুলোকে বলত উজুম বা উতুম। যুদ্ধের সময় নারী, শিশু, গৃহপালিত পশু এবং অন্যান্য অস্থাবর সম্পদের হেফাজতের জন্যে এগুলিকে পাঠিয়ে দিত কেল্লায়। এক সময় মদীনা শহরে এক শতেরও বেশি কেল্লা ছিল। কেবলমাত্র বনু যায়েদ গোত্রের দখলে ছিলো ১৪টি কেল্লা। (দিওয়ান অব কায়স ইবন আল-খাতিম, সংস্করণ, কওয়ালসকি, পৃঃ ১৮) তন্মধ্যে কোন কোনটি আবার খুবই বৃহদাকারের। এমনি একটি দুর্গের নাম 'উতুম আদ-দিহয়ান' এটি ছিল উহায়হা ইবনে আল-জুলাহ গোত্রের দখলে। দুর্গটি তিনতলা বিশিষ্ট। (কিতাব আল-আগানি, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ১২৪) নিচ তলার মেঝ কাল বর্ণের শিলা-পাথর দিয়ে নির্মিত। দোতলা এবং তিনতলা রূপার মত শ্বেত পাথর দিয়ে তৈরী। কেল্লার বুরুজটি এত উঁচু ছিল যে, উষ্ট্রের পিঠে আরোহণ করে কেউ একদিনের পথ অতিক্রম করলেও সেখান থেকে এই বুরুজটি নজরে পড়তো। ১৯৪৭ সালেও কুবার সন্নিকটে এই বুরুজের ধ্বংসাবশেষ ছিল। কেল্লার

নিচতলা সংরক্ষণ করা হয়েছে। এমনকি কেল্লার ধ্বংসাবশেষও ইসলাম-পূর্ব যুগে মদীনার সামরিক স্থাপত্যের নিদর্শন বহন করে। কেল্লার অভ্যন্তরভাগে কিছু কুয়া রয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদী অবরোধের সময় কেল্লাবাসীদের যাতে কোনরকম পানির কষ্টে পড়তে না হয়, সেজন্যেই এ ব্যবস্থা।

মদীনার আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল এর অসংখ্য বাগান ও আবাদভূমি। এগুলো ছিল বিভিন্ন গোত্রের মালিকানাধীন। বাগান এবং আবাদী ভূমির চার-পাশের দেয়াল সাধারণত পাথর দিয়ে তৈরী হত। এ ধরনের বাগানগুলো মদীনার চারদিকে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল।

এ সব গোত্রীয় বাসস্থানগুলোর মধ্যে একটিকে বলা হত ইয়াসরিব। ছোট এই গ্রামটির কথা লোকে এখনো অস্পষ্টভাবে স্মরণ করে। বলা হয় যে, উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে, পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে এটা অবস্থিত। এখানে প্রচুর পরিমাণে পানি পাওয়া যেত। হতে পারে যে, প্রাক-ইসলাম যুগ থেকেই এ অঞ্চলটি ছিল খুবই সমৃদ্ধ, অথবা কোন না কোন কারণে এলাকাটি ছিল খুবই প্রসিদ্ধ এমনকি এটাও বিচিত্র নয় যে, গোড়া থেকেই এ গ্রামটি ছিল সকলের কেন্দ্রবিন্দু। সে যা হোক, এই পল্লীর নাম অনুসারেই সমস্ত শহরের নামকরণ করা হল। অর্থাৎ ছোট একটি এলাকার নামে পরিচিত হল সমগ্র অঞ্চল। বস্তুতপক্ষে এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। অন্যান্য দেশেও অনুরূপ ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। যে অঞ্চলটিকে মদীনাতুন-নবী এবং পরবর্তীতে কেবল মাত্র মদীনা বলে ডাকা হত, সে অঞ্চলটি শহরের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত।

মক্কার কুরায়শদের সাধারণ মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে কোন আক্রোশ ছিল না। তাদের সমস্ত ক্রোধ অভিযোগ ছিল কেবলমাত্র একটি মানুষের বিরুদ্ধে। তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ), তাদের এক সময়কার স্বদেশবাসী এবং যিনি শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় নিয়েছেন মদীনায়। মদীনাতুন-নবুবীতে পৌঁছতে হলে অসংখ্য গভীর ঘন বন ও বাগান পাড়ি দিয়ে যেতে হত এবং কোথাও এমন কোন উন্মুক্ত স্থান ছিল না, যেটাকে কয়েক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী যুদ্ধ ময়দান হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। আস-শামহুদী তাঁর ওয়াফা আল-ওয়াফা (খন্দক) গ্রন্থে দ্বিতীয় শতাব্দীর লেখক ইবনে ইসহাক থেকে উল্লেখ করেছেন যে, মদীনার একদিক ছিল উন্মুক্ত। অপর তিনটি দিক ছিল দালান-কোঠা এবং খেজুর বাগান দিয়ে সংরক্ষিত। এসব অঞ্চল দিয়ে শত্রু বাহিনীর অভিযান চালানোর কোন সুযোগ ছিল না।

মদীনার চারপাশের বিস্তৃত ভূভাগ

মদীনার বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থার নিরিখে বিবেচনা করলে বলা যেতে পারে যে, দক্ষিণ পথের অঞ্চল কুবা ও আওয়ালী ছিল খুবই ঘনবসতিপূর্ণ। দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণে রয়েছে ভীষণ রকমের অসমতল পার্বত্য অঞ্চল এবং লাভা দিয়ে তৈরী বিস্তৃত ভূভাগ। পদাতিক বা অশ্বারোহী বাহিনীর যুদ্ধের জন্যে এ অঞ্চলটি ছিল একেবারেই অনুপযুক্ত। পূর্বদিকে কুবা থেকে উহুদ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল জুড়ে রয়েছে য়াহূদী বসতি। পশ্চিমে গাছগাছালি এবং বাগ-বাগিচার সমাহার। অবশ্য এগুলো খুব বেশি ঘন নয়। এলাকাটি অনুর্বর। তৎকালীন সময়ে এলাকাটির অবস্থা বর্তমানের চেয়ে খুব বেশি ভাল ছিলো না। বনু সায়ীদাহ্ গোত্রের সভা কক্ষটিকে বর্তমান শহরের দক্ষিণ দেয়ালের কাছে, শামীগেটের ঠিক পূর্বদিকে দেখান হয়েছে, বনু সায়ীদাহ্ নামে গোত্রটি অবশ্যই যেখানে বসবাস করত। মাজিদি গেট থেকে উত্তর-পূর্ব কোণে বেশ খানিকটা দূরে বহু পুরাতন কতগুলো বাগান রয়েছে। এই বাগানগুলোর সংগে জড়িয়ে আছে রাসূল (সঃ)-এর আমলের কতগুলো স্মৃতি। সম্প্রতি একটি সাধারণ হাসপাতাল নির্মাণের জন্যে এলাকাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার সময় উত্তর দিকে মাঝামাঝি স্থানে অনেকগুলো কুয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে। এখান থেকে খানিকটা পশ্চিমে সাল পাহাড়েই রয়েছে বনু হারামের গোত্রীয় কবরস্থান। তাই স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায় যে, এদিকটায়ই তারা বসবাস করত। ওয়াদি আল-আকিক নদীর সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক বির রুমাহ কুয়া পর্যন্ত অসংখ্য বাগান রয়েছে। এমনকি আরও দক্ষিণে কিবলাতাইনের মসজিদ পর্যন্ত বাগানের বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যাবে। প্রকৃত পক্ষে বির রুমাহ এবং পার্শ্ববর্তী সেচ ভূমিসমূহ ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল। পরবর্তীতে হযরত ওসমান (রাঃ) (মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা) রাসূল (সঃ)-এর নির্দেশে কুয়াটি ক্রয় করেন এবং জনস্বার্থে এটি ওয়াকফ করে দেন।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, কেবলমাত্র মদীনার উত্তর দিকেই ছিল উন্মুক্ত প্রান্তর। এখানকার মাটি শ্বেত লোনায় পরিপূর্ণ। ফলে চাষাবাদের জন্যে ইহা সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য। বর্তমান সময়েও সেই একই অবস্থা বিরাজ করছে। তাছাড়া রাসূলে করীম (সঃ) যে লোকালয়ে বসবাস করতেন, অন্যান্য দিকের চেয়ে উত্তর দিক থেকে সে এলাকা আক্রমণ করা ছিল অধিকতর সহজ।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদীনার দক্ষিণ দিকটা পাহাড়-পর্বত এবং লাভা দ্বারা পরিপূর্ণ। গভীর উপত্যকা এবং গিরিখাতগুলো ব্যবহৃত হত যোগা-যোগ মাধ্যম হিসাবে। এ অঞ্চল দিয়ে কুবা হয়ে শহরে যাওয়ার পথটি ছিল খুবই কষ্টকর। কথিত আছে যে, বড় আকারের কোন কাফেলা কখনো এ পথ দিয়ে যাতায়াত করেনি। এমনকি ব্যক্তি বিশেষ কদাচিৎ এ পথ দিয়ে চলাচল করত। বস্তুতপক্ষে এ পথটি ব্যবহৃত হত কেবলমাত্র সংকট সময়ে। এটা স্পষ্ট যে, হিজরতের সময়ে রাসূলে করীম (সঃ) এ পথ ধরেই মদীনায় এসেছিলেন। নিরা-পত্তার খাতিরে এটা দরকার ছিল। তাছাড়া প্রথম তিনি কুবায় আসার পরপরই তাকে অগ্রসর হতে হয়েছিল মধ্য শহরের দিকে। কিন্তু বড় আকারের কোন বাহিনীর অশ্ব এবং ভারবাহী পশুগুলো অবশ্যই এ পথ দিয়ে অগ্রসর হবে না। উপরন্ত উহুদ যুদ্ধের সময় সূর্যের তাপ ছিল অত্যন্ত প্রখর। লাভা মাত্রাতিরিক্ত উত্তপ্ত হওয়ার কারণে উটের জন্যে পথ চলাটাও দুষ্কর হয়ে পড়ত। তাছাড়া উট কখনো পাথর কংকরময় ভূমি দিয়ে চলাচল করতে চায় না।

লাভা দ্বারা গঠিত সমতল ভূমি দক্ষিণ-পূর্ব এবং পশ্চিম দিক থেকে মদী-নাকে বেষ্টন করে আছে। উন্মুক্ত কেবলমাত্র উত্তরের প্রান্তর। লাভা দ্বারা গঠিত সমতল ভূমিতে অবশ্য ঘরবাড়ি নির্মাণ করা হয়। স্পষ্টতই তা করা হয় নিরাপত্তা লাভের তাগিদে। কিন্তু এখানে গাছপালা জন্মায় না, কোন রকম কৃষিকাজ চলে না। কোথাও কোন সেনা শিবির স্থাপনের সময় উট ঘোড়ার জন্যে চারণ ভূমি থাকাটা জরুরী। কিন্তু এ দিকটায় কোন চারণ ভূমি দেখা যায় না। কোন বাহিনী কোনরকমে লাভা প্রান্তর অতিক্রম করলেও একে যুদ্ধ ময়দান হিসাবে অবশ্যই নির্বাচন করবে না। এ প্রসংগে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, আনবারিয়াহ গেট এবং দক্ষিণ দিক থেকে সেখানে আসার পথটি বড়জোর তিনশ বছর পূর্বে নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা নিশ্চিতভাবেই জেনেছি যে, এই রাস্তাটি নির্মাণ করার পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণ দিক থেকে আগত সমস্ত কাফেলা জুল হুলায়ফায়ে বিরতি নিত। অতঃপর মদীনাকে ডানদিকে রেখে, নদীর তট ধরে উত্তর দিকে জাগারাহ-এর মিলন স্থল পর্যন্ত অগ্রসর হত। সেখান থেকে তারা মোড় নিত মদীনার দিকে। উল্লেখ্য যে, উট নদী তটের নরম বালু পথ দিয়ে যাতায়াত পছন্দ করে।

এ সমস্ত প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তিগুলোই কুরায়শ বাহিনীকে মদীনা ছেড়ে সামনে এগিয়ে যেতে বাধ্য করে। দীর্ঘ একটানা ১২ দিন যাবত কষ্টসাধ্য

অভিযানের ফলে তারা এতটা ক্লান্ত, বলতে গেলে মৃতপ্রায় নির্জীব হয়ে পড়ে যে, নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে শিবির স্থাপন করতে বাধ্য হয়। সেখানেই তারা সেনা-বাহিনী ও উট-ঘোড়ার বহু প্রত্যাশিত বিশ্রামের আয়োজন করে। জাঘাবাহ্ অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ও ঘাস ছিল। কুরায়শ বাহিনী তাদের বিজয় সম্পর্কে ছিল সুনিশ্চিত। সে কারণে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথ সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিল না।

উহুদ পাহাড়ের প্রান্তর সম্পর্কে কিছু বর্ণনা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মদীনার উত্তর দিকে উহুদ পাহাড় অবস্থিত। এটা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত একটি সরল রেখার মত। পাহাড়টি লম্বায় প্রায় চার-পাঁচ কিলোমিটার। পাহাড়টির ঠিক মাঝখানে মদীনার দিকে মুখ করে একটি প্রাকৃতিক বাঁক সৃষ্টি হয়েছে। বাঁকটি দেখতে অর্ধবৃত্ত বা ঘোড়ার খুরের আকৃতির। বাঁকটি এতখানি বড় ও প্রশস্ত যে, অনায়াসেই এখানে কয়েক হাজার লোক অবস্থান করতে পারে। আরো খানিকটা ভেতরের দিকে আরেকটা খোলা জায়গা আছে। একটি সংকীর্ণ পথ দ্বারা জায়গা দুটি সংযুক্ত। উহুদ পাহাড়ের দক্ষিণ দিক দিয়ে বয়ে গেছে ওয়াদি কানাত। এর দক্ষিণেই রয়েছে আয়নাইন পাহাড়। এটাকে তীরন্দাজদের পাহাড় বা জাবাল আল-রুমাতও বলা হয়। প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য যে, উহুদ যুদ্ধের সময় নবী করীম (সঃ) এই পাহাড়ের উপরে তীরন্দাজদের নিয়োগ করেছিলেন। সেখান থেকেই পাহাড়ের এই নামকরণ করা হয়েছে। ওয়াদি কানাতের উত্তরে উন্মুক্ত প্রশস্ত ভূমির উপর দুটি প্রস্রবণ রয়েছে। এই প্রস্রবণ থেকেও আয়নাইন পাহাড়ের নামকরণ হতে পারে।

মুসলিম বাহিনীর প্রস্তুতি : ৩০০০ কুরায়শ সৈন্যের মুকাবিলায় ৭০০ মুসলিম সৈন্য

কুরায়শ বাহিনী যখন যুল হুলায়ফায় পৌঁছে, তখন মুসলমান গুপ্তচর দল তাদের সন্ধান পান। অমনি তারা যাযাবর দলের সংগে মিশে যান এবং নবী করীম (সঃ)-কে খবর দেয়ার জন্যে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। অথচ ততক্ষণে কুরায়শ বাহিনী উহুদের পশ্চিমে গিয়ে যাত্রায় ক্ষান্ত দেয়। তারা শিবির স্থাপন করে জাঘাবায়। (ইসতিবা, আনাস ইবনে ফুদালাহ্, আল-মাগাজী, ওয়াকিদী) রাসূলে করীম (সঃ) ব্যক্তিগতভাবে মদীনার অভ্যন্তর-

ভাগ থেকে শহর প্রতিরক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন শত্রুর অবরোধের আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে যুদ্ধ করতে। কিন্তু তরুণ মুসলমান-গণের উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণে অবশেষে তিনি শহরের বাইরে যাওয়ার এবং সম্মুখ সমরে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৫৮) উহুদ পাহাড়ের মাঝখানে যে বাঁক, তার দক্ষিণ-পূর্ব কোণেই শায়খাইনের জোড়াকেল্লা। রাসূলে করীম (সঃ) জিহাদে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী মুসল-মান সৈন্যদেরকে কেল্লার সামনে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এখানে তিনি তাঁদের প্যারেড পরিদর্শন করেন এবং বরাবরের মত এবারেও যারা খুবই ছোট অথবা অন্য কোন কারণে যুদ্ধে যাওয়ার অনুপযুক্ত তাঁদের দল থেকে খারিজ করে দিলেন। (তাবারী, প্রথম খণ্ড, ১৩৯০; সীরাহ্ আস-শামী) উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান মহিলাও এই যুদ্ধে অংশ নেন। হযরত আয়িশা (রাঃ)ও ছিলেন এই দলে। তাঁরা আহতদের সেবাযত্ন করেছেন। পিপাসার্ত সৈন্যগণকে পানি পান করিয়েছেন এবং বিবিধ কাজে সহায়তা করেছেন। হাদীস সংকলক হযরত ইমাম বুখারী (রঃ) এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। (৫৬/৬৫-৬৭) আয-যুহরী থেকে বর্ণিত আছে যে, যে সমস্ত য়াহূদী মুসলমানদের মিত্র বলে পরিচিত, তাদেরকে এই প্রতিরক্ষা সমরে মুসলমানদের পক্ষে অংশগ্রহণ করতে বলা হবে কি না, সে ব্যাপারে মদীনার মুসলমানরা নবীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। প্রিয়নবী (সঃ) অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে জবাব দিয়েছিলেন যে, "তাদেরকে আমাদের প্রয়োজন নেই।" (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৫৯, ইতিহাস, ইবনে কাসীর, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৪) অন্যান্য বর্ণনা মতে উল্লেখ আছে যে, বনু কায়নুকা গোত্রের প্রায় ৬০০ য়াহূদী কুখ্যাত মুনাফিক ইবনে উবাইর নেতৃত্বে নবীজীর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। কিন্তু নবীজী স্পষ্ট-ভাবে জানিয়ে দিলেন যে, 'তাদেরকে দিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমরা এক নাস্তিকের বিরুদ্ধে অন্য নাস্তিকের সাহায্য গ্রহণ করি না।' (ইবনে সাদ, ২/১, পৃঃ ২৭, ৩৪, ইবনে কাসীর, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২২)

একবার বনু কায়নুকার বহিষ্কারের পর পুনরায় তাদের আগমন স্বাভা-বিকভাবেই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যাহোক এ প্রসংগে পরে আলোচনা করা যাবে। এ যুদ্ধে সর্বসাকল্যে মুসলমান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১০০০। পরে ইবনে উবাইর প্রভাবে তিনশ মুনাফিক মুসলিম বাহিনী পরিত্যাগ করে। এবং তারা দল ত্যাগ করে একেবারে শেষ মুহূর্তে অতি

সাধারণ অজুহাতে। অবশেষে রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) মাত্র ৭০০ সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করার জন্যে অগ্রসর হলেন। অথচ এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার। মুসলিম বাহিনীর চার-গুণেরও বেশি। ৭০০ সৈন্যের মধ্যে মাত্র ১০০ জন বর্ম পরিহিত ছিলেন। (শামী) একটি বর্ণনা মতে জানা যায় যে, মুসলিম বাহিনীতে ঘোড়া ছিল মাত্র দুটি। একটি নবীজীর কাছে, অপরটি আবু বুরদাহ-এর অধীনে। (ইবনে সাদ, ২/১ পৃঃ ২৭) যুবায়ের ইবনুল আওয়াম অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করে মহাবীর খালিদের অশ্বারোহী বাহিনীর মুকাবিলা করেছিলেন। অবশ্য ঘোড়াটি কি তার নিজের ছিল, না নবীজীর নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন, তা স্পষ্ট নয়। এখানে আরো প্রশ্ন আসে যে, যুদ্ধ ময়দানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যাদের বাড়িঘর, যাদের ঘোড়া নিয়ে আসার কথা ছিল, তাদের কেউ কেউ কি কুরায়শ বাহিনীর ঘোড়ার সংখ্যাধিক্য দেখে ঘোড়া আনা থেকে বিরত ছিলেন? অথবা মুসলমানরা কি শত্রু পক্ষের ঘোড়া ধরে ফেলেছিল, এবং যুবায়ের কি এই ঘোড়াগুলো দিয়েই খালিদের মুকাবিলা করেছিলেন? (তাবারী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৯৪)

শত্রুবাহিনী সম্পর্কে বলা যায় যে, কুরায়শরা অহেতুকভাবে আড়াই লাখ দিরহাম খরচ করেনি। তাদের বাহিনীতে ছিল ভাড়াটিয়া সৈন্যরা। তন্মধ্যে দুহাজার এসেছিলো কেবলমাত্র আহাবিশ গোত্র থেকে। (সীরাহ, কেরামত আলী, পৃঃ ২৪৫) এছাড়াও বিভিন্ন গোত্র থেকে এসেছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যাযাবর সৈন্য। কুরায়শ বাহিনীতে সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা ছিলো ৩০০০। তন্মধ্যে ৭০০ ছিল বর্ম পরিহিত এবং দুইশ অশ্বারোহী। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৬১) খালিদ এবং ইকরামার নেতৃত্বে অশ্বারোহী বাহিনী অবস্থান নিয়েছিল মূল বাহিনীর ডান ও বাম প্রান্তে।

মুসলিম বাহিনী নিয়ে রাসূল (সঃ)-এর অবস্থান গ্রহণ

শত্রুসেনারা যখন পূর্ণ আয়োজনে উহুদের প্রান্তরে পৌঁছে, রাসূল (সঃ) তখনও মদীনা শহরেই ছিলেন। প্রথম রাতে টহলদার বাহিনী নবীজীর বাড়িসহ গোটা শহর পাহারা দিলেন। (ইবনে সাদ ২/১, পৃঃ ২৬) পরের দিন শায়খাইনের জোড়া কেল্লার নিকটে মুসলমান সেনাদের সমবেত হওয়া এবং প্রয়োজনীয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর রাসূল (সঃ) রাত্রি-যাপন করলেন উন্মুক্ত শিবিরে। রাতের বেলা শিবির এবং তৎসংলগ্ন এলাকা

প্রহরার দায়িত্ব অর্পণ করা হল ৫০ জন সেনার একটি শক্তিশালী দলের উপর। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ্ ছিলেন এই দলের অধিনায়ক। (ইবনে কাসীর, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭) পরের দিন সকালে রাসূলে করীম (সঃ) উহুদ পাহাড়ের মাঝামাঝি স্থানে সেই বাঁকের দিকে অগ্রসর হলেন এবং সেখানেই তিনি অবস্থান নিলেন। সেনা ছাউনি স্থাপন করলেন ভেতরের দিকের খোলা জায়গায়। সিদ্ধান্ত নিলেন অর্ধ বৃত্ত বা বাঁকের বাইরে থেকে যুদ্ধ করার। তদনুসারে তিনি সেনাবাহিনীকে সাজালেন। ৫০ জন তীরন্দাজের একটি দলকে পাঠিয়ে দিলেন আয়নাইন পাহাড়ে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের-এর নেতৃত্বে তাঁরা সেখানে অবস্থান নিলেন। জুবায়েরের অধিনায়কত্বে এই দলের উপর আয়নাইন এবং উহুদ পাহাড়ের সংযোগ পথের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হল। তাদের সহায়ক শক্তি হিসাবে নিয়োগ করা হল ছোট একটি অশ্বারোহী দলকে। সংযোগ পথ দিয়ে শত্রু সেনারা যাতে পশ্চাৎ দিক থেকে মুসলিম বাহিনীর উপর চড়াও হতে না পারে, তা প্রতিরোধ করার জন্যেই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিলো। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৬০)।

কুরায়শ বাহিনী পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে আসছিল এবং মুসলমান সেনারা সেদিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। সুতরাং তীরন্দাজ বাহিনী কেবলমাত্র মুসলিম বাহিনীর পশ্চাৎ ভাগই পাহারা দিচ্ছিলেন না বরং তাঁরা কুরায়শ বাহিনীর মদীনায় যাওয়ার পথকেও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। তীরন্দাজ বাহিনীর উপর হুকুম ছিল যে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোন অবস্থা-তেই তাঁরা তাঁদের অবস্থান ছেড়ে আসবে না। এমনকি শকুনের পাল যদি মুসলমান সেনাদের মৃত দেহকে দুমড়ে-মুচড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে, তাও না। বস্তুতপক্ষে রাসূলে করীম (সঃ) কেন যে এমন অস্বাভাবিক রকমের কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, এই ঘটনা থেকে তার তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

অতঃপর রাসূলে করীম (সঃ) অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করে শিবির পরি-দর্শন করলেন। তিনি সেনাবাহিনীকে নব বলে উদ্দীপ্ত করলেন, সাধারণ সৈন্যগণকে নিজ হাতে নিখুঁতভাবে সাজালেন। সুবিন্যস্ত করলেন সেনা-বাহিনীর ডান ও বাম প্রান্তের সেনাদলকে। (ইবনে সাদ, ২/১, পৃঃ ২৭) বলা হয়ে থাকে যে, যুদ্ধের সময়ে নবীজী দুটি বর্ম পরিহিত ছিলেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৭৬, তাবারী ১, ১৩৯৩; মিশকাত শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, জিহাদ অধ্যায়, ৭৫; ইবনে মাজা নং ২৮০৬ এবং আল-বাজাজ) অন্য একটি বর্ণনা

থেকে জানা যায় যে, কাব ইবনে মালিকের সংগে নিজে বর্মটি বদল করেছিলেন। (ইসতিয়াব, নং ৯১৬) এটা স্পষ্ট যে, যুদ্ধের দিনে ছদ্মাবরণ গ্রহণ এবং নিরাপত্তা লাভের প্রত্যাশায় তিনি এরূপ করেছিলেন।

কুরায়শ বাহিনী রাত্রিকালীন আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল। ইকরামার নেতৃত্বে টহলদার বাহিনী সারারাত শিবির প্রহরার কাজে নিয়োজিত থাকে। (ইবনে কাসীর, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭) যুদ্ধের দিন অতি প্রত্যুষে কুরায়শদের প্রধান পদাতিক বাহিনী এবং ইকরামার নেতৃত্বে একশ অশ্বারোহী আক্রমণ অভিযান চালায়। তারা এগিয়ে যায় রাসূলে করীম (সঃ)-এর দিকে। আবু সুফিয়ান ছিলেন এই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। কুরায়শ মহিলারা তাম্বুরা বাজিয়ে এবং প্রতিশোধমূলক গান গেয়ে সৈন্যদেরকে উত্তেজিত করতে থাকে। অশ্বারোহী বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যরা খালিদের নেতৃত্বে অনেকখানি ঘুরে পশ্চাৎ দিক থেকে মুসলমান সেনাদের আক্রমণ করার জন্যে ছুটে যায়।

আয়নাইন পাহাড়ের তৎকালীন বাহ্যিক গঠন সম্পর্কে একটি ধারণা

আয়নাইন পাহাড় থেকে উহুদ পর্বতের দূরত্ব এতটা বিস্তৃত যে, শত্রু পক্ষের অশ্বারোহী বাহিনী অনায়াসেই এই পথ দিয়ে প্রবেশ করতে পারতো। মুসলমান তীরন্দাজদের তীর তাদের স্পর্শ করতে পারতো না। অথবা মুসলমান অশ্বারোহী বাহিনী এতো ক্ষুদ্র ছিলো যে, কুরায়শ বাহিনীর অনুপ্রবেশকে কোনভাবেই প্রতিহত করাও ছিল অসম্ভব। বস্তুতপক্ষে এতকাল পরে এখন কেবল মাত্র অনুমানের ভিত্তিতে এই সমস্যার নিরসন করা যায়।

ব্যাপারটা এমনও হতে পারে যে, উহুদ পর্বতের ঢাল এখনকার মতো ১৩০০ বছর পূর্বে এত নিচু ছিলো না। ঢাল নিচে নেমে যাওয়ার মূলে রয়েছে ওয়াদি কানাতে বহুবার প্লাবন এবং দালানকোঠা নির্মাণের জন্যে পাহাড় কর্তন। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, এমনি একটি প্লাবন মহাবীর হামযা (রাঃ) -এর মাযার অশেষ ক্ষতি সাধন করে এবং মূল কবরস্থান থেকে তাঁর পবিত্র দেহকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হয়।

বস্তুত পক্ষে তায়েফের ওয়াদি ওয়াজ্জ-এর স্রোতধারা যা নাকি মদীনায় এসে ওয়াদি কানাত নাম ধারণ করেছে, সেই নদীকেই এত ব্যাপক পরিবর্তনের কারণ হিসাবে দায়ী করা যায়। ১৯৩৯ সালে আয়নাইন পাহাড়ের

পূর্ব প্রান্তের এই নদীর উপর কোন পুলের অস্তিত্ব আমার নজরে পড়েনি। পরবর্তী বছরগুলোতে বন্যায় প্রচুর বালু মাটি ধুয়েমুছে নিয়ে যায় এবং ১৯৪৭ সালে সেখানে বালির নিচে চাপা পড়া একটি পুলের অস্তিত্ব বেরিয়ে পড়ে। দালান-কোঠা, বিশাল মসজিদ এবং হামযার মাযার শরীফ, আয়নাইন পাহাড়ের উপর অসংখ্য ঘরবাড়ি, যুদ্ধ ময়দানের সন্নিকটস্থ সরকারী ও বেসরকারী বাসভবন, পুলিশ স্টেশন প্রভৃতি নির্মাণ কাজের জন্যে প্রচুর পরিমাণ পাথর ও মাটির প্রয়োজন পড়ে। এবং বিভিন্ন সময়ে পাহাড়ের ঢাল কেটে ফেলা হয়। অন্যথায় অতীতকালে আয়নাইন এবং উহুদ পাহাড়ের ঢাল এতটা উঁচু ছিলো যে, অশ্বারোহী বাহিনী আয়নাইন পাহাড়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে বাধ্য ছিল। আক্রমণকারী অশ্বারোহী বাহিনী অনায়াসেই তারা আয়নাইন পাহাড়ে অবস্থানরত তীরন্দাজদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারত।

এখানে আরেকটি অনুমান বা সম্ভাবনার উল্লেখ করা যেতে পারে। পরিষ্কার পানির দুটি ঝরনা থাকার কারণে এখানে হয়তো এক বা একাধিক বাগান এবং খেজুর বন ছিলো। স্বাভাবিকভাবেই এগুলো ছিল দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ফলে বর্তমানে যতখানি পথ উন্মুক্ত দেখা যায় সে আমলে তার অনেকখানি বন্ধ ছিল। যুদ্ধ সম্পর্কিত কিছু কিছু বিবরণ হতে এই অনুমানের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। আবু দুজানার কাহিনী তো সর্বজন বিদিত। রাসূলে করীম (সঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধার হাতে তার তলোয়ার তুলে দিলেন। উমর, যুবায়েরের মত অসংখ্য সাহাবা বঞ্চিত হলেন এই দুর্লভ সম্মান থেকে। আমৃত্যু যুদ্ধ করার ওয়াদা করেই আবু দুজানা লাভ করলেন রাসূলের তলোয়ার প্রাপ্তির বিরল গৌরব।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, এই অভাবিত সম্মান প্রাপ্তির পর আবু দুজানা আনন্দে এতটা উৎফুল্ল হয়ে উঠেন যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তিনি কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করলেন। অথচ এজন্যে তার কোন প্রস্তুতি ছিল না। কবিতার দুটি চরণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

আমি সেই ব্যক্তি যার সাথে আমার প্রিয় জন (প্রিয় নবী সঃ) আবদ্ধ হয়েছেন চুক্তিতে

যখন আমরা ছিলাম পাহাড়ের পাদদেশে খেজুর বাগানের সন্নিকটে।

(দ্র. ইবনে হিশাম, পৃ. ৫৬৩, তাবারী, পৃ. ১৪২৫-২৬)।

এখানে লক্ষণীয়, কবি অর্থাৎ আবু দুজানা তাঁর কবিতায় 'খেজুর গাছের বাগান' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

ঘটনা প্রবাহ : যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ের কৌশল এবং শত্রু বাহিনীর বিপর্যয়

কুরায়শ বাহিনী অবশ্যই জাঘাবাহ ক্যাম্প থেকে সরাসরি উহুদের দিকে এসেছিল। বর্তমানে পশ্চিম দিকে যেখানে শহীদদের সমাধি সৌধ রয়েছে তার নিকটই কুরায়শরা মুসলমানদের সংগে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। কিন্তু খালিদের নেতৃত্বে কুরায়শদের অশ্বারোহীরা কিভাবে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাৎভাগে অর্থাৎ আয়নাইনের পূর্ব দিকে এল? তারা যদি মূল বাহিনীর সংগে এসে থাকে, আবার যুদ্ধ ময়দানের ঠিক এক ফার্লং দূরে থাকতেই পৃথক হয়ে যায় এবং পথ ঘুরে আয়নাইনের অপর প্রান্তে চলে আসে, তাহলে এতে মুসলমানদের জন্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। মুসলমানরা হয়তো তাদের বাহিনীর একটি অংশকে এই দুর্যোগের মুকাবিলায় নিয়োগ করতে পারতেন। অনেকেরই ধারণা উহুদ পাহাড়ের পেছন দিকে একটি রাস্তা আছে। অভ্যন্তরভাগের খোলা জায়গায় রাসূলে করীম (সঃ) যেখানে শিবির স্থাপন করেছিলেন, এ পথটি সরা-সরি সেদিকে চলে গেছে এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুসলমান শিবিরের ব্যবধান ছিল খুবই সামান্য। প্রথম বারের মত ১৯৩২ সালে এবং পরে ১৯৩৯ সালে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন এই এলাকায় ঘোরাফিরা করেছি, পাহাড়ে উঠেছি, অবশেষে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, উহুদ পাহাড়ের পেছন দিকের পথ দিয়ে খালিদের অশ্বারোহী বাহিনীর অনুপ্রবেশের বিন্দুমাত্র আশংকা নেই। ১৯৪৬-৪৭ সালে আমি পুনরায় গোটা পাহাড়টা পায়ে হেঁটে প্রদক্ষিণ করি এবং এ ব্যাপারে আমার প্রগাঢ় আস্থা জন্মেছে যে, উহুদ পাহাড়ের উত্তর দিকটা কঠিন শিলা এবং উঁচু দেয়াল দিয়ে তৈরী এবং ঘোড়া তো দূরের কথা, ঘোড়ার চেয়ে আকার-আকৃতিতে ছোট মানুষেরও ঐস্থান দিয়ে অনুপ্রবেশের কোন পথ নেই। এমতাবস্থায় খালিদের অশ্বারোহী দলের মুসলিম বাহিনীর পশ্চাৎভাগে আসার একটি মাত্র সম্ভাব্য পথ উন্মুক্ত রয়েছে এবং তা হল তাদের মূল শিবির থেকে যাত্রা শুরু করে পাহাড় প্রদক্ষিণ করে আসা। গোটা পথের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় দশ মাইল এবং অশ্বারোহী দলের পক্ষে এ পথ অতিক্রম করা অবশ্যই কোন কঠিন ব্যাপার নয়। বলা বাহুল্য, খালিদের অশ্বা-রোহীদল পশ্চাৎভাগ দিয়ে মুসলিম সেনাদের উপর আক্রমণ রচনার জন্যে যথা সময়ে আয়নাইনের অপর প্রান্তে চলে আসে। মক্কার মূল বাহিনীর সংগে

অগ্রসর হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছতে খালিদের যতটুকু পথ অতিক্রম করতে হত, উহুদের উত্তর প্রান্ত হয়ে এককভাবে অশ্বারোহী দলকে নিয়ে অগ্রসর হওয়ার কারণে খালিদকে সেখানে বড়জোর চার কিলোমিটার পথ বেশি অতিক্রম করতে হয়েছে। কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে একটি অশ্বারোহী দলের পক্ষে চার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করা অবশ্যই তেমন কঠিন কাজ নয়। উহুদের বাইরের এবং অভ্যন্তরভাগের উম্মুক্ত স্থান দুটোর মধ্যে সংকীর্ণ সংযোগ পথের সন্নিকটস্থ উহুদ পাহাড়ের উঁচু অংশকে তীরন্দাজদের পাহাড় নামে অভিহিত করা হয়নি। বরং তীরন্দাজদের পাহাড় বলা হয়েছে আয়না-ইনকে। এমতাবস্থায় খালিদের নেতৃত্বে অশ্বারোহী দলের অনুপ্রবেশের পথ সম্পর্কে উপরোক্ত অনুমানকে সত্য বলে ধরে না নিলে 'আয়নাইনকে তীরন্দাজ-দের পাহাড়' বলে শনাক্ত করার কারণ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

কুরায়শ বাহিনীর বিশেষ করে তাদের অগ্রগামী দলের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। মুসলিম তীরন্দাজদল খালিদের অশ্বারোহী দলের উপর্যুপরি আক্রমণকে সাফল্যের সংগে প্রতিহত করেন। তাদের সহায়তা করেন মুসলমান অশ্বারোহিগণ। অতঃপর প্রত্যেকেই তাদের সাধ্যমত শত্রু সম্পদ আহরণের জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। (তাবারী ১, ১৪০১)। মুসলমান তীরন্দাজরা যখন তাদের অবস্থান ছেড়ে চলে আসেন, তখনো যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেনি। অথচ অধিনায়ক মুহাম্মদ (সঃ)-এর তরফ থেকে কঠোর নির্দেশ ছিল যে, শত্রু সম্পদ সংগ্রহের কাজে তোমরা অংশ নেবে না; কখনো ভাববে না যে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ়চিত্ত খালিদ যখন পুনরায় আক্রমণ চালায় তখন ৭ কি ৮ জন তীরন্দাজ ব্যতীত অন্যরা সেনাপতিকে ছেড়ে চলে গেছে। ফলে এ সময়ে খালিদ একটি সহজ সাফল্য অর্জন করে। অনায়াসেই সে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাৎভাগ দিয়ে প্রবেশ করে যুদ্ধের ময়দানে। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৭০, মাকরিজী ১, ১২৮)।

মুসলিম সেনাগণ এই আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। অশ্বারোহী বাহিনীর অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে তারা ঘুরে দাঁড়ান। এদিকে পলায়নপর কুরায়শ বাহিনী যখন দেখল যে, কেউ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে না, তখন তারা থমকে দাঁড়ায় এবং নিজেদের পুনরায় সংগঠিত করে নেয়। এবার মুসলিম বাহিনী আক্রান্ত হল অগ্র-পশ্চাৎ উভয় দিক থেকে। হঠাৎ করে কুরায়শ বাহিনীর একজন তীরন্দাজ চিৎকার করে বলে উঠে যে,

সে রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-কে হত্যা করেছে। প্রকৃতপক্ষে রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) তার বর্মটি আরেকজনের সঙ্গে রদবদল করার কারণে কুরায়শ তীরন্দাজ বিভ্রান্ত হয়েছিল। যাহোক এই চিৎকার ধ্বনি শুনে মুসলিম সেনাদের মধ্যে হতাশা ও নিরাশা দেখা দেয়। তারা সম্ভাব্য পথ দিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে পড়েন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৭০)

এই যুদ্ধে ৭০ জন মুসলমান শহীদ হলেন। শত্রুপক্ষে ২৩ জন নিহত হল। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬১০) এটা স্পষ্ট যে, তাদের বেশিরভাগই নিহত হয়েছিল যুদ্ধের শুরুতে।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আঘাত প্রাপ্তি এবং সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

এখানে যুদ্ধের খুঁটিনাটি কতগুলো বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। কুরায়শ বাহিনী উহুদ প্রান্তরে পৌঁছার পর প্রথম দুদিন কাটিয়ে দেয় প্রস্তুতির কাজে। বিপুল সংখ্যক গুপ্তচর, পরিখা ও রাস্তা নির্মাণকারী এবং সংগোপনে অনিষ্টকারীরা যুদ্ধের ময়দানে এসে সমবেত হয়। অথচ তখনো রাসূলে করীম (সঃ) অবস্থান করছিলেন মদীনা শহরে অথবা সম্মেলন ও কুচ-কাওয়াজ স্থলে। আবু আমির আর-রাহিব নামে একজন খৃস্টান ধর্ম যাজক মাতৃভূমি মদীনা ছেড়ে মক্কায় চলে গিয়েছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরায়শ-দের উত্তেজিত করার কাজে সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কুরায়শ বাহিনীর সংগে সেও এসেছিল উহুদের প্রান্তরে। সংগে ছিল জনা-পঞ্চাশেক একান্ত নিজস্ব অনুচর। উল্লেখ আছে যে, এই ধর্মযাজক সম্ভাব্য যুদ্ধ ময়দানে অনেকগুলো গর্ত খনন করে। সে গর্তগুলোকে এমনভাবে আবৃত করে রাখে যে, মুসলমানরা এগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে টেরই পেলেন না। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে রাসূলে করীম (সঃ) এমনি গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৭২)

উহুদের প্রান্তর ছিলো কংকর ও পাথরে পরিপূর্ণ। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে কুরায়শ বাহিনী পলায়নপর মুসলমানদের উপর পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। যদিও অনেকেই তাদের পৃষ্ঠদেশে আঘাত পেলেন বা আহত হলেন, রাসূলে করীম (সঃ) আঘাত পেলেন তাঁর মুখমণ্ডলে। একটি পাথর এসে তাঁর সম্মুখের দাঁতের উপর পড়ে, সংগে সংগে তাঁর লৌহ বর্মের দুটি বেড়ি চোয়ালের গভীরে

ঢুকে যায়। বেড়ি দুটি এমন শক্তভাবে আটকে যায় যে, একজন সাহাবা দাঁত দিয়ে কামড়ে বেড়ি দুটি তোলার সময় তাঁর দাঁত ভেংগে যায় এবং চোয়ালে আটকে যাওয়া বেড়ি তুলে ফেলতে ব্যর্থ হয়। (ইবনে হিশাম, ৫৭১-২) পরবর্তীতে নামাযের সময় হলে রাসূলে করীম (সঃ) এই ব্যাণ্ডেজের উপর দিয়েই অযূ করেন। (শরহ আস-সিয়ার আল-কবীর, আস-সারাকশী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৯)

বিশ্বাসিগণের ছোট একটি দল অত্যন্ত সাহসিকতার সংগে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নবীজীর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেন। এই মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেকে জীবন দিলেন। কোন রকম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া এবং স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে এগিয়ে আসা এই দেহরক্ষী দলের মধ্যে ছিলেন উম্মে উমারাহ নামের এক মহিলা। তাঁর অনুপম প্রচেষ্টা এবং অপূর্ব উদ্যোগের জন্যে রাসূলে করীম (সঃ) পরে তার প্রশংসা করেছেন। (ইবনে কাসীর, চতুর্থ খণ্ড, ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৭৩, বালাজুরী, আনসাব, ১, ৩২৬)

রাসূলে করীম (সঃ) কয়েকজন সাহাবার সহযোগিতায় গর্তের মধ্য থেকে উঠে এলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে আবু আমির নামের একজন খৃস্টান ধর্ম-যাজক এই গর্তগুলো খনন করেছিল এবং নবীজী এ ধরনের একটি গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি উহুদ পাহাড়ের একটি গুহার দিকে উঠে যান। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৭২, ৫৭৬) উহুদ পাহাড়ের বহির্ভাগে অর্ধ-বৃত্তাকারের যে খোলা জায়গা রয়েছে তার পূর্ব প্রান্তে এই গুহাটি অবস্থিত। গুহাটি এতটা প্রশস্ত যে, একজন লোক অনায়াসেই এবং স্বচ্ছন্দে গুহার মধ্যে শুয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া এই স্থানটি শত্রু সেনাদের মিসাইল তথা পাথর ছুঁড়ে ঘায়েল করার জন্যে যে দূরত্ব প্রয়োজন, তার চেয়েও বেশি দূরে।

মুসলিম বাহিনীর প্রতিরোধ শক্তি ভেংগে যাওয়ার সংগে সংগে শত্রু-সেনারা বীভৎস আনন্দে ও উল্লাসে মেতে উঠে। কুরায়শ বাহিনীর সর্বাধি-নায়ক আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা শহীদ হযতর হামযা (রাঃ)-এর বুক চিরে কলিজা টেনে বের করে। বদরের প্রান্তরে দ্বৈত যুদ্ধের সময় এই হামযার হাতেই হিন্দার পিতা, চাচা এবং ছেলে ধরাশায়ী হয়। সেই অপমানের প্রতি-শোধ গ্রহণের প্রবল তৃষ্ণা থেকেই সে হামযার কলিজা গোগ্রাসে গিলতে শুরু করে। (ইবনে হিশাম, ৫৭০, ৫৮১)

যুদ্ধক্ষেত্রে একজন আহাবিশ মহিলার মক্কার পতনোন্মুখ পতাকা গ্রহণ এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উত্তোলন করে রাখা

যুদ্ধক্ষেত্রে আদর্শ স্থানীয় কতগুলো ঘটনাও সংঘটিত হয়। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানদের হাতে এক এক করে বেশ কিছু সংখ্যক কুরায়শ পতাকা-বাহী নিহত হয়। দীর্ঘ সময় ধরে কুরায়শ বাহিনীর পতাকা ভূ-লুন্ঠিত হতে থাকে। কারও সাহস হল না সেই পতাকা উঁচুতে তুলে ধরার। অবশেষে হারিসা বংশের আমরাহ বিনতে আলকামা নামের এক মহিলা পতাকাটি কুড়িয়ে নেয়। সাফল্যের সংগে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পতাকা উঁচুতে ধরে রাখে এবং আমরাহ ছিলো মক্কাবাসীদের মিত্র আহাবিশ গোত্রের মেয়ে। তারা উহুদের প্রান্তরে এসেছিল কুরায়শ বাহিনীর সহযোগী হিসাবে। কিন্তু প্রথম আঘাতের সময়ই তারা পালিয়ে যায় যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে। পরবর্তীতে এই ঘটনা থেকেই মুসলিম কবি হাসান ইবনে সাবিত আহাবিশ গোত্রের বিরুদ্ধে একটি ব্যাংগ কবিতা রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন। কবিতার মূল কথা হল ঃ আহা-বিশ গোত্রের পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা উত্তম। কবিতার দু'টি লাইন নিম্নরূপ ঃ হারিসা বংশের মেয়েরা যদি না থাকত সেখানে তারা বাজারে বিক্রি হত দাস হিসাবে। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৭১)

মুসলিম বাহিনীর এই বিপর্যয়ের সুযোগে এক মুনাফিক ব্যক্তিগত প্রতি-শোধ স্পৃহা থেকে একজন মুসলমানকে হত্যা করে। পরবর্তী সময়ে রাসূলের দরবারে তার বিচার হয় এবং অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার প্রেক্ষিতে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। (ইবনে হাবীব, আল মুহাব্বার, পৃঃ ৪৬৭, ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৭৯)

যুদ্ধের সময় ভুল বশত একজন মুসলমানের হাতে আরেকজন মুসলমান নিহত হলেন। নিয়ম অনুসারে তার নিকট থেকে রক্তের কিসাস আদায় করা যেত। কিন্তু বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল বলে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ও তাঁর পুত্র হুযায়ফা ইবনে আল ইয়ামন আল্লাহকে খুশি করার নিয়তে তাঁর দাবি প্রত্যাহার করে নেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৭৭, ৬০৭) সম্ভবত এ দুর্ঘটনাটি এ কারণে ঘটেছিল যে, দরিদ্র এবং বৃদ্ধ এই সাহাবা যুদ্ধের ময়দানে এসেছিলেন শেষের দিকে। গণ্ডগোলের সময় ব্যবহৃত সংকেত ধ্বনি সম্পর্কে তিনি ছিলেন অনবহিত। ফলে সংগী-সাথীরা যুদ্ধের ময়দানে তাঁকে সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারেননি।

যুদ্ধের সমাপ্তি

ধীরে ধীরে রাসূলে করীম (সঃ)-এর নিরাপদ অবস্থানের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সাহাবাগণ পুনরায় তাঁর চারপাশে জড়ো হতে শুরু করেন। এদিকে শত্রু বাহিনীর একটি দল গুহার দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু সেখানে মুসলমানদের সংখ্যাও নেহায়েৎ কম ছিল না। তারা উঁচু থেকে শত্রু সেনাদের লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করেন। অবশ্য সেই গুহার অভ্যন্তরে রাসূলে করীম (সঃ)-এর অবস্থানের ব্যাপারে তাদের স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। ফলে শত্রু সেনারা তেমন কোন জোর প্রয়াস না চালিয়েই সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৭৬) সেনা-পতি আবূ সুফিয়ান তার সেনাবাহিনীকে সেনা ছাউনিতে প্রত্যাবর্তন করার হুকুম দিয়ে শেষ বারের মত যুদ্ধ ময়দানটা পরিদর্শন করে এবং রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। সে যুদ্ধ ময়দানে দাঁড়িয়ে অহংকার ও গর্বের সংগে চিৎকার করছিলো। কিন্তু রাসূলে করীম (সঃ) সহচরদেরকে কোন কথার উত্তর দিতে বারন করলেন। কিন্তু আবূ সুফিয়ান যখন রাসূলে করীম (সঃ) সম্পর্কে অশালীন এবং অপমানজনক বক্তব্য রাখছিলো, হযরত উমর (রাঃ) তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না। দুজনের মধ্যে তখন সেই ঐতিহাসিক বাক্য বিনিময় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৮৮, ৩, ইবনে সাদ ১, পৃঃ ৩৩)।

আবূ সুফিয়ান ঃ জয় হোক হোবল দেবতার।

হযরত উমর (রাঃ) ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মহান ও মহিমাময়।

আবূ সুফিয়ান ঃ আমাদের আছে উজ্জা, যা তোদের নাই।

হযরত উমর (রাঃ) ঃ মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ আমাদের মওলা, আমাদের বন্ধু, তোমাদের নয়।

আবূ সুফিয়ান উমর! আমাকে প্রকৃত সত্য কথাটা বল দেখি। ইবনে কুসাইয়া কি সত্য সত্যই মুহাম্মদ (সঃ)-কে হত্যা করেছে? তার দাবি কি সত্যি? উমর, ইবনে কুসাইয়া অপেক্ষা আমি তোকে অধিক বিশ্বাস করি।

হযরত উমর (রাঃ) ঃ ওহে আল্লাহ্র দুশমন, রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) এবং হযরত আবূ বকর (রাঃ) জীবিত আছেন। তুমি যা বলছ, তাঁরা যথার্থই তা শুনতে পাচ্ছেন।

আবূ সুফিয়ান : উহুদ হল বদরের বদলা। একটি দিনের বদলে দিন। হানজালার বদলে হানজালা। মনে রাখিস। যুদ্ধটা হল একটি সুযোগের ব্যাপার। এর সংগে ন্যায়-অন্যায় বা উচিত-অনুচিতের কোন সংযোগ নেই।

হযরত উমর (রাঃ) : তা ঠিক। তবে আমাদের শহীদেরা যাবেন জান্নাতুল ফেরদৌসে, আর তোমরা যাবে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে।

কুরায়শ বাহিনী ততক্ষণে ফিরে গেছে তাদের সেনা ছাউনিতে। মুসলমানদের সর্বশেষ প্রতিরোধ ঘাঁটি দখল করে নেয়ার জন্যে সৈনাবাহিনীকে পুনরায় যুদ্ধের ময়দানে ফিরিয়ে আনা বা মোতায়েন করা সম্ভব ছিল না। তাই সেও ফিরে যায় সেনা শিবিরে।

যুদ্ধ ময়দান থেকে শত্রুসেনাদের এমন সন্দেহজনক প্রত্যাহার রাসূলে করীম (সঃ)-এর অন্তরে আরেকটি সংশয়ের উদ্রেক করে। তিনি ধরে নেন যে, তারা হয়ত অরক্ষিত মদীনার উপর চড়াও হওয়ার জন্যে অগ্রসর হচ্ছে। সুতরাং আহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তৎক্ষণাৎ তৈরি হলেন। মদীনার প্রতিরক্ষার জন্যে সাধ্যমত সংগঠিত করলেন মুসলমান সৈন্যগণকে। ইতিমধ্যে গুপ্তচরেরা খবর নিয়ে আসে যে, শত্রু সেনারা তাদের উটগুলো নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে তাদের জীনবিহীন ঘোড়াগুলো। এই সংবাদ পেয়ে রাসূলে করীম (সঃ) বললেন, যদি তাই হয় তাহলে কুরায়শ বাহিনী দীর্ঘ যাত্রার প্রস্তুতি নিয়েছে, তারা ফিরে যাচ্ছে স্বদেশের পথে এবং অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার লক্ষণ এটা নয়। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৮৩)

এরপরও রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) আশ্বস্ত হতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, কুরায়শরা অবশ্যই অল্প সময়ের মধ্যে অনুতপ্ত হবে এবং তাদের বিজয়কে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার জন্যে তারা প্রত্যাবর্তন করবে মদীনার দিকে। বস্তুতপক্ষে তার ধারণা ছিল যথার্থই সত্য। যে করেই হোক না কেন, রাসূলে করীম (সঃ) তার বাহিনী নিয়ে কুরায়শ বাহিনীর পেছনে পেছনে বেশ কিছু পথ অগ্রসর হলেন। মূল বাহিনীর অগ্রভাগে পাঠালেন একটি অগ্রগামী সন্ধানী দল, তাঁদের মধ্যে দুজন ধরা পড়লেন এবং নিহত হলেন কুরায়শ বাহিনীর হাতে। (ইবনে সাদ ২/১, পৃঃ ৩৫) অবশ্য ইতিমধ্যে তারা শত্রুবাহিনীকে একথা ভালভাবেই বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হলেন যে, রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) সুস্থ হয়ে

উঠেছেন। উহুদের ময়দানে তিনি যে পরিমাণ সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন, এবার তার চেয়ে বেশি শক্তি নিয়ে কুরায়শ বাহিনীর মুকাবিলা করতে প্রস্তুত এবং তাদের ধাপ্পাবাজী বা ছলচাতুরী মুসলমানদের জন্যে একান্তই অর্থহীন।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হামরা আল-আসাদে মুসলিম বাহিনীর শিবির স্থাপন করলেন। এই স্থানটি মদীনা থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে যুল-হুলায়ফার বাম দিকে ওয়াদি আল-আরিফে অবস্থিত। রাতের বেলা শিবিরের আশেপাশে ৫০০ অগ্নিকুণ্ড জ্বালানোর ব্যবস্থা করলেন। এখানে দিন কয়েক অবস্থানের পর যখন বুঝতে পারলেন যে, শত্রু বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের কোন আশংকা নেই, তখন তিনি মদীনায় ফিরে গেলেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৮৮, ৫৮৯)

ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত আছে যে, (২/১, পৃঃ ৩৪) উহুদের ময়দান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এবং শত্রু সেনাদের পিছু ধাওয়া করার পূর্বে রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) তার বাড়ির নিরাপত্তার জন্যে প্রহরী নিয়োগ করেন। উহুদের প্রান্তরে রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) আনসারদের পতাকাতলে কিভাবে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং শত্রু সেনাদের মুকাবিলায় বিভিন্ন অধিনায়ককে বিভিন্ন দিক থেকে অগ্রসর হওয়ার জন্যে যে কিভাবে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন ইবনে কাসীরে (খণ্ড চার, পৃঃ ২০) তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

অধ্যায় ৪

খন্দকের যুদ্ধ

(৮—২৯ শাওয়াল, ৩—২৪ জানুয়ারি, ৬২৭ খৃঃ)

ইসলামের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন এক ষড়যন্ত্রের করুণ পরিণতি

খায়বরের য়াহূদীদের দ্বারা মদীনাগামী মুসলিম কাফেলার হয়রানি

উহুদের যুদ্ধের মাত্র দু'বছর পরে ৫ হিজরীতে (৬২৭ খৃঃ) রাসূলে করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধে মস্তবড় একটি অভিযান পরিচালিত হয়। মুহাম্মদ (সঃ)-কে জড়িয়ে পড়তে হয় গুরুত্বপূর্ণ এক যুদ্ধে। এই যুদ্ধটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। কেউ কেউ এই যুদ্ধকে বলেন পরিখার যুদ্ধ বা গোষ্ঠীগত যুদ্ধ, অনেকে আবার এটিকে চিহ্নিত করেছেন মদীনা অবরোধ হিসাবে। এই যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআনুল করীমে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় ইরশাদ হয়েছে ঃ "যখন ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিলো উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে, তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিলো, তোমোদের প্রাণ হয়ে পড়েছিলো কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে। তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিলো এবং তাঁরা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিলো।" (৩৩ ঃ ১০-১১)

উহুদের প্রান্তরে কুরায়শ বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ একটি বিজয় অর্জন করল। কিন্তু নিজেদের নগর-রাষ্ট্র মক্কার সংগে মদীনাকে সংযুক্ত করা এবং এর মাধ্যমে তাদের বাণিজ্য পথকে বিপদমুক্ত করার জন্যে মদীনায় কোন বাহিনী রেখে এল না। অথবা তাদের এই বিজয়কে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া এবং পর্যুদস্ত মুসলিম বাহিনীর শেষ অবলম্বনটুকু নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্যে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করার প্রয়োজনবোধ করেনি। এর ফল এই দাঁড়াল যে, বিজয়ী

কুরায়শ বাহিনী উহূদের যুদ্ধ প্রান্তর পরিত্যাগের পর পরই মুসলমানরা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসেন। এমন কি পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে তাদের অবস্থার আরো উন্নতি এবং সংহত হল। এর পরই উত্তরে সুদূর নজ্দ্ এলাকায় পরিচালিত হয় বিরে মাউনাহ্ ও দাত-আর-রীকা এবং উত্তরে দুমাতুল জান্দাল অভিযান। বস্তুতপক্ষে এই অভিযানগুলো মুসলমান প্রভাবিত অঞ্চলের ক্রম সম্প্রসারণের নিশ্চিত স্বাক্ষর বহন করে। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৪৮, ৬৬১, ৬৬৮) ফলে মক্কার মরুযাত্রী দলের সিরিয়া ও মিসর যাতায়াতের জন্যে কেবলমাত্র উত্তর দিকের পথই বন্ধ হলো না, বরং মুসলমানরা অত্যন্ত সাফল্যের সংগে ইরাক গমনাগমনের উত্তর-পূর্ব দিকের পথটিও রুদ্ধ করে দিতে সমর্থ হলেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৪৭, তাবারী, প্রথম খণ্ড, ১৩৪৭)

ইতিমধ্যে বনু নাদির গোত্রের য়াহূদীদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হলো। এতে করে রাজধানীর অভ্যন্তরভাগে মুসলমানদের অবস্থান সুসংহত এবং শক্তি বৃদ্ধি পেলেও দেশের বাইরে কতগুলো নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। কারণ য়াহূদীরা স্বদেশ ছেড়ে চলে গেল উত্তর দিকে। তারা বসতি স্থাপন করল খায়বর ও ওয়াদি আল-কুরার মরূদ্যান এবং সিরিয়ার বাণিজ্য পথের বিভিন্ন ঘাঁটিসমূহে। অনতিবিলম্বে তারা স্থানীয় এবং চার-দিকের লোকজনকে উত্তেজিত করতে শুরু করল এবং ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করল মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। তারই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই যে, এতদঞ্চল দিয়ে যে সব মরুযাত্রী মদীনা যেত তাদেরকে দুমাতুল জান্দালের শাসক হয়রানি করতে শুরু করে। (মাসুদী, আত তানবিহ্ ওয়াল ইশরাফ, পৃঃ ২৪৮) একইভাবে তারা গাতফান গোত্রের সংগে আঁতাত গড়ে তোলে। এ ব্যাপারে তারা একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, মদীনা আক্রমণের সময় গাতফান গোত্র তাদের সংগে যোগ দিলে এক বছরে খায়বরে যে খেজুর উৎপন্ন হবে তার গোটা অংশই তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। (বালাযুরী, আনসাব, ১, ৩৪৩)। একই সময়ে খায়বরের নাদির গোত্রের য়াহূদীরা নতুনভাবে মদীনা আক্রমণ করার জন্যে কুরায়শদের উত্তেজিত করে তোলে এবং গাতফান ও ফাযারা গোত্রের আক্রমণ প্রস্তুতির সংগে মক্কাবাসীদেরকেও জুড়ে দেয়। (ইবনে কাসীর, ৪/৬) বালাযুরী (আনসব, ১, ৩৪৩) উল্লেখ করেছেন যে, এই অভিযানের সময় তায়েফবাসীরাও এক বাহিনী প্রেরণ করে। বনু সুলায়ম এবং আহাবিশ গোত্রের ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ঠিক একই রকম। সর্বোপরি, একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে,

খায়বরের অধিবাসীরা, বিশেষ করে নাদিরের য়াহূদীরা মদীনা অবরোধের সময় সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত থাকে। গুরুত্বপূর্ণ এই অভিযানে অংশগ্রহণের জন্যে তারা কোন সামরিক বাহিনী পাঠায়নি।

বনু মুসতালিকের যুদ্ধ ঃ অংকুরেই বিনষ্ট

শত্রুপক্ষের প্রকৃত পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভে শত্রুপক্ষের মিত্রদের ব্যাপারে কতগুলো জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া আবশ্যক।

মক্কাবাসী ছাড়াও আহাবিশদের মিত্রসমূহ গাতফান, ফাযারা, মুররাহ, আশজা এবং সুলায়ম গোত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেছেন। এতদসংগে বালাযুরী (আনসাব ১, ৩৪৩) তাকিফ গোত্রকেও সংযুক্ত করেছেন। কিন্তু কোন ঐতিহাসিকই বনু মুসতালিক গোত্রের যোগসাজশের ব্যাপারে কোনরকম সন্দেহ উত্থাপন করেননি। এখানে আমরা খন্দকের যুদ্ধের সংগে বনু মুসতালিক গোত্রের সংযুক্তির কারণ ব্যাখ্যা করবো ঃ

মুসতালিকেরা ছিলো খুজা'আ গোত্রের একটি শাখা। এই গোত্রের অন্য পরিবারগুলো বংশগতভাবেই রাসূল (সঃ)-এর মিত্র বলে পরিগণিত। কিন্তু মুসতালিকেরা আহাবিশদের একটি অংশ হিসাবে বিরাজ করছিলো এবং সে সূত্রে তারা মক্কার কুরায়শদেরও মিত্র। এটা স্পষ্ট যে. কোন মুসলমান অথবা এই গোত্রের বন্ধু সম্পর্কীয় কোন সদস্যের মাধ্যমে রাসূলে করীম (সঃ) মুসতালিকদের মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পর্কে জেনে থাকবেন। সুতরাং এই দুরভিসন্ধিকে তিনি অংকুরেই বিনষ্ট করে দেন। খন্দকের অবরোধকারীদের আগমনের মাত্র দু'মাস পূর্বে তিনি আকস্মিকভাবেই মুসতালিকদের উপর অভিযান চালান এবং ওদের অভিসন্ধি ব্যর্থ করে দেন।

আবারো উল্লেখ করছি যে, মদীনা অবরোধের ঠিক দু'মাস পূর্বে এই ঘটনাটি ঘটে। আমরা জানি যে, এই ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময় সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ এই ঘটনাটি ৪র্থ হিজরীতে, কারো কারো মতে ৫ম হিজরীতে, অনেকে আবার ৬ষ্ঠ হিজরীতে ঘটেছে বলে উল্লেখ করেছেন। বালাযুরী অবশ্য এই মত পার্থক্যের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, গোটা ব্যাপারটাই নির্ভর করছে সময় নির্ধারণ পদ্ধতির উপর। খলীফা উমর (রাঃ)-এর সংস্কারের পূর্বে হিজরী সাল গণনার

ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে তিনটি রীতি চালু ছিল। অনেকে হিজরতের পূর্ব বছর থেকেই হিজরী সাল গণনা করতেন, অনেকে আবার গণনা করতেন হিজরতের এক বছর পর থেকে। অবশ্য শাবান মাসে যে বনু মুসতালিকদের উপর আক্রমণ চালান হয়, সে ব্যাপারে সকলেই একমত। মদীনা অবরোধ করার জন্যে আক্রমণকারীরা যে সমস্ত অঞ্চল থেকে এসেছিলো, একটি মানচিত্রের উপর সে স্থানগুলো চিহ্নিত করলে অবস্থার গুরুত্ব এবং ভয়াবহতা সহজেই অনুধাবন করা যাবে।

মুসলমানদের রাজধানী মদীনা ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যে য়াহূদীদের পরিকল্পনা এবং আক্রমণ মুকাবিলার জন্যে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রস্তুতি

মদীনা অভিমুখী মরুযাত্রীদলের উপর দুমাতুল জান্দালের শাসকের উৎপীড়ন-অত্যাচারকে নবী করীম (সঃ) খুবই গুরুত্বের সংগে গ্রহণ করলেন। অবস্থার প্রতিরোধকল্পে তিনি একটি বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। অধিনায়কত্বের দায়িত্ব রাখলেন নিজের হাতে। ইবনে হিশাম উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) দুমাতুল জান্দালে না পৌঁছে মাঝপথ থেকেই প্রত্যাবর্তন করেন। দুমাতুল জান্দালে যাওয়ার সময় তিনি গাতফান এবং ফাযারা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। সম্ভবত সেখানে থাকতেই তিনি জানতে পারেন গাতফান এবং ফাযারা গোত্রের প্রস্তুতি এবং অবিলম্বে মদীনা আক্রমণের ব্যাপারে তাদের মনোভাবের কথা। এমনও হতে পারে যে, রাজধানী মদীনার বাইরে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অবস্থান এবং সুদূর দুমাতুল জান্দালের উদ্দেশে তার দীর্ঘ সফরের কথা জেনে তারা তাড়াহুড়া শুরু করে। ত্বরান্বিত করে তাদের মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, অভিযানের মাঝপথে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জেনেও শত্রুরা তাদের আক্রমণ পরিকল্পনা প্রত্যাহার করল না। বলা বাহুল্য, এমনি ঘটনা ঘটেছিলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে বদর অভিযানের সময়। মুসলমানদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত কুরায়শ বাণিজ্য কাফেলা নিরাপদে পালিয়ে গেলেও কুরায়শরা তাদের আক্রমণ অভিযান প্রত্যাহার করেনি। এমন সম্ভাবনাও আছে যে, মক্কায় অবস্থানরত প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর গুপ্তচরগণ এই গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মদীনায় খবর পাঠিয়েছিলেন। মদীনা থেকে পুনরায় সেই খবর প্রেরণ করা হয় সেনা শিবিরে; যেখানে রাসূলে করীম (সঃ) অবস্থান করছিলেন।

দুমাতুল জান্দাল
খায়বার
গাতফান এবং ফাজারাহ
মদীনা এবং বনু কুরায়জা
বনু সুলায়েম
তায়েফ
বনু মুস্তালিক
মক্কা এবং আহবিশ
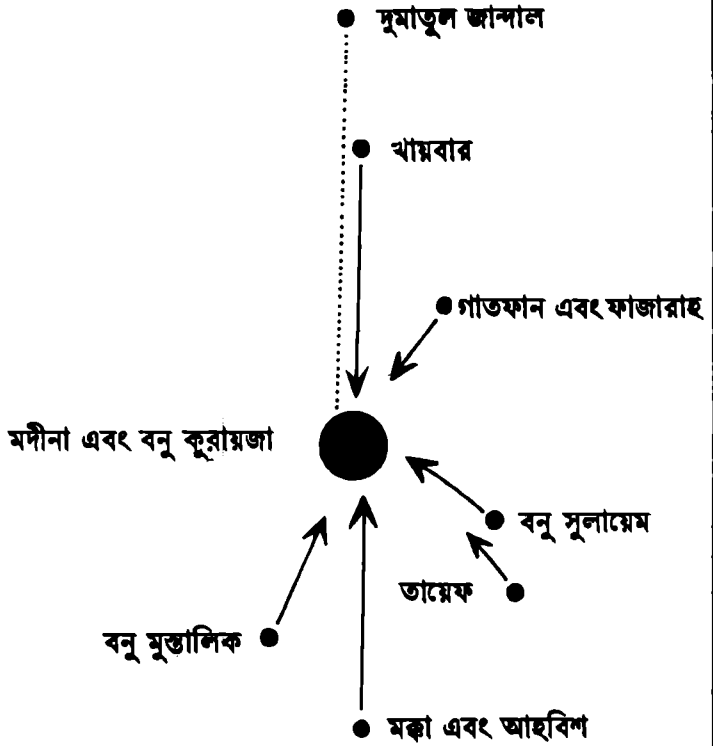
আস-শামী-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কুরায়শদের প্রস্তুতির খবর মদীনায় পৌঁছে খুজা'আ গোত্রের লোকদের মাধ্যমে। তারা এই খবর নিয়ে আসে অতি দ্রুততার সাথে এবং মাত্র চার দিনে। অথচ স্বাভাবিকভাবে এই পথ অতিক্রম করতে সময় লাগে ১২ দিন। (আস-শামী, সিরাহ, খন্দক)

আমার ধারণামতে গোটা ব্যাপারটা ছিলো খায়বরের য়াহূদীদের গভীর ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি। একদিকে তারা মক্কা ও গাতফানের বিশাল বাহিনীকে একযোগে মদীনা আক্রমণ করার জন্যে সংগঠিত করে, অপরদিকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্যসহ রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) যেন দুমাতুল জান্দালের মত দূরাঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেন, তেমন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। মদীনা থেকে দুমাতুল জান্দাল এতটা দূরে অবস্থিত যে, সেখানে যেতে সময় লাগত ১৫ দিন। য়াহূদীদের এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিলো দু'টি। প্রথমত, অনায়াসেই মুসল-মানদের রাজধানী মদীনাকে ধ্বংস করা এবং দ্বিতীয়ত, রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-কে হত্যা করা। বস্তুতপক্ষে দুমাতুল জান্দালের ঘটনা আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয়। বরং এটা ছিলো য়াহূদীদের ব্যাপক এবং পরি-কল্পিত চক্রান্তের একটি অংশ মাত্র।

যাহোক নবী করীম (সঃ) অতি দ্রুত মদীনা মনওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতির কাজে তৎপর হয়ে উঠেন।

উহূদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে এবার মুসলমানরা সর্বসম্মতিক্রমে অভ্যন্তরভাগ থেকে শহর প্রতিরক্ষার সিদ্ধান্ত নিলেন। স্থির করলেন যে, উন্মুক্ত ময়দানে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে চতুর্দিকে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অধিকতর জোরদার করার জন্যে রাজধানী যে সমস্ত সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে আক্রমণ করার আশংকা ছিল, সে সমস্ত অঞ্চলে দীর্ঘ পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নিলেন। অধিকাংশ মুসলমান ঐতিহাসিকের মতে পরিখা খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)। (তাবারী, ১, ১৪৬৫)। আল-ওয়াকিদী এবং আল-মাকরিজী উল্লেখ করেছেন যে, এ সময়ে তীব্র কটাক্ষ করে আবূ সুফিয়ান প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে একটি পত্র লিখে। পত্রে সে উল্লেখ করে যে, যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে সে অপ্রত্যাশিতভাবে এবং বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ়ের মত পরিখার পশ্চাতে আশ্রয় নিয়েছে। যাঁর পরামর্শে তিনি এই কৌশল অবলম্বন করেন তাঁর ব্যাপারে আবূ সুফিয়ানের বিস্ময়ের শেষ নেই। প্রিয়নবী

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এই পত্রের জবাবে জানান যে, "আল্লাহ্ পাক এই কৌশল অবলম্বন করতে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। (আল-ওয়াথাইক, আল-সিয়াসিয়াহ)

সে যাই হোক না কেন, সামরিক বিষয়াদিতে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন খুবই প্রগতিবাদী। উভয় পক্ষে রক্তপাতের আশংকাকে নিম্ন পর্যায়ে রেখে তিনি শত্রুকে পরাভূত করতেন এবং এ ব্যাপারে তিনি প্রতিপক্ষের চেয়ে সব সময়ই ছিলেন অধিকতর অগ্রসর।

পরিখা খননের কৌশলগত বিষয়

মদীনার চারদিকে পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) একটি ঘোড়া নিয়ে পরিদর্শন সফরে বেরিয়ে পড়লেন। সংগে গেলেন মুহাজির এবং আনসারদের মধ্য থেকে বেশ কিছু সংখ্যক স্থানীয় মুসলিম। বিস্তৃত প্রান্তর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ, কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্ধারণ করাই ছিলো এই সফরের উদ্দেশ্য। (আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাজী) তিনি আরো সিদ্ধান্ত নিলেন যে, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই মহিলা, শিশু, গবাদিপশু, মূল্যবান জিনিসপত্র এবং খাদ্যসামগ্রী দুর্গ ও কেল্লায় প্রেরণ করা হবে। উল্লেখ্য যে, মদীনা শহরে দুর্গ ও কেল্লার সংখ্যা ছিলো শত শত। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, মুসলমান সেনারা সাল পর্বতের পাদদেশে শিবির স্থাপন করবে। খনন করবে একটি দীর্ঘ ও গভীর পরিখা।

মদীনা শহরের চারপাশে রয়েছে অসংখ্য বাগান। বিশেষ করে দক্ষিণ সীমান্তের বাগানগুলো গভীর এবং ঘন। বিভিন্ন বাগানের মধ্যকার পথগুলো খুবই আঁকাবাঁকা। এগুলো এত সংকীর্ণ যে, শত্রুসেনাদের পক্ষে আক্রমণ প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিলো না, তারা বড়জোর লম্বা লাইন ধরে এগুতে পারত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন ছোট সেনাদলই অগ্রসরমান সৈন্যদেরকে প্রতিহত এবং অচল করে দিতে পারত। শহরের পূর্ব সীমান্তে বসবাস করত বনু কুরায়জা ও অন্যান্য য়াহূদী গোত্র এবং সে সময়ে মুসলমানদের সংগে তাদের সম্পর্ক ছিলো সন্তোষজনক। মোটের উপর উত্তরাঞ্চল ছিল একেবারেই উন্মুক্ত। পশ্চিম প্রান্তের কিছু অংশের অবস্থা ছিল একই রকম। পূর্বের অধ্যায়ে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

খন্দকের যুদ্ধের
মানচিত্র
উত্তর
পরিখা
কিলোমিটার
জাঘাবাহ এর
মিলন স্থান
জুবায়ের বাগান
জুবায়ের জলাশয়
জুবায়ের মসজিদ
ওহুদ পাহাড়
কাতানের উপত্যকা
কাতানের উপত্যকা
রাসূল (সঃ) এর বিশ্রাম স্থল
শায়খাইনের জোড় দুর্গ
বাতানের উপত্যকা
আকিক উপত্যকা
উমায়েদের পাহাড়
কিবলাতাইনের
মসজিদ
পরিখা
ফাতাহ মসজিদ
সাল পাহাড়
নবীজীর
মসজিদ
পরিখা
লাভা দ্বারা গঠিত পূর্বের সমতল ভূমি (ওয়াকিম)
বনু জফার এর গোত্র
আব্দুল আশহাল গোত্র
মানজুর উপত্যকা
বনু কুরায়জা
শামী মসজিদ
লাভা দ্বারা গঠিত পশ্চিমের সমতল ভূমি আল-ওয়াবারাহ
আকিক উপত্যকা
বনু নাদির গোত্র
কুবা মসজিদ
দক্ষিণ প্রান্তরের শুভ বিদায় পাহাড়
কাব ইবন আল আশরাফ

সুতরাং প্রথমেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, N আকৃতির একটি পরিখা খনন করা হবে। সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিখার খনন কাজ শুরু হয় উত্তর-পূর্ব কোণের শায়খাইনের যমজ দুর্গ থেকে। সেখান থেকে পরিখাটি উত্তর দিকের মাদহাদের 'শুভ-বিদায়' নামে পরিচিত পাহাড়ের (যানিয়াত আল-ওয়াদা) গাঁ ছুঁয়ে চলে গেছে পশ্চিম দিকে। পশ্চিমে বনু উবায়েদ পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে পরিখাটি আবার ফিরে আসে সাল পর্বতের দিকে। সাল পর্বত অতিক্রম করে পরিখাটি চলে যায় মসজিদ আল-ফাতাহ্ বা বিজয় মসজিদ-এর কাছে। (আস-শামহুদী, খন্দক) এভাবে পরিখাটি লাভা দ্বারা গঠিত দু'প্রান্তের দু'টি সমতল ভূমিকে সংযুক্ত করে। পরে পশ্চিম সীমান্তের গোত্রসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে পরিখাটি খনন করে দক্ষিণে আল-গামামাহ-এর মুসাল্লা পর্যন্ত নিয়ে যায়। (ওয়াকিদী, মাগাজী) এ কারণেই পরবর্তীতে ওয়াদি বাতানের পানি প্রবাহ গতি পরিবর্তন করে এবং এর স্রোত গিয়ে পড়ে পরিখার মধ্যে। (আল মাতারী) বস্তুত পক্ষে নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে পরিখা এত জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, সর্ব দক্ষিণে কুবার মত স্থানে, যেখানে কোন রকমের দুর্যোগের আশংকা ছিল না, সেখানকার অধিতকর সচেতন লোকেরাও তাদের দুর্গ ও কেল্লার চারপাশে পরিখা খনন করে। (ওয়াকিদী, মাগাজী)

পরিখাকে কেন্দ্র করে একটি প্রশ্ন রয়েছে যে, রাসূলে করীম (সঃ)-এর খননকৃত এই পরিখা কি গভীর এবং প্রশস্ত ছিলো, না এটি রাজমিস্ত্রীর কাজের মত একটি নালা ছিল? ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ পঞ্চম হিজরীর ঘটনা এবং যে দ্রুততার সাথে খনন কাজটি সম্পন্ন করতে হয়েছিলো সেই বিবেচনায় বলতে গেলে যে কেউ-ই প্রথম প্রস্তাবটিকে যথার্থ বলে ধরে নিবে। যা হোক, প্রায় দেড়শ বছর পর ১৪৪ হিজরীতে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ নামে ইমাম হাসানের এক নাতি আব্বাসীয় খলীফা আল-মনসুরকে খিলাফতের পদ থেকে উৎখাত করে নিজে শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার প্রয়াস চালায়। এ নিয়ে খলীফার বাহিনীর সংগে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্র মদীনায় যুদ্ধ বাধে। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) যেখানে পরিখা খনন করেছিলেন, এই যুদ্ধের সময় মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ও সেখানে এ পরিখা খনন করেন। তখন রাজমিস্ত্রীর কিছু কিছু কাজও আবিষ্কৃত হয়। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্

তখন ইট-পাথরের টুকরা জনসমক্ষে তুলে ধরেন এবং বলেন যে, এগুলো রাসূলে পাক হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পবিত্র সৃষ্টি। একথা শুনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উল্লাস ও উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে।

প্রশ্ন হলো, পরিখা খনন করার সময় রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) কি সত্য সত্যই ইট-পাথর ব্যবহার করেছিলেন। অথবা পরবর্তী সময়ে সেখানে কি দালান-কোঠা নির্মিত হয়েছিলো? কালের প্রবাহে বা অন্য কোন কারণে কি সেগুলো ধ্বংস হয়ে যায়? কেবলমাত্র অক্ষত অবস্থায় থাকে ইটের তৈরী দালানের ভিত্তিভূমি এবং মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ এগুলোকেই রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর আমলে অপূর্ব সৃষ্টি বলে কল্পনা করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে শেষোক্ত অনুমানটিকেই অধিকতর সত্য বলে মনে হয়। যাহোক এবার আলোচনার মূল বিষয়ে ফিরে আসা যাক।

ঐতিহাসিকগণের দেওয়া তথ্যানুসারে জানা যায় যে, রাসূলে করীম (সঃ)-এর দুমাতুল জান্দাল অভিযান হতে প্রত্যাবর্তনের পর এবং শত্রু সেনাদের আগমনের পূর্বে তাঁর হাতে সময় ছিলো মাত্র তিন কি চার মাস। খন্দকের যুদ্ধে সর্ব সাকল্যে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিলো তিন হাজার। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পরিখা খননের পরিকল্পনা নিলেন, ঠিক করে নিলেন খনন স্থানসমূহ। নির্ধারণ করে নিলেন পরিখার গভীরতা ও প্রশস্ততা। অতঃপর দশজন সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত প্রতি দলের উপর ৪০ কিউবিক খনন করার দায়িত্ব দেওয়া হল। (তাবারী, পৃঃ ১৪৬৭) এই হিসাব থেকে আমার ধারণা যে, মূল পরিখাটি লম্বায় সাড়ে তিন মাইলের মত ছিলো। পরিখার গভীরতা ও প্রশস্ততা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কোথাও কিছু উল্লেখ না থাকলেও ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা থেকে সামান্য কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, সালমান ফারসী (রাঃ) ছিলেন খুবই শক্ত-সামর্থ্য, দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ পুরুষ। তিনি একাই দশজনের কাজ সম্পন্ন করতে পারতেন। উল্লেখ আছে যে, তিনি একাই পাঁচ কিউবিক গভীর ও পাঁচ কিউবিক প্রশস্ত পরিখা খনন করেন। (ওয়াকিদী, মাগাজী) গভীরতার ব্যাপারে এই পরিমাপকে চূড়ান্ত বলা যাবে না। কারণ সালমান ফারসী (রাঃ) যেটুকু অসম্পূর্ণ রাখেন অন্যরা হয়তো সেটুকু যথারীতি সম্পন্ন করেন।

পরিখার পরিমাপ সম্পর্কে আরো কিছু বিবরণ রয়েছে। জানা যায় যে, পরিখার এক প্রান্তের সংকীর্ণ স্থানটুকু বাদ দিলে পরিখাটি এত প্রশস্ত ছিলো

যে, শত্রু পক্ষের একটি বলিষ্ঠ ঘোড়ার পক্ষেও লাফ দিয়ে এটা অতিক্রম করা সম্ভব ছিলো না। পরিখার যে অংশটুকু পাহাড়ের সংগে সংযুক্ত হয়েছে, সম্ভবত সে স্থান টুকুই ছিল সংকীর্ণ। এই পাহাড় পর্যবেক্ষণ কেল্লা এবং অগ্রসরমান শত্রুর তীর বর্ষণকে প্রতিহত করার জন্যে দুর্গ প্রাচীর হিসাবে ব্যবহৃত হতো। আল-ওয়াকিদী হতে উল্লেখ আছে যে, পরিখার উপর দিয়ে বেশ কতগুলো গেট ছিলো, কিন্তু সেগুলোর সঠিক অবস্থান আমাদের জানা নেই। (মাগাজী) হতে পারে যে, গেট বলতে এই পাহাড়কে বুঝান হয়েছে যার সংগে পরিখাটি সংযুক্ত রয়েছে। যাহোক, কথিত আছে যে, শত্রু পক্ষে নওফল আল-মাখজুমী নামে একজন অশ্বারোহী ছিলো। সে তার ঘোড়াসহ লাফ দিয়ে পরিখা অতিক্রম করার সময় পরিখার মধ্যে পড়ে যায়। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৯৯) অনুমান করা হয় যে, পরিখাটি প্রশস্ত ছিল ১০ গজ এবং গভীরতায় ৫ গজ।

মুসলিম মুজাহিদগণ দিনের বেলা পরিখা খননের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। বেলা শেষে ফিরে যেতেন নিজেদের গৃহে। রাত্রি যাপন করতেন পরিবার-পরিজনদের সংগে। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৭২) তবু রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) ছোট একটি পাহাড়ের চূড়ায় একটি তাঁবু টানান এবং রাতে ও দিনে তিনি সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। এখনো ধুবাব মসজিদ সেই স্থানের স্মৃতি বহন করছে। তাছাড়া পরিখা খননের কাজে একটি দলের সংগে প্রত্যক্ষ-ভাবে যোগ দিয়ে তিনি সৈন্যদেরকে উৎসাহিত করেন এবং এভাবে কার্যকর করে তোলেন তাঁর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা। (তাবারী, পৃঃ ১৪৬৫-৭)

পরিখা খননে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অংশগ্রহণ এবং খনন কার্য তত্ত্বাবধান

সৈন্যদের মধ্যে দল গঠনের সময় স্বাভাবিকভাবেই খানিকটা মন কষাকষির সূত্রপাত ঘটে। অবশ্য তাঁদের এই মন কষাকষির মধ্যে কোন রকম হিংসা বা ঈর্ষা ছিলো না। যাহোক, রাসূলে করীম (সঃ)-এর উপস্থি-তিতে তা অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত আন্তরিকতার সংগে নিজেদের মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি করে ফেলেন। পূর্বেই আমরা দেখেছি যে, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) ছিলেন অসাধারণ কর্মক্ষমতার অধিকারী। ফলে প্রত্যেকেই হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-কে নিজেদের দলে পাওয়ার প্রত্যাশা করেন।

বিষয়টি নিয়ে যাতে কোনরকম কোন্দলের সৃষ্টি না হয়, সেজন্যে রাসূলে করীম (সঃ) বলে দিলেন যে, 'না সালমান কোথাও যাবেন না। তিনি থাকবেন আমাদের সংগে, (আমার) পরিবার সদস্যদের দলে।' উপরের এ আলোচনা থেকে কেউ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন যে, নবী করীম (সঃ) এবং সালমান ফারসী (রাঃ) যে দলে ছিলেন, সে দলটি অবশ্যই হযরত আলী (রাঃ) এবং রাসূল (সঃ)-এর পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয়েছিলো। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটা স্বতন্ত্র কোন দল ছিল না। বরং এ দলটি ছিল অন্যান্য দলের মত। আনসার, মুহাজির সকলেই ছিলেন এই দলে। (তাবারী ১, ১৪৬৭) কিছু কিছু বর্ণনা (আল-ওয়াকিদী, আস-শামী) থেকে জানা যায় যে, আবূ বকর (রাঃ) এবং উমর (রাঃ) কখনো কেউ কারো সঙ্গ ছাড়েন নি। প্রচণ্ড কাজের চাপ এবং অনিদ্রার অভাবে একদিন রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) দিনের বেলা ঘুমিয়ে পড়েন। তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ)-কে তাঁর শিয়রের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। নবীজীর নিদ্রায় যাতে কোন রকম ব্যাঘাত না ঘটে, তিনি যাতে জেগে না ওঠেন, সে জন্যে দলের অন্যান্য সৈন্যকে দূরে সরিয়ে দেন। একই সূত্র থেকে আরও চমৎকার কতগুলো বিবরণ জানা যায় যে, দ্রুত মাটি কাটতে গিয়ে এবং তাড়াহুড়ার মধ্যে মুসলমান সৈন্যরা তাঁদের ঝুড়ি খুঁজে পাননি। তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) তাঁদের কাপড় ভর্তি করে মাটি পরিবহনের ব্যবস্থা করেন।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত নির্মাণ কাজ তদারকি করলেন, এমনকি খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয়কে রাখলেন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। পরিখা খননের সময় একবার একটি বৃহদাকারের পাথর পড়ে পরিখাকে গভীর করার কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। কর্তব্যরত সৈন্যরা তখন পাশ কেটে যাওয়ার উদ্যোগ নেন। কিন্তু রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) তৎক্ষণাৎ পরিখার মধ্যে অবতরণ করেন এবং আঘাতের পর আঘাত দিয়ে পাথরটিকে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। (ইবনে হিশাম, ৬৭৩; তাবারী ১, ১৪৬৭)।

তখন রমযান মাস হলেও পরিখা খননের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে। খননকারিগণ ছন্দের তালে তালে সুমধুর শ্লোক উচ্চারণের মাধ্যমে মাটি কাটতে থাকেন একে অপরের সংগে পাল্লা দিয়ে। এমনকি ছোট ছোট বালকেরাও পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাস ও উৎসাহের সংগে খনন কাজে সাহায্য করতে

থাকেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় যায়েদ বিন সাবেত সবেমাত্র কৈশোরে পা দিয়েছেন। অবিরাম কাজ এবং উত্তাপের কারণে তাঁকে ক্লান্তিতে এমনভাবে পেয়ে বসে যে, হঠাৎ করেই একদিন তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। উমারা ইবনে হাজম (রাঃ) ছিলেন খুবই আমুদে। ব্যাপারটা তাঁর নজরে পড়তেই তিনি যায়েদের পোশাক ও খনন সামগ্রীগুলো তুলে নেন এবং ফুর্তি করার জন্যে তা অন্যত্র লুকিয়ে রাখেন। যায়েদের যখন ঘুম ভাঙল, তখন তিনি স্বাভাবিক-ভাবেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। ঘটনাক্রমে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জেনে গেলেন এই খবর। তখন তিনি যায়েদকে ঘুমানী (আবু রুকাদ) বলে সম্বোধন করেন এবং উমারা (রাঃ)-কে তিরস্কারের সুরে বলেন যে, ছোটদের সংগে এভাবে তামাশা করাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। (ওয়াকিদী)

কাজের ফাঁকে ফাঁকে পরিতৃপ্তির সংগে খাওয়া-দাওয়া চলতে থাকে। কেউ মেষ যবাই করেন, কেউ আবার ঝুড়ি ভর্তি খেজুর নিয়ে আসেন। আরেক-জনে নিয়ে আসেন অন্যকিছু।

নগর-রাষ্ট্র মদীনার প্রথম হিজরীর (৬২২ খৃঃ) সংবিধান অনুসারে মদীনার য়াহূদীরাও এর সংগে সংযুক্ত হয়ে পড়ে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় শহরের সাধারণ প্রতিরক্ষার জন্যে য়াহূদীরা মুসলমানদের সংগে সহযোগিতা করতে বাধ্য ছিলো। আল-ওয়াকিদীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, পরিখা খননের সময় রাসূলে করীম (সঃ) বনু কুরায়জার য়াহূদীদের নিকট থেকে খনন সামগ্রীলাভ করেন। তিনি এগুলো সংগ্রহ করেছিলেন ধার হিসাবে।

ইবনে সা'দের বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, পরিখার পূর্বাংশ অর্থাৎ পূর্ব দিককার লাভা সমভূমিতে অবস্থিত রাতিজের নিকটবর্তী শায়খাইনের জোড়া কেল্লা থেকে ধুবাব পর্বত পর্যন্ত এলাকার প্রতিরক্ষার পবিত্র দায়িত্ব মুহা-জিরগণের উপর অর্পণ করা হয়। অপরদিকে পরিখার অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ ধুবাব পর্বত থেকে শুরু করে মাধাদ-এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে সাল পর্বতের নিকট বিজয় মসজিদ এবং কিবলাতাইন মসজিদের নিকটে বনু উবায়েদ পর্বত পর্যন্ত গোটা অংশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় আনসারদের উপর। আনসাররা সংখ্যায় যেমন অধিক ছিলেন, তেমনি এ অংশে পরিখার বিস্তৃতির পরিমাণও ছিলো বেশি। (ইবনে সাদ, ২/১, পৃঃ ৪৮)

রাতিজ অবশ্যই একটি গ্রামের নাম। এখানে রাতিজ নামে একটি প্রসিদ্ধ দুর্গ ছিলো। সেখান থেকেই গ্রামের নাম হয় রাতিজ। বর্তমানে গ্রামটি

নির্মূল হয়ে গেছে। উহুদ পর্বতের সন্নিকটে দুই গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি অবশ্য শায়খাইনের জোড়া কেল্লা স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রেখেছে। কথিত আছে যে, সে আমলে দু'জন বয়স্ক মানুষ এই দুর্গে বাস করত। তাদের মধ্যে একজন ছিলো পুরুষ, দ্বিতীয়জন নারী। দুর্গ দুটি এত কাছাকাছি অবস্থিত ছিল যে, দুর্গের উপর দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা পরস্পরের সংগে কথা বলতে পারত। সেই থেকে জোড়া কেল্লার নামকরণ করা হয় শায়খাইন (অর্থাৎ দুজন বৃদ্ধ মানুষ)। ধুবাবকে এখনো সেখানে দেখা যায়। অবশ্য বনু উবায়েদেরে নাম পাল্টে গেছে। লাভা দ্বারা গঠিত পশ্চিমের সমতল ভূমির কিবলাতাইনের মসজিদের সাহায্যে পাহাড়টি শনাক্ত করার জন্যে যথেষ্ট। আল-হাজিমীর মতে মাধাদ রয়েছে বিজয় মসজিদের পশ্চিমে। (আল-হাজিমী, আমকিন) সাল পর্বতের এই বিজয় মসজিদটি সর্বজন পরিচিত এবং এখনো মসজিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখান হয়। মসজিদটির এ ধরনের নামকরণ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, যুদ্ধের পূর্বে এখানে বসে রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) একনাগাড়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিজয় লাভের জন্যে আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করেছেন এবং আল্লাহ্ পাকও তাঁকে নিরাশ করেন নি। সেই থেকে মসজিদটিকে বলা হয় বিজয় মসজিদ। অবরোধকালে যে স্থানে রাসূলে করীম (সঃ)-এর তাঁবু টানান হয়েছিলো, এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে ঠিক সে স্থানে। সাল পর্বতের চূড়ায় উত্তর-পশ্চিম কোণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক স্থানে এটা অবস্থিত।

শত্রু বাহিনীর উপস্থিতি

পরিখা খননের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলে এবং কাজটি সম্পন্ন হয় শাওয়াল মাসের গোড়ার দিকে। ইতিমধ্যে শত্রুসেনারা উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে দলে দলে মদীনা পৌঁছতে শুরু করে। উহুদ অভিযানের ন্যায় এবারও শত্রুসেনারা শিবির স্থাপন করে মদীনার উত্তর সীমান্তে। কুরায়শরা আল-যাবাহ্-এর বনভূমি এবং জুরাফ-এর মাঝখানে রুমাহ থেকে পশ্চিম দিকে এবং জাঘাবাহ্-এর সংগমস্থলে অবস্থান করে। তাদের সংগে ছিল মিত্রশক্তি আহাবিশ, কিন্নাহ এবং তিহামাহ গোত্রের ভাড়াটিয়া সৈন্যরা। কথিত আছে যে, তারা সংখ্যায় ছিলো ১২ হাজারের মত। সম্ভবত উত্তরাঞ্চলের সন্ধিবদ্ধ গোত্রসমূহ থেকে আগত ৭০০০ সৈন্য এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

কুরআনুল করীমের ভাষায় কুরায়শ এবং তাদের দক্ষিণাঞ্চলের মিত্র বাহিনী 'মুসলমানগণের নিম্নভাগ' দিয়ে আগমন করে। উত্তরাঞ্চলের সন্ধি-বদ্ধ গোত্র গাতফান ও ফাযারা এবং নজ্‌দের বনু আসাদের সৈন্যরা আসে মুসলমানদের উপরিভাগ দিয়ে। উল্লেখ্য যে, খায়বর অঞ্চলে উৎপাদিত এক বছরের সব খেজুর প্রাপ্তির বিনিময়ে গাতফান এবং ফাযারা গোত্র ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে এই যুদ্ধে য়াহূদীদের সংগে যোগ দেয়। তারা শিবির স্থাপন করে উহুদের দিকে ওয়াদি নামান-এর নিকটে ধানাব নাকমায়। এদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৭,০০০।

শত্রু বাহিনী মদীনার সীমান্তে পেঁছার পর রাসূলে করীম (সঃ) তাঁর পরিবারের লোকজনকে বিভিন্ন দুর্গে প্রেরণ করেন। (তাবারী, ১, ১৪৭০) মা জননী আয়েশা (রাঃ) গেলেন বনু হারিসার দুর্গে। (তাবারী, ১, ১৪৭৬) চাচী সুফিয়া (রাঃ) গেলেন আনসার কবি হাসান ইবনে সাবিতের ফারি নামক দুর্গে এবং সেখানে সংগঠিত তাঁর দুঃসাহসিক কীর্তির কথা সর্বজন বিদিত। (ইবনে হিশাম, পৃঃ-৬৮০) ঘটনাটি ছিল এ রকম : মুসলমানদেরকে শহরের বাইরে বাঁচা-মরা লড়াইয়ে লিপ্ত থাকতে দেখে একদল য়াহূদী মুসলমানদের বাড়িঘর লুটপাট করার পাঁয়তারা করে। উদ্যোগ নেয় মুসল-মান নারী ও শিশুদের নির্যাতনের। তাদের মধ্যে একজন যখন দুর্গের বহিঃদেয়ালের উপর আরোহণ করে তখন সুফিয়া (রাঃ) তাকে দেখে ফেলেন। কারো কোনরকম সহযোগিতা ছাড়াই তিনি তাকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করেন এবং ছিন্ন মস্তকটি ছুঁড়ে ফেলেন নিচে দাঁড়িয়ে থাকা য়াহূদীদের মধ্যে। এ অবস্থা দেখে তারা ভীষণ রকম ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে পালিয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে মহিলা হয়েও সুফিয়া পুরুষ সৈন্যদের ন্যায় অধিকৃত শত্রু সম্পদের একটি অংশ পুরস্কার হিসাবে লাভ করেন। বলা বাহুল্য, তিনি যথার্থভাবেই এই পুরস্কারের যোগ্য ছিলেন। (ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯)

জানা যায় যে, যুদ্ধের মাসখানেক আগেই মাঠের সব ফসল কাটা হয়েছিল। (আস-শামী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১১, ওয়াকিদী) ফলে শত্রু সেনারা যে খাবার মদীনায় বহন করে এনেছিল, সে খাবার ব্যতীত তাদের ঘোড়াগুলো আর কোন খাবারই পেলো না।

শত্রু সেনারা যখন তাদের সেনা ছাউনিতে স্থির হয়ে বসে, মুসলমানরা তখন সাল পাহাড়ের নিকটে শিবির স্থাপন করেন এবং রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর তাঁবুটি স্থানান্তর করেন ধুবাব পাহাড় থেকে বর্তমানে যেখানে বিজয় মসজিদ রয়েছে সেখানে। বিজয় মসজিদের পাশেই রয়েছে আরো চারটি মসজিদ। এগুলোর স্মৃতি হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ), হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এবং হযরত আবুযর (রাঃ)-এর নামের সংগে জড়িয়ে আছে। জানা যায় যে, যে সব স্থানে মসজিদগুলো নির্মিত হয়েছে, সে সব স্থানে তাঁদের তাঁবু ছিলো। হজ্জযাত্রীরা মদীনায় এই পাঁচটি মসজিদের প্রতি তাদের গভীর এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন।

তিন হাজার সৈন্যর সমন্বয়ে গঠিত মুসলিম বাহিনীর অশ্বারোহী সংখ্যা ছিলো পঁয়ত্রিশ। তাঁরা সারাক্ষণ পরিখার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত টহল দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকেন। (আল-ওয়াকিদী)

পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধ

মুসলিম সেনারা সাল পাহাড়ে এবং পাহাড়ের পাদদেশে শিবির স্থাপনের পর কতগুলো দলে বিভক্ত হয়ে যান। তাঁরা পালা করে এবং সার্বক্ষণিক-ভাবে পরিখা পাহারা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকেন। পদাতিক এবং অশ্বারোহী বাহিনী উভয় দলই এ দায়িত্ব পালনে সক্রিয় অংশ নেন। এ সময় কোন রকম খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। তবে মাঝেমধ্যে উভয় পক্ষ পরস্পরের প্রতি তীর বর্ষণ করে। বিশেষ করে শত্রু পক্ষ পরিখা অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে যখন পরিখার সেতুমুখ দখল করার প্রচেষ্টা চালায়, তখন এই ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। তাছাড়া শত্রু পক্ষের অশ্বারোহীরা পরিখার চারপাশে ঘুরে বেড়ায় এবং মুসলমান সেনাদের দুর্বলতা এবং অসাবধানতা অনুসন্ধান করতে থাকে। তাদের মধ্যে যারা দুর্ধর্ষ এবং দুঃসাহসী তারা একবার কি দু'বার লাফিয়ে পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টা চালায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নওফেল ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-মাখজুমী ছিলো এমন একজন দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী। সে লাফ দিয়ে পরিখা অতিক্রম করার সময় ঘোড়া থেকে পরিখার মধ্যে পড়ে যায়। মুসলমানরা তখন তাকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে শুরু করেন। কথিত আছে যে, সংগী-সাথীগণকে থামিয়ে দিয়ে হযরত আলী (রাঃ) পরিখার মধ্যে অবতরণ করেন এবং তাকে হত্যা করেন। নওফেলের মৃতদেহ ফেরত প্রাপ্তির আশায় শত্রু পক্ষ

উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ (দশ হাজার দিরহাম) পরিশোধ করার জন্যে প্রস্তুত ছিলো। কিন্তু রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) বিনামূল্যে তার মৃতদেহ সরিয়ে নেয়ার অনুমতি দেন। (ইবনে হাম্বল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৭১, আশ্-শামী চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২১৪/এ) একবার বেশ কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিম বাহিনীর সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়তে সমর্থ হয়। কিন্তু যারা দুনিয়ার জীবন অপেক্ষা শহীদী জীবনকে বেশি পছন্দ করে সেই মুসলমানদের সংগে বেশিক্ষণ মুকাবিলার দুঃসাহস তাদের হল না। সংগী-সাথীদের অসংখ্য মৃতদেহ পেছনে ফেলে রেখে অতি দ্রুত সেখান থেকে তারা পালিয়ে যায়। (তাবারী, ১. ১৪৭৫-৬)

একবার অন্ধকার রাতে মুসলমানদের দু'টি টহলদার দল দু'দিক থেকে আসছিলেন এবং ভুলক্রমে তাঁরা পরস্পরের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সংকেত ধ্বনির সাহায্যে তাঁরা তাঁদের ভ্রান্তিকে উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হওয়ার পূর্বেই রক্ত ঝরলো। পরস্পরের আঘাতে আহত ও নিহত হলেন মুসলমান সেনারা। ঘটনাটি যখন রাসূলে করীম (সঃ)-এর নিকট উপস্থাপিত হলো, তখন তিনি বললেন—যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁরা শহীদ। যাঁদের রক্ত ঝরেছে, তাঁরা আহত হয়েছেন আল্লাহ্ পাকের রাস্তায়। কোন রকম বিচার-আচার না করে, কাউকে কোন রকম শাস্তি না দিয়ে এখানেই তিনি বিষয়টির সমাপ্তি টানলেন। (আদ-দাখিরাহ আল-বুরহানিয়া, বুরহান আদ-দীন আল-মার-ঘিনানী) অবশ্য তিনি মুসলমানদেরকে ভবিষ্যতে আরও সজাগ ও সতর্ক থাকার হুকুম দিলেন।

কুরায়শ বাহিনীর খাদ্য-খাবারের মওজুদ হ্রাস পেতে থাকে। নিঃশেষ হয়ে আসে গবাদিপশুর আহার। ঘাটতি পূরণের জন্যে খানিকটা সরবরাহ এল খায়বর থেকে। কারণ মক্কার চেয়ে খায়বর ছিলো অধিকতর নিকটে এবং তাদের যোগাযোগের পথও ছিলো উন্মুক্ত। তৎসত্ত্বেও ইতিহাসে এ ধরনের একটি বিবরণ রয়েছে যে, হুবাই ইবনে আখতাব নামের নাদির গোত্রের একজন য়াহূদী কুরায়শ বাহিনীর জন্যে ২০টি উট বোঝাই করে বালি, শুকনো খেজুর ও পশুর জন্যে তুষ বা খেসা প্রেরণ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গোটা চালানটাই মুসলমান টহলদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে এবং উট বোঝাই সব খাদ্য-খাবার তারা নিয়ে আসেন মুসলিম শিবিরে। এগুলোকে তারা গ্রহণ করেন যুদ্ধে অধিকৃত সম্পদ হিসাবে। (আস-শামী)

দীর্ঘদিনের নিষ্ফল অবরোধ এবং খাদ্য-খাবারের মওজুদ নিঃশেষ হয়ে আসার কারণে কুরায়শ বাহিনী ভীষণ রকমের ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা মদীনায় বসবাসরত য়াহূদীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্যে হুবাই ইবনে আখতাব নামে নাদির গোত্রের একজন য়াহূদীকে নিয়োগ করে। শহরের অভ্যন্তর থেকে পশ্চাৎভাগ দিয়ে মুসলমানদের প্রতি আঘাত হানার জন্যে সে য়াহূদীদের প্ররোচিত করতে থাকে। মদীনার য়াহূদীদের মধ্যে কুরায়জা গোত্র ছিলো সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। শুরুতে এ ব্যাপারে তারা দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করতে থাকে। অবশেষে ধূর্ত হুবাই ইবনে আখতাব সফল হল। দুরভিসন্ধি অনুসারে সে য়াহূদীদের পথে নামাল। এবার শুরু হল কুরায়জার য়াহূদীদের প্রস্তুতি। এমন অসময়ে কিছু সংখ্যক য়াহূদীর দৃষ্টিভংগি ও চাল-চলনের এই পরিবর্তন স্থানীয় কোন কোন মুসলমানের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। তাঁরা শুনতে পেলেন যে, এরা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নাম ধরে অপমান-অপদস্তিমূলক কথা বলে, গালাগালি করে। প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করার জন্যে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) একজন গুপ্তচর পাঠালেন। নির্দেশ দিলেন যে, যদি সব কিছু যথাযথভাবে না থাকে, তাহলে তিনি একথা প্রকাশ করবেন না। গুপ্তচর ফিরে এসে নবীজীকে জানালেন যে, যা সন্দেহ করা হয়েছিলো বাস্তব অবস্থা তারচেয়ে বহুগুণে গুরুতর। (ওয়াকিদী) য়াহূদীদের মুকাবিলা করার জন্যে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর গৃহীত ব্যবস্থাদি থেকেই তাদের পরিকল্পনার ভয়াবহতা অনুমান করা যায়।

আস-শামী-এর বর্ণনা মতে, কুরায়জার য়াহূদীরা রাতের আঁধারে রাজধানী মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) শহর প্রতিরক্ষার জন্যে সলিমাহ ইবনে আসলাম ইবনে হুরাইশ-এর নেতৃত্বে ২০০ সৈন্য এবং যায়দ ইবনে হারিসার নেতৃত্বে ৩০০ সৈন্যের দু'টি বাহিনী প্রেরণ করেন। স্পষ্টতই তাঁরা শহরের দিকে অগ্রসর হলেন দু'টি ভিন্ন পথ ধরে। তাঁরা রাতব্যাপী অবিরাম আওয়াজ তুললেন—আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার----। বলা বাহুল্য, এটাই ছিলো মুসলমানদের যুদ্ধ ধ্বনি। এই আওয়াজ শুনে য়াহূদীরা এতটা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে, তারা শহর আক্রমণ করার সাহস পেল না। (ইবনে সাদ ২/১, পৃঃ ৪৮)

এ প্রসংগে হযরত আবু বকর (রা)-এরও একটি উক্তি রয়েছে। তিনি বলেছেন যে, সেই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে আমি বার বার সাল পাহাড়ের চূড়ায়

আরোহণ করেছি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছি মদীনার ঘরবাড়িগুলোর উপর এবং আমি সেগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখে আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া আদায় করেছি। (ওয়াকিদী)

সাল পাহাড়ে খন্দকের যুদ্ধের সময়কার কতগুলো শিলালিপি পাওয়া গেছে (বিস্তারিত বিবরণের জন্যে ইসলামিক কালচার, অক্টোবর, ১৯৩৯, হায়দ্রাবাদ, দেখা যেতে পারে)। এই শিলালিপিগুলো থেকেই মুসলমানদের গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। শিলালিপিগুলোর মধ্যে একটি হযরত উমর (রাঃ)-এর নিজের হাতের লেখা। তাতে লেখা আছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) সারাটা দিন ও সারাটা রাত এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারকল্পে আল্লাহ্‌র দরবারে ব্যাকুলভাবে মুনাজাত করেছেন। শিলালিপির উপর লিখিত বিষয়বস্তু এত স্পষ্ট যে, এর উপর কোন রকম মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

এটা স্পষ্ট যে, অবরোধকারীরা পরিখার অপর প্রান্তে তাদের কার্যক্রমকে ব্যাপক ও তীব্রতর করে তোলে। অবরোধের শেষ দিনগুলোতে দুর্যোগ এমন চরম আকার ধারণ করে যে, একদিন রাসূলে করীম (সঃ) এবং প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত সংগী-সাথীরা নামায আদায় করার মত অবসর পেলেন না। তাঁরা যোহর, আসর, মাগরিব ও ঈশার নামায রাতের বেলা এক সাথে আদায় করলেন। (কানযুল-উম্মাল, আহজাব; ইবনে সাদ ২/১, পৃঃ ৪৯, মাকরিজী, ইমতা প্রথম খণ্ড, ২৩৩) অবস্থা যে ভয়াবহ এবং সংগীন ছিলো, কুরআনুল করীমের বর্ণনা থেকেই তার স্বাক্ষর মেলে।

অবরোধ দুই সপ্তাহ থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত চলছিলো। মাকরিজী তাঁর রচিত ইমতা গ্রন্থে অবরোধের সময়সীমা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্যের কথা বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কারো কারো মতে অবরোধের সময়সীমা ছিল ১৫ দিন, কারো মতে ২০ দিন। অনেকে আবার প্রায় এক মাসের কথা বলেছেন। এ ধরনের মত পার্থক্য সম্ভবত এ কারণে হয়ে থাকবে যে, শত্রুপক্ষের মিত্ররা একই দিনে, একই মুহূর্তে যুদ্ধের ময়দানে আসেনি। যারা প্রথমে এসেছিলো তারা এখানে অবস্থান করেছিলো প্রায় এক মাস এবং সবশেষে যারা আসে তাদের অবস্থান কাল ছিলো মাত্র ১৫ দিন।

ঠাণ্ডা লড়াই

শত্রু সেনাদের তৎপরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, প্রিয়নবী (সঃ)-এর তরফ থেকে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়ে। তাই আমরা দেখতে পাই যে, শত্রু পক্ষের মিত্রদলগুলোর মধ্যে লোভী হিসাবে পরিচিত গাতফান ও ফাযারা -এর সৈন্যদের সংগে স্বতন্ত্রভাবে শান্তি আলোচনার জন্যে রাসূলে করীম (সঃ) গুপ্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। হারিস ইবনে আওফ (রাঃ) গাতফান গোত্রের সংগে যোগাযোগ করলেন এবং উইনাহ্ ইবনে হিসান (রাঃ) গেলেন ফাযারা গোত্রের কাছে। বেশ কিছুটা আলাপ-আলোচনা এবং দর কষাকষির পর তাদের মধ্যে চুক্তি স্থাপনের সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং চামড়ার উপর লিখিতভাবে তা যথারীতি সম্পন্ন করা হয়। চুক্তির শর্তাবলী সম্পর্কে আলোচনাকালে গাতফান গোত্র মদীনায় উৎপাদিত খেজুরের অর্ধাংশ দাবি করে। নবীজী মাঝামাঝি একটি অংশ প্রদান করাকে যুক্তিসংগত মনে করেন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, অনুরূপ শর্তের প্রেক্ষিতেই গাতফান এবং ফাযারা-এর সৈন্য কুরায়শ বাহিনীর সংগে যোগ দিয়েছিলো। প্রসংগক্রমে বলে রাখা আবশ্যক যে, এসব গোত্রের সংগে মুসলমানদের ব্যক্তিগত এমন কোন কোন্দল ছিলো না, যেগুলোর নিষ্পত্তি সম্পর্কে তখন আলোচনা হতে পারত। যাহোক, মদীনার বাগানের মালিকগণ লক্ষ্য করলেন যে, তাদের এ দাবির মধ্যে ভয়ানক রকমের বাড়াবাড়ি রয়েছে এবং এ দাবিকে মেনে নিলেও তেমন কোন লাভ হবে না। তাই এখানেই শান্তি আলোচনার সমাপ্তি ঘটে। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৭৬, তাবারী, পৃঃ ১৪৭৪)

অতঃপর রাসূলে করীম (সঃ) প্রচারাভিযান এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পথকে বেছে নিলেন। তিনি নিয়োগ করলেন নুয়াইম ইবনে মাসুদ (রাঃ)-কে। তিনি ছিলেন উত্তর আরবের আশজা গোত্রের লোক। গোত্রের অন্যান্য লোকের সংগে তিনিও মদীনা এসেছিলেন একজন অবরোধকারী হিসাবে। কিন্তু অবরোধ চলাকালীন সময়ে তিনি ইসলাম ধর্মের শাশ্বত সত্যের প্রতি অভিভূত হন। অবশ্য তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি তখনো সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশ পায় নি। প্রথমে তিনি বনু কুরায়জার য়াহূদীদের নিকট গেলেন। তাদের বললেন—"এখনো এটা নিশ্চিত নয় যে, এ যুদ্ধে কুরায়শরা বিজয় লাভ করবে। আজ হোক আর কাল হোক, এই বিদেশী অবরোধকারীদের অবশ্যই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং যখন তারা প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তোমরা

এককভাবে মুহাম্মদ (সঃ)-এর মুকাবিলায় টিকে থাকতে পারবে না। সুতরাং প্রথমে তোমরা এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা গ্রহণ কর যে, মক্কার লোকেরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের প্রাক্তন ভাইদের সংগে লড়াই চালিয়ে যাবে। অন্যথায় তোমরা এ বিবাদে নিজেদের জড়িয়ে ফেল না। এ নিশ্চয়তার পূর্বাভাস বা বায়না হিসাবে তাদের নিকট জামিন দাবি কর।" বনু কুরায়জা এ পরামর্শকে যুক্তিসংগত এবং যথার্থ বলে মনে করল।

অতঃপর হযরত নুয়াইম ইবনে মাসুদ (রাঃ) চলে গেলেন কুরায়শ শিবিরে। তাদের বললেন যে, তিনি এ ধরনের খবর পেয়েছেন যে, কুরায়জার য়াহূদীরা প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সংগে একটি গোপন ষড়যন্ত্রে আবদ্ধ হয়েছে। মুহাম্মদ (সঃ)-এর সঙ্গে তাদের এই আঁতাত বা বন্ধুত্বের জামিন হিসাবে তারা মক্কার কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে বন্দী করে তাঁর নিকট হস্তান্তর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সুতরাং তোমরা এ সমস্ত য়াহূদীর ব্যাপারে সাবধান থেকো। তোমরা বরং এই যুদ্ধে তাদের অকৃত্রিম সহযোগিতা এবং মৈত্রীর প্রমাণস্বরূপ পবিত্র 'সাবাথ' দিবসে যুদ্ধ করার জন্যে আহবান কর। কারণ ঐদিন মুসলমানরা য়াহূদীদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে নিজেদের প্রহরা এবং প্রস্তুতিকে শিথিল রাখবে।"

গাতফান এবং শত্রুপক্ষের অন্য দলগুলোকেও তিনি অনুরূপ বুদ্ধি-পরামর্শ দিলেন। অবশেষে তিনি ফিরে এলেন মুসলিম শিবিরে এবং এ ধরনের একটি গুজব রটিয়ে দিলেন যে, য়াহূদীরা জিম্মী হিসাবে অবরোধকারীদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দাবি করেছে। তারা এই জিম্মীদেরকে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাতে তুলে দিবে। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-ও সময়মত মুসলিম শিবিরের এই গুজব সম্পর্কে জেনে গেলেন। তিনি বললেন যে, 'হতে পারে যে, আমরাই য়াহূদীদেরকে অনুরূপ দাবিনামা উত্থাপন করার জন্যে প্রলুব্ধ করেছি।'

এ ঘটনার পর পরই মাসউদ আল-নামমাম নামের এক সংবাদদাতা দ্রুত কুরায়শ শিবিরের দিকে ছুটে যায়। স্পষ্টভাবেই অনুমান করা যায় যে, এই সংবাদদাতা ছিল রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রেরিত গুপ্ত প্রতিনিধি হযরত নুয়াইম ইবনে মাস'উদ আল-আশজায়ী (রাঃ)-এর পিতা। য়াহূদীদের জিম্মী দাবি প্রসংগে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে মন্তব্য করেছিলেন, মাসউদ আল-নামমাম সে কথাগুলো কুরায়শ নেতা আবু সুফিয়ানকে বলে দেয়।

বস্তুতপক্ষে নিজেকে একজন সজাগ ও ওয়াকিফহাল সংবাদদাতা হিসাবে তুলে ধরাই ছিল তার এই উদ্যোগ-আয়োজনের মূল লক্ষ্য। যাহোক, ইতিমধ্যে য়াহূদী প্রতিনিধিরা কুরায়শ শিবিরে এসে হাযির হয় এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে জিম্মী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কথা বলে। এভাবেই মুসলিম বাহিনীর এই প্রচারাভিযান পুরোপুরি সফল হল। কুরায়শ বাহিনী এবং কুরায়জার মধ্যে এতখানি সন্দেহ সংশয়ের উদ্রেক হল যে, তারা পরস্পরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বিরত থাকল পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা থেকে। [ইবনে হিশাম পৃঃ ৬৮০-১; সারাকসী, শরাহ, সিয়ার কবীর, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৪-৮৫, মুনাজ্জেদ (নতুন সংস্করণ ১,) পৃঃ ১২১-২]

তখন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কলহ-বিবাদের মাসগুলোর মধ্যে সর্বশেষ মাস শাওয়াল প্রায় শেষের দিকে। দ্রুত এগিয়ে আসে প্রভু কর্তৃক নির্ধারিত সামরিক যুদ্ধ বিরতির তিনটি মাসের মধ্যে প্রথম মাস যিলকদ। এ সময়ে মক্কাবাসীদের যুদ্ধের পরিবর্তে তীর্থযাত্রীদের আদর-আপ্যায়নের প্রতি বেশি আগ্রহ থাকে। বস্তুতপক্ষে এর মধ্যে তারা মক্কায় প্রত্যাবর্তনের কারণ ও উপলক্ষ পেয়ে যায়। পথ খুঁজে পায় প্রভু কর্তৃক নির্ধারিত যুদ্ধ বিরতির সময় সম্পর্কিত কুসংস্কার ভংগ না করার। তারা দেখল, তাদের মওজুদ খাদ্য প্রায় নিঃশেষের পথে, প্রকৃতিও ভীষণ রকম দুর্যোগপূর্ণ। প্রচণ্ড রকমের ঠাণ্ডা ও ঝড়ো হাওয়ায় তাদের সেনা শিবিরের সব তাঁবু বিনষ্ট করে ফেলেছে। এমনি পরিস্থিতিতে সেনাপতি আবু সুফিয়ান মক্কায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলো। অন্যরাও তাকে অনুসরণ করল। বলা হয়ে থাকে যে, এ সময়ে আবু সুফিয়ান ভীষণভাবে মুষড়ে পড়ে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সে বসে থাকা উটের পিঠে রীতিমত লাফ দিয়ে আরোহণ করে এবং উটটিকে দাঁড় করানোর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। অথচ একবারের জন্যেও একথা তার স্মরণে আসেনি যে, রশি দিয়ে উটের পাগুলো শক্তভাবে বাঁধা। এ সময়ে কুরায়শ বাহিনীর তাড়াহুড়ার অন্ত ছিল না। তৎসত্ত্বেও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন আবু সুফিয়ান খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এবং আমর ইবনুল আসকে নির্দেশ দিতে ভুললো না যে, মুসলিম বাহিনী পশ্চাদ্ধাবন করলে তাদের মুকাবিলা করার জন্যে তৈরি থাকবে। বলা বাহুল্য, এ সময়ে কুরায়শ বাহিনীর দুইশ অশ্বারোহীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এই দু'জন সেনানায়ক। (ইবনে সা'দ, ২/১, পৃঃ ৫০)

যুদ্ধের সমাপ্তি

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর তরফ থেকে সেই দুর্যোগপূর্ণ রাতে প্রচণ্ড রকমের ঠাণ্ডা বাতাস এবং ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে একজন বিশ্বস্ত অফিসারকে শত্রু শিবিরে পাঠালেন। বলে দিলেন যে, "শত্রু শিবিরের অবস্থা সম্পর্কে খবরাখবর নিয়ে আসবে। কিন্তু কোনক্রমেই তাদের ভীতসন্ত্রস্ত করা যাবে না।" দায়িত্বপ্রাপ্ত এই কর্মকর্তা ছিলেন হযায়ফা ইবনে আল-ইয়ামন। তিনি বলেছেন যে, এতবড় একটি গুরুদায়িত্ব পালনের জন্যে তৈরী আছে, এমন একজন সৈন্যকে এগিয়ে আসার জন্যে রাসূলে করীম (সঃ) বারংবার আহবান জানালেন। কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে কেউ-ই স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল না। অতঃপর নবীজী আমার নাম ধরে ডাকলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই আমি তাঁর এই নির্দেশ অমান্য করতে পারি নি। আমি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে শত্রু শিবিরে গেলাম। আবার ফিরেও এলাম। অথচ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে কোথাও আমার সামান্যতম অসুবিধাও হয় নি। বরং আমার মনে হয়েছে, আমি যেন উষ্ণ স্নানাগারের মধ্য দিয়ে পথ চলেছি। রশি দিয়ে শক্তভাবে পা বাঁধা উট নিয়ে সেনাপতি আবূ সুফিয়ান যে কি কাণ্ডকারখানা করেছে, আমি নিজ চোখে তা দেখেছি। আমি তাঁর এত সন্নিকটে ছিলাম যে, আমার তীর দিয়ে অনায়াসেই তাকে বধ করতে পারতাম। কিন্তু আমি তখন স্মরণ করলাম প্রিয় নবীজীর সেই নির্দেশকে—কোন কারণেই শত্রু সেনাদের ভীতসন্ত্রস্ত করা যাবে না। সুতরাং কুরায়শ বাহিনীর প্রধান সেনাপতিকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকলাম। মুসলিম শিবিরে ফিরে আসার পর আমি যা যা দেখেছি, সবকিছু রাসূলে করীম (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। (বায়হাকী, সুনান কুবরা, ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৮৩)

এমনি নিষ্ফলতা এবং অকৃতকার্যতার মধ্য দিয়ে য়াহূদী ও কুরায়শদের গভীর ষড়যন্ত্র ও ব্যাপক উদ্যোগের পরিসমাপ্তি ঘটে।

অধ্যায় ৫

মক্কা বিজয়

(২১শে রমযান, অষ্টম হিজরী, ১৪ই ডিসেম্বর, ৬২৯,
বুধবার মতান্তরে শুক্রবার)

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর রণকৌশল

রাসূলে করীম (সঃ) যেমনটি অনুমান করেছিলেন, পরিখার অবরোধের সময় (পঞ্চম হিজরী, ৬২৭ খৃঃ) বাস্তবেও তাই ঘটল। এ সময়ে কুরায়শ বাহিনীর আক্রমণ প্রস্তুতি ও আয়োজন ছিল নিখুঁত, পরিপূর্ণ এবং চূড়ান্ত। এরপর থেকে তাদের নবতর উদ্যোগ-আয়োজনের অর্গল বন্ধ হয়ে যায়। ক্রমবর্ধমান মুসলমান শক্তির মুকাবিলায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেই তাদের পরিতৃপ্ত হতে হয়। পরিবর্ধিত এই পরিস্থিতির জন্যে কেবলমাত্র বদরের যুদ্ধ এবং পরিখা অবরোধের সীমাহীন ব্যর্থতাকেই দায়ী করা চলে না। বরং এর পশ্চাতে আরো অনেক কারণ ছিল।

বস্তুতপক্ষে রাসূলে করীম (সঃ) সব সময় শত্রুকে নির্মূল বা ধ্বংস করার পরিবর্তে শত্রুকে অভিভূত ও বিপর্যস্ত করাকেই বেশি পছন্দ করতেন। এটা ছিল তাঁর একটি সাধারণ কৌশল এবং নীতি। এই উদ্দেশ্যে তিনি দ্বিবিধ পন্থা অবলম্বন করতেন। প্রথমত, তিনি কুরায়শদের উপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করতেন। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘ মেয়াদী নীতির ভিত্তিতে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজের সামরিক শক্তিকে বৃদ্ধি করতেন। তিনি শত্রুকে আঘাত করতেন উপযুক্ত সময়ে। তখন আর শত্রুরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার সাহস পেত না। এভাবেই তিনি বিনা রক্তপাতে পৌঁছে যেতেন নিজের লক্ষ্যস্থলে। শত্রুসম্পদ এবং শক্তিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতেন। এগুলোকে ভালভাবে এবং গঠন-

মূলক উপায়ে পরিচালিত করে ইসলামিক রাষ্ট্রের সংগে সংযুক্ত করতেন। এভাবেই তিনি সুসংহত করতেন ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তি ও সমৃদ্ধিকে।

মক্কা একটি অনুর্বর উপত্যকা (১৪ ঃ ১৩৭)। এখানকার অধিবাসীরা শীত ও গ্রীষ্মে মরুপথে বাণিজ্য করে জীবিকা উপার্জন করে। (১০৬ ঃ ১-৪) ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র পন্থা না হলেও এটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। মদীনায় হিজরতের পর রাসূলে করীম (সঃ) উত্তর দিকের গ্রীষ্মকালীন যে বাণিজ্য পথটি মদীনা হয়ে সিরিয়া ও মিসরের দিকে চলে গেছে তা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। বাস্তবিক পক্ষে মাত্র চার মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি এতে সফলকাম হন। রাসূলে করীম (সঃ) মদীনার পশ্চিমে এবং ইয়ানবুর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী গোত্র-গুলোর সংগে মৈত্রীর বন্ধন গড়ে তোলেন এবং মক্কার বাণিজ্য কাফেলা প্রায়শই এ পথ দিয়ে যাতায়াত করত। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে এ সময়ে সম্পাদিত অনেক চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে। ইসলাম এবং মুসলিম রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের সংগে সংগে রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রভাব বলয়ও বাড়তে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কুরায়শদের নজ্‌দ্‌ হয়ে ইরাক যাওয়ার পথটি বন্ধ করে দিতে সমর্থ হলেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৪৭) গ্রীষ্মকালে উত্তরদিকের এই অঞ্চলগুলোতে প্রায়ই তারা সফর করত। শীত মওসুমে বাণিজ্য কাফেলাগুলো প্রধানত দক্ষিণ দিকে যেত। তারা সফর করত তায়েফ হয়ে ইয়ামন ও ওমানের দিকে। স্বাভাবিকভাবেই গোড়ার দিকে এ পথটি রুদ্ধ করা খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। তবু একথা সত্য যে, তৎকালীন সময়ে মক্কার মধ্য দিয়ে ইউরোপ এবং ভারত বর্ষের মধ্যে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলত, সেটি বন্ধ করে দেওয়া হল। ইতিপূর্বে কুরায়শরা এতদঞ্চল দিয়ে বিভিন্ন বাণিজ্য কাফেলার যাতায়াতের সময় নিরাপত্তা প্রহরা প্রদানের ব্যবস্থা করত। এবার তারা বঞ্চিত হল তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য থেকে। অথচ এটা ছিল তাদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ উপার্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। এভাবে উপার্জিত অর্থে তাদের লাভ হত শতকরা একশ ভাগ। অর্থাৎ গোটা উপার্জনটাই বিবেচিত হতো লভ্যাংশ হিসাবে। এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, উত্তরাঞ্চলের বাণিজ্য থেকে তারা সরাসরি যে অর্থ রোজগার করত, এ উপার্জন ছিল তার অতিরিক্ত।

দক্ষিণ দিকের যাতায়াত পথে শত্রু পক্ষীয় লোকদের নাজেহাল করার জন্যে রাসূলে করীম (সঃ) ছোট ছোট কতগুলো বাহিনী প্রেরণ করেন। গোড়ার

দিকে এমনি একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দেন আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ (রাঃ)। তাঁরা অভিযান চালিয়েছিলেন তায়েফের নিকটবর্তী নাখলা অঞ্চলে। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪২৩-৪) তারও অল্পকাল পরে তৃতীয় হিজরীতে (৬২৪ খৃঃ) তিনি আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করেন কারাদাহ-এ। তাঁরা মক্কায় একটি বাণিজ্য কাফেলার নিকট থেকে প্রায় ১,০০,০০০ দিরহাম মূল্যের রূপা আটক করেন। (তাবারী, পৃঃ ১৩৭৫) পঞ্চম হিজরীতে (৬২৭ খৃঃ) খন্দকের যুদ্ধের পর মুসলমানদের প্রভাব বলয় নজ্‌দ্ হতে পূর্বে সুদূর ইয়ামামাহ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এই ইয়ামামাহ অঞ্চলই ছিল কুরায়শদের খাদ্যশস্য আমদানীর প্রধান কেন্দ্র স্থল। এখানকার একজন গোত্র প্রধানের নাম ছিল তুমামাহ্ ইবনে উথাল। তিনি রাসূলে করীম (সঃ)-এর নির্দেশে মক্কায় খাদ্যশস্য রপ্তানী বন্ধ করে দেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, তারই ফলশ্রুতিতে এতদঞ্চলে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটে। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৯৯৭, ইবন আবদ আল-বার, ইসতিয়াব, সংখ্যা ২৭৮) এ সময়ে অর্থাৎ ষষ্ঠ হিজরীতে (৬২৭ খৃঃ) হেযাজে অনাবৃষ্টি হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। রাসূলে করীম (সঃ) মক্কার দুস্থ লোকদের সাহায্যার্থ ৫০০ স্বর্ণ মুদ্রা প্রেরণের ঘটনাটিও সম্ভবত এ সময়ে ঘটে। অথচ তখন মক্কা ছিল শত্রু প্রভাবাধীন অঞ্চল। এই সাহায্য প্রেরণের ব্যাপারে আবু সুফিয়ান তুমুল হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয়। অভি-যোগ উত্থাপন করে যে, মক্কার যুবকদের বিপথে নিয়ে যাওয়া এবং তাদের দলে ভিড়ানোর উদ্দেশ্যেই মুহাম্মদ (সঃ) এ কাজ করেছেন। (সারাখসী, মাবসুত, দশম, ৯১-৯২)

এতসব ঘটনা প্রবাহের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, কুরায়শদের মধ্যে মিত্ররা দিনে দিনে তাদের পরিত্যাগ করতে শুরু করে। হয় তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, নয়ত রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর সংগে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং সে কারণেই ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে মক্কার চার-দিকে—উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্বাঞ্চলে মুসলিম গোত্রসমূহের আবাসভূমি দেখতে পাওয়া যায়। এর পরেই ৬ষ্ঠ হিজরীতে (৬২৮ খৃঃ) সম্পাদিত হয় হুদায়-বিয়ার সন্ধি। এর মাত্র দু'মাস পরেই সপ্তম হিজরীর মুহররম মাসে (৬২৮ খৃঃ) খায়বরের অধিবাসীরা কতগুলো শর্তাধীনে নবীজীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। এদিকে হুদায়বিয়া চুক্তির মাত্র বছর খানেক পরেই কুরায়শরা চুক্তি ভংগ করে। কিন্তু পরক্ষণেই তাদের ভুল ভাঙে এবং মর্মে মর্মে অনুতপ্ত হয়। সংগে সংগে তারা একটি প্রতিনিধি দলকে পাঠিয়ে দেয় মদীনায় এবং

হুদায়বিয়ার চুক্তি নবায়নের চেষ্টা চালায়। কিন্তু রাসূলে করীম (সঃ) কৌশলে তাদের প্রস্তাব এড়িয়ে যান। এরপর থেকে মক্কাবাসীরা একঘরে হয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে কোন রকম সাহায্য-সহযোগিতার জন্যে তারা আর কারো উপর নির্ভর করতে পারল না। এদিকে তারা মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধমূলক আক্রমণের আশংকা করতে থাকে। ফলে মক্কাবাসীদের প্রতিটি মুহূর্ত কাটতে থাকে ভীষণ রকমের ভয়ভীতি ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, খন্দকের যুদ্ধের পরের বছর রাসূলে করীম (সঃ) হুদায়বিয়ার প্রান্তরে বসে মক্কাবাসীদের সংগে দশ বছর মেয়াদী একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদনার ব্যাপারে আস্থা অর্জন এবং তাদের সম্মত করতে সমর্থন হন। কুরায়শরা যা কিছু প্রত্যাশা করল, চুক্তিপত্রে তা সবই পূরণ করা হল। এমনকি তৃতীয় কোন পক্ষের সংগে মুসলমানদের যুদ্ধ-বিবাদের সময় কুরায়শরা নিরপেক্ষ থাকার সুযোগ পেল। এভাবেই পরিতৃপ্ত হল তাদের আত্মাভিমান। মক্কার লোকেরা হয়ত জানত না যে, এ প্রক্রিয়ায় তারা খায়বরের য়াহূদীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের বিরোধিতায় তারা সাহায্য-সহযোগিতা হারাচ্ছে অন্যান্য য়াহূদী সম্প্রদায়ের। হুদায়বিয়া চুক্তির সময় সেখানে কেবলমাত্র দুটি প্রধান দলই ছিল না, উভয় পক্ষেই এমন আরও কিছু লোক ছিল যারা চুক্তির এ পক্ষের অথবা অপর পক্ষের শর্তাবলীর প্রতি ছিল ভীষণ অনুগত। অপ্রধান হলেও এরাই প্রধান দুটি দলকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে আসে। জানা যায় যে, বনু বকরের লোকেরা একবার রাসূলে করীম (সঃ) সম্পর্কে খুবই কটু ভাষায় আজেবাজে কথা বলে। তারই জের ধরে মুসলমানদের মিত্র হিসাবে পরিচিত এবং বনু বকরের প্রতিবেশী খুজা'আর লোকেরা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সম্ভবত এ সময়ে তাদের হাতে বনু বকরের কিছু লোক হতাহত হয়। প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে বনু বকরের লোকেরা রাতের আঁধারে বনু খুজা'আর উপর আক্রমণের পাঁয়তারা করে। মক্কাবাসীরাও এই আক্রমণ পরিকল্পনায় অংশ নেয়। পরবর্তী সময়ে খুজা'আদের একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে জানান যে, রাতের বেলা তারা যখন জামাতে নামায আদায় করছিলেন বনু বকরের লোকেরা তখন তাদের উপর আক্রমণ করে। অরক্ষিত অবস্থায়

থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাদের লোকজনের হতাহতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৮০৫)

ইতিমধ্যে খায়বরের য়াহূদীরা বশ্যতা স্বীকারের পর্যায়ে চলে আসে। মুসলমানদের সংগে তাদের গড়ে ওঠে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ফলে একই সময়ে উভয় ফ্রন্টে মুসলমানদের আক্রান্ত হওয়ার কোন আশংকা ছিল না। এবার রাসূলে করীম (সঃ) মক্কাবাসীদের সংগে বোঝাপড়া করার অবাধ সুযোগ পেলেন। তিনি রক্তপাতকে অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন। সে কারণেই তিনি একান্ত অপ্রত্যাশিত এবং বিপক্ষের অজ্ঞাতসারেই তাদেরকে কব্জায় আনার চেষ্টা করলেন। তিনি যে কিভাবে কি পন্থায় এই দুরূহ কাজে সফলতা অর্জন করলেন—আমরা কখনো সে বিষয়ে খুব বেশি একটা ধারণা লাভ করতে পারব না।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যেভাবে মক্কা অভিযানে ১০,০০০ সৈন্যের বাহিনী পরিচালনা করেছিলেন

একটি অভিযান পরিচালনার জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলো। কিন্তু রাসূলে করীম (সঃ) তাঁর পরিকল্পনার কথা কারো কাছে প্রকাশ করলেন না। বিষয়টি এত গোপনীয় ছিলো যে, হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মতো বিশিষ্ট সাহাবীর কাছেও বিষয়টি ছিল অজ্ঞাত। একদিন তিনি তাঁর কন্যা এবং প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ)-র কাছে গেলেন এবং এই অভিযান পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন কি না সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-ও এ বিষয়ে পিতাকে কছুই বলতে পারেন নি। (মাকরিযী, ইমতা ১; ৩৬১) ফলে স্বাভাবিকভাবেই জনগণ বিষয়টি নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনা করতে থাকে। তাঁর এই বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিলো দশ হাজার এবং তিনিই এই বিশাল বাহিনী নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। (বাইবেল, সালোমনস্ সং ৫, ১০)

সে আমলে দশ হাজার সৈন্যের এতো বড় বাহিনীর সমাবেশ খুবই অস্বাভাবিক ছিল। শত্রুপক্ষের গুপ্তচর এবং মিত্রদের অগোচরে এ বিশাল বাহিনী পরিচালনা করা ছিল একটি অসম্ভব ব্যাপার। রাতের আঁধারে আক্রমণ পরিচালনার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া মদীনা থেকে মক্কার দূরত্ব ছিল ১২ দিনের পথ।

মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি হিসাবে প্রথমেই প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মদীনা থেকে বের হওয়ার সব পথ বন্ধ করে দিলেন—বন্ধু অথবা নিরপেক্ষ কেউ মদীনার বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেল না। তাঁর তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাও ছিল ভারী চমৎকার। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, মদীনার মুসলমানদের মধ্যে হাতিব ইবনে আবী বালতাহ (রাঃ) ছিলেন সহজ-সরল একজন মানুষ। তিনি গোপনে মক্কায় একটি সংবাদ প্রেরণ করেন। চিঠিতে লিখে দেন যে, "এখানে বড়রকমের একটি অভিযানের জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। হয়ত বা মক্কাই তাদের লক্ষ্য স্থল।" কিন্তু সংবাদবাহক মদীনা শহর ছেড়ে খানিকটা দূরে যেতেই মুসলমানদের হাতে বন্দী হল। বাজেয়াপ্ত করা হলো গোপন পত্রটি। বস্তুতপক্ষে এই সংবাদবাহক ছিল একজন কৃতদাসী এবং অশিক্ষিতা। স্বাভাবিকভাবেই গোপনে প্রেরিত পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সে কিছুই জানত না। সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সে এই পত্রটি মক্কায় পেঁৗছে দিতে সম্মত হয়েছিল। রাসূলে করীম (সঃ) সংবাদ বাহককে মুক্ত করে দিলেন এবং সে সোজাসুজি মক্কা চলে গেল। কিন্তু রাসূলে করীম (সঃ) ভাবলেন, সে হয়ত মক্কায় পেঁৗছে তার এই অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সকলের কাছে খুলে বলবে এবং মক্কাবাসীদের অপরাধী প্রবণ অন্তরে হয়ত বা জন্ম নেবে কতগুলো অনুমান এবং সন্দেহের। সেখান থেকেই হয়ত তারা পেয়ে যাবে এই অভিযান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো ইংগিত। সুতরাং অভিযানের গতিপথের খানিকটা পরিবর্তন জরুরী হয়ে পড়ে। তাই দেখা যায় যে, রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) যখন মক্কা আক্রমণের ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন তিনি আবু কাতাদাহ (রাঃ)-কে একটি বাহিনীসহ মদীনার উত্তরে তিন দিনের দূরত্ব 'ইডামের' দিকে পাঠিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এই ঘটনা থেকে হয়ত অনেকে ধারণা করবে যে, রাসূলে করীম (সঃ) নিশ্চয়ই উত্তর দিকে কোথাও অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তদনুসারে একটি গুজবও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুত পক্ষে কাতাদাহ-এর নেতৃত্বাধীন এই অভিযানটি পারি-পার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রাথমিক নিরীক্ষার জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল।

রাসূলে করীম (সঃ) মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন। তিনি কেবল-মাত্র লক্ষ্যস্থলকেই গোপন রাখলেন না, বরং তাঁর বাহিনীর শক্তি ও সৈন্য সংখ্যাও গোপন রাখলেন। ঐতিহাসিক আল-ইয়াকুবী উল্লেখ করেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীকে মদীনায় সমবেত হতে বারণ করলেন। বরং মক্কা যাওয়ার পথে যখন তাদের স্ব স্ব গোত্রের

বসতিগুলো অতিক্রম করবেন তখন তাদের প্রিয়নবী (সঃ)-এর সংগে এসে যোগ দিতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর এই কৌশল এতোটা সফল হলো যে, পাহাড় ঘেরা মক্কার অপর প্রান্তে শিবির স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম বাহিনীর উপস্থিতি সম্পর্কে কুরায়শরা আদৌ টের পেলো না। কুরায়শদের আরো বেশি করে হকচকিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রিয়নবী (সঃ) প্রত্যেক মুসলিম সৈন্যকে আগুন জ্বালানোর নির্দেশ দিলেন। রাতের বেলা দশ হাজার অগ্নিশিখা দেখে প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে বহুগুণ বেশি সংখ্যক লোক তাদের খাদ্য-খাবার তৈরী করছে বলে মনে হলো। সময়োচিত আয়োজন এবং নবীজীর দূরদর্শিতা মুসলিম বাহিনীর অনেকখানি উপকারে এল। সে রাতেই মক্কার প্রধান সেনানায়ক আবূ সুফিয়ান মুসলমান গুপ্তচরদের হাতে ধরা পড়ে। ফলে মক্কার লোকেরা তাদের করণীয় কাজ সম্পর্কে কিছু বুঝে উঠতে পারলো না। পরদিন ভোরে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মক্কার দিকে যাত্রা শুরু করলেন। মুক্ত করে দিলেন মক্কার সর্বাধিনায়ক আবূ সুফিয়ানকে। তাকে বলে দেওয়া হল যে, সে মক্কাবাসীদেরকে এব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারে যে, যারা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকবে অথবা যারা তাদের অস্ত্র সমর্পণ করবে অথবা যারা পবিত্র কাবা ঘরের চত্বরে আশ্রয় নেবে অথবা আবূ সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে, তারা নিরাপদে থাকবে। তাদের প্রতি কোন রকম আঘাত করা হবে না।

কারো গৃহকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে ঘোষণা দেয়াটা অবশ্যই বড় রকমের একটি সম্মানের ব্যাপার। সম্ভবত আবূ সুফিয়ান এই সম্মান প্রাপ্তির যোগ্য ছিলেন। খ্যাতনামা লেখক সাবিত আল-বুনানী এ ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত করেছেন যে, ইসলামের গোড়ার দিকে মক্কার সাধারণ লোকেরা এবং ছোট ছোট ছেলেরা যখন রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-কে উত্ত্যক্ত করত, তখন তিনি আবূ সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নিতেন। অতিথিকে বিপদমুক্ত রাখার মত সাহস ও রুচি আবূ সুফিয়ানের ছিল। (ইবনে আল-জাওজী, আল-মুজতবা, পাণ্ডুলিপি কায়রো, পৃঃ ৮৩) রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) তা ভুলে যাননি এবং আবূ সুফিয়ানের গৃহকে নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে ঘোষণা দেয়াটা ছিল অতীতের সেই কৃতকর্মেরই পুরস্কার।

বস্তুত পক্ষে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যখন মক্কায় অভিযান চালান, তখন মক্কায় কোন অভিজ্ঞ ও প্রভাবশালী নেতা ছিল না। আবূ জহল মৃত্যুবরণ

করেছে, খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং আমর ইবনুল আস ইসলাম ধর্ম কবুল করেছেন এবং আবু সুফিয়ান হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। (ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, সে মুসলমানদের হাতে ধরা পড়েছিল) তাদের কোন মিত্র থাকলেও সাহায্য-সহযোগিতার জন্যে তাদের আহবান করার মত সময় ছিল না। এতে সন্দেহ নেই যে, ইকরামার (আবু জহলের পুত্র) মত কনিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ তাদের গোত্রের লোকজনদের সহযোগিতায় কিছু প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। তেজো-দৃপ্ত মুসলিম অধিনায়ক খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বাধীন একটি দলের সংগে তাদের খণ্ডযুদ্ধ ও সংঘর্ষ বাঁধে। তবে আবু সুফিয়ান মক্কাবাসীদের জন্যে আশ্বাসবাণী নিয়ে আসে এবং ব্যবস্থাসমূহ অনুমোদন করে, মক্কার সাধারণ লোকেরা সেগুলোতেই আস্থা রাখে। এভাবেই তারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং রক্ত-পাতহীনভাবে মক্কা বিজয়ের পথকে সুগম করে দেয়।

এমনকি আবু সুফিয়ান যদি মক্কাবাসীদের সংগঠিত করার চেষ্টা করত, উদ্যোগ নিত মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধ করার—বিলম্বজনিত কারণে সেটাও তার পক্ষে সম্ভব হত না। কারণ রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) যখন আবু সুফিয়ানকে মুসলিম শিবির পরিত্যাগের অনুমতি দেন, তখন প্রকৃত অর্থেই মুসলিম বাহিনী মক্কার উদ্দেশে বেরিয়ে গেছেন, যথার্থভাবেই দখল করে নিয়েছেন শহরে প্রবেশের সবগুলো পথ। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৮১৪) পরিস্থিতি এমন ছিল যে, মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা এবং তাদের সংগঠিত করার প্রশ্নই উঠে না। মক্কাবাসীদের কোন মিত্র থাকলেও তাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করা ও সময়মত সাহায্য পাওয়া ছিলো একটি অসম্ভব ব্যাপার। আবু সুফিয়ান ছিলো মক্কাবাসীদের একজন অতি বিশ্বাসী নেতা। সে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করত যে, এ মুহূর্তে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার এবং এটা হবে একটি অর্থহীন প্রয়াস। স্ত্রীর সংগে তার কথোপকথনের যে বিবরণ ঐতিহাসিকগণ সংরক্ষণ করেছেন, তা থেকেই এর স্বাক্ষর মেলে।

মক্কাবাসীদের মধ্যে তখন বিরাজ করছিলো চরম অস্বস্তি, অস্থিরতা ও মানসিক চাপ। ঠিক সেই মুহূর্তে মুসলিম বাহিনীর অপ্রতিরোধ্য শক্তির পাশাপাশি অবিশ্বাস্য রকমের সাধারণ ক্ষমা সংক্রান্ত ঘোষণার অপূর্ব সমন্বয় তাদের কাছে খুবই বড় হয়ে দেখা দিল। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের দীর্ঘদিনের লালিত সমস্ত আক্রোশ-ঘৃণা নিক্ষিপ্ত হল একটি দ্রবণ পাত্রে। ঘটনার ধারা-বাহিকতায় তাদের রূপান্তরের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনা

সুউচ্চ পাহাড় দ্বারা চারপাশ ঘেরা একটি উপত্যকায় মক্কা অবস্থিত। একটি মাত্র বড় সড়ক শহরের মধ্য দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে আড়াআড়িভাবে চলে গেছে। দুটি উপ-সড়ক এই প্রধান সড়কের সংগে মিলিত হয়েছে। উপ-সড়ক দুটির একটির নাম হাজুন সড়ক অপরটিকে বলে কাদা সড়ক।

মুসলিম বাহিনীর প্রধান দলটি প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে সংগে নিয়ে বড় সড়কের উত্তর দিক থেকে অগ্রসর হয়। শহরের প্রধান অংশ এখানেই অবস্থিত। মক্কাবাসীরা যাতে ওয়াদি ফাতিমা হয়ে সমুদ্র উপকূল ধরে পালিয়ে যেতে না পারে, সেজন্যে একটি দল অগ্রসর হয় কাদা সড়ক দিয়ে। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন যুবায়ের ইবনে আল-আওয়াম। শক্তিশালী আরেকটি বাহিনী 'লিত' হয়ে দক্ষিণ দিকে শহরের মধ্যে প্রবেশ করে। তাঁরা দখল করে নেয় 'মাসফালাহ' নামে পরিচিত শহরের অপ্রধান অংশ। সম্ভবত এটা ছিল মুসলিম বাহিনীর অশ্বারোহী দল। অনেকখানি পথ ঘুরে এলেও তারা অন্যান্য দলের সংগে একই সময়ে শহরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এ ধারণাটিকে এ কারণে সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় যে, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং তিনি ছিলেন অশ্বারোহী দলের অধিনায়ক। মুসলিম বাহিনীর আরেকটি দল হাজুন সড়ক দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। তারা মক্কাবাসীদের ইয়ামেন ও জেদ্দা পালিয়ে যাওয়া পথটি বন্ধ করে দেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৮১৬-৮১৭, তাবারী ১, ১৬৩৫)

অন্যান্য প্রতিটি যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ যেমন একটি সংকেত ধ্বনি ব্যবহার করে থাকেন, এ সময়েও তাঁদের একটি সংকেত শব্দ ছিলো। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৮১৮)

মুসলিম বাহিনীর সৈন্যদেরকে খুবই যত্নের সংগে এবং যথাসম্ভব নির্ভুল-ভাবে বিন্যস্ত করা হল। একজন বিশেষ কর্মকর্তা বা অধিনায়ক এতদ-সংক্রান্ত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখলেন। তার মাধ্যমে রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী বাস্তবায়িত করলেন। মক্কার সুউচ্চ পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মুসলিম বাহিনীর প্রয়োজনীয় অবস্থাকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করা গেছে তার একটি বর্ণনামূলক বিবরণ তুলে ধরেছেন ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম।

মক্কা অভিযানের সময় হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর পিতা আবূ কুহাফা মক্কায় বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। যখন তিনি একটি বৈদেশিক শক্তির দ্বারা মক্কা আক্রমণের খবর শুনতে পেলেন, তখন তিনি তার নাতনীর হাত ধরে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থানে এসে হাযির হলেন। নাতনীকে বললেন, তুমি যা যা দেখছ আমার কাছে তাই বিবৃত কর। ছোট্ট মেয়েটি মনোযোগের সংগে সব কিছু দেখল। এমনকি ওয়াজি বা বিশেষ কমকর্তার সৈন্যদের বিন্যস্ত করার কলাকৌশলসহ খুঁটিনাটি অনেক কিছুই তার নজরে পড়ল। অবশেষে সে যখন সৈন্যদের অগ্রসর হওয়ার কৌশল সম্পর্কে বর্ণনা করল, আবূ কুহাফা তখন বললেন—তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে চল। কারণ এভাবে অগ্রসরমান একটি বাহিনীর হাতে ধরা পড়াটা খুবই বিপজ্জনক।

বিভিন্ন দলে যা কিছু ঘটে সে সম্পর্কে সর্বাধিনায়ক হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে অবহিত করার চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। যদি তিনি কোন ব্যাপারে কোনরকম হস্তক্ষেপ বা নির্দেশ প্রদান জরুরী মনে করতেন, তখনি তিনি তদনুসারে ব্যবস্থা নিতেন। মক্কা বিজয়ের শেষের দিকে একবার একজন কর্ম-কর্তা তাঁর অধীনস্থ লোকজনকে বললেন—ঐদিনে (মক্কা বিজয়ের দিনে) মক্কার গৌরব ভূলুণ্ঠিত হবে, লুণ্ঠিত হবে গোটা শহর। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) একথা শোনার সংগে সংগে সেই কর্মকর্তাকে তার অধিনায়কত্ব থেকে বরখাস্ত করলেন। (তাবারী, ১, ১৬৩৬) তিনি এ দায়িত্ব অর্পণ করলেন আরেকজনের উপর। তিনি বলেন যে—"না, আজ মক্কার গৌরব ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে, এর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্যকে কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ করা হবে না। কারণ ইসলাম ধর্মের কিবলা এখানে অবস্থিত।" অতঃপর শহরের সর্বত্র পূর্ণ শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করার কথা জানিয়ে একটি ইশতিহার জারি করলেন।

মক্কা অভিযানের সময় স্বাভাবিক বিভাজনের ভিত্তিতেই বিভিন্ন দল গঠিত হয়েছিলো, বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন দলে বিন্যাসিত হয়েছিলো। যদিও মক্কার মুহাজির, মদীনার আনসার, আসলাম, গিফার প্রভৃতি গোত্র পৃথক পৃথক দল গঠন করেছিলো। কিন্তু বিভিন্ন দলের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয় ছিলো খুবই উন্নত। একটি মেশিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ যেভাবে কাজ করে, তারাও কাজ করেছিলেন তেমনি একযোগে, এক সংগে। এভাবে সেনাবাহিনীকে বিন্যস্ত করার একটি বাড়তি সুবিধাও ছিল এবং তা হল মনস্তাত্ত্বিক। সে আমলের সাধারণ মানুষেরা দল এবং বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দ্বারা যতখানি

প্রভাবিত হতো, তার চেয়ে বেশি প্রভাবিত হত গোত্রসমূহের নাম দ্বারা। মক্কা অভিযানে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম আরবের গোত্রসমূহের প্রতিনিধিত্ব ছিল। মক্কা-বাসীদের মধ্যে এর ব্যাপক প্রভাব পড়ল।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মক্কায় প্রবেশ

নবী করীম (সঃ) স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হন। স্বদেশ বাসীদের দ্বারা শারীরিক এবং মানসিকভাবে নির্যাতিত হন দীর্ঘ আটটি বছর। এবার তিনি নিজের জন্মস্থানে প্রত্যাবর্তন করছেন বিজয়ীর বেশে। তিনি মক্কায় প্রবেশ করেছেন বিজয়ী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে। কিন্তু তখন তার আচার-আচরণ কেমন ছিল? তিনি কি মক্কায় এসেছিলেন একজন স্বেচ্ছা-চারী শাসক ও উৎপীড়ক হিসাবে? অথবা তিনি কি মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যিনি সবকিছুর স্রষ্টা তাঁকে ভুলে গিয়ে আত্মতৃপ্তির উল্লাস এবং পূর্ণ ঔদ্ধত্য সহকারে? না, তিনি ছিলেন এ সব কিছুর অনেক অনেক উর্ধ্বে। ঐতিহাসিক ইবনে হিশামের ভাষায় (পৃঃ ৮১৫) তিনি মক্কা শহরে প্রবেশ করেছিলেন পূর্ণ সংযম, নম্রতা এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে। তিনি যে উটে চড়েছিলেন, সেটার পৃষ্ঠদেশে বসেই বার বার এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্র সামনে মস্তক অবনত করছিলেন, তিনি যা কিছু প্রদান করেছেন—সেজন্যে জ্ঞাপন করছিলেন শুকরিয়া। তিনি সকলের জন্যে ঘোষণা দিয়েছিলেন সাধারণ ক্ষমা এবং পরিপূর্ণ শান্তি সম্পর্কে। অতীতের বস্তুগত ও মানসিক ক্লেশ ও উৎপীড়নের জন্যে প্রতিশোধ গ্রহণের বিন্দুমাত্র চিন্তাও তাঁর মধ্যে ছিল না। বস্তুত পক্ষে একজন মু'মিন মুসলমানের নিকট থেকে আল্লাহ্ পাকের যা প্রত্যাশা—তাই প্রদর্শিত হচ্ছিল তাঁর আচরণের মধ্য দিয়ে। এ প্রসংগে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন যে—এই জনপদে প্রবেশ কর, যথা ও যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, নতশিরে প্রবেশ কর দ্বার দিয়ে এবং বল, ক্ষমা চাই। (২ঃ ৫৮) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু জাফর তাবারী (রঃ) স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, সামরিক আচার-আচরণ সম্পর্কিত এই ঐশী বিধানের প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)-এর আমলের য়াহূদী সম্প্রদায়। কিন্তু কথায় এবং কর্মে যারা বিশ্বাসী, তাদের নিকট হতে যে ধরনের আচার-আচরণ প্রত্যাশা করা যায়, আমালিকদের সংগে বিবাদের সময় য়াহূদীরা তা থেকে অনেক দূর সরে আসে। (তাফসীরে তাবারী, ১, ৫৩২-৫৩৩)।

মক্কা বিজয়ের

মানচিত্র
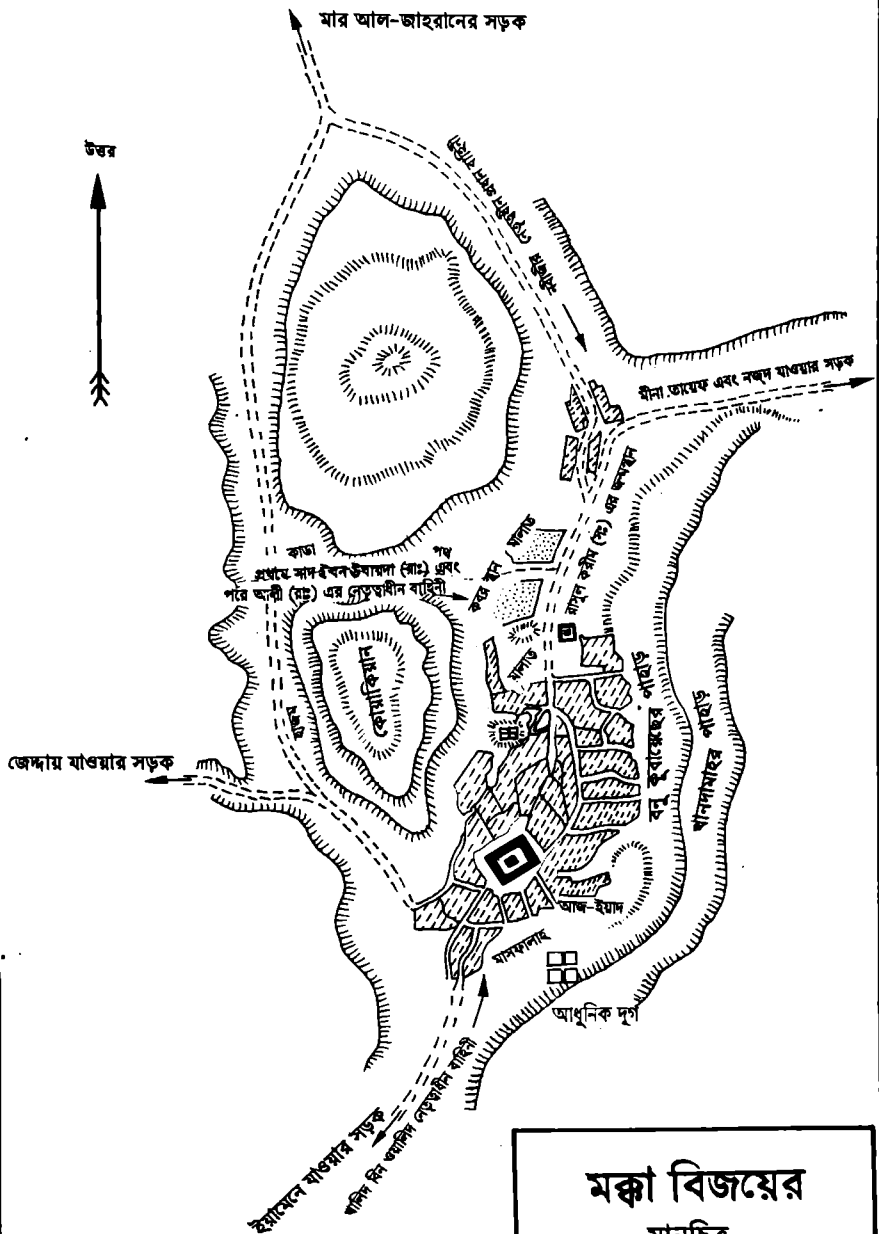
রাসূলে করীম (সঃ) ছিলেন যুদ্ধের নবী। তাঁর জন্যে এটা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিলো যে, তিনি যুদ্ধের ময়দানে গিয়েও দয়ার নবীর আদর্শ প্রদর্শন করবেন। হাদীস শরীফেও উল্লেখ আছে যে, তিনি বলেছিলেনঃ আমি রক্তাক্ত লড়াইয়ের নবী এবং দয়ার নবী। কুরআন মজীদে সূরা ফাতহ-এর ২৪নং আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ আছে। মক্কা বিজয়ের পর ভীষণ রকমের জেদী বেশ কিছু সংখ্যক মক্কাবাসী মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে শহরের অভ্যন্তরভাগেই বড় রকমের একটি ফন্দি আঁটে। তাঁরা মুসলমানদের আক্রমণের পাঁয়তারা চালায়। আল্লাহ্ তা'আলা যে কিভাবে মক্কাবাসীদের নির্দয়-নিষ্ঠুর হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করেন—সে বিষয়ে তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বস্তুতপক্ষে এ সময়েও দয়ার নবী পাপিষ্টদেরকে ক্ষমা করে দিলেন।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

মক্কা বিজয়ের পর পরই মানুষের তৈরী দেবতাগুলোকে স্বাভাবিক নিয়মেই বিনষ্ট করা হলো। বিশেষ করে আবু সুফিয়ানের ঘরের অবস্থা ছিলো খুবই করুণ ও মর্মস্পর্শী। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা ছিল একেবারেই ভয়লেশহীন। গৃহে সযত্নে রক্ষিত পুতুলগুলোকে সে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকে এবং ভেংগে টুকরো টুকরো করে ফেলে। বার বার সে চিৎকার করে বলতে থাকে, আমরা তোমাদের নিয়ে কত গর্বিত ছিলাম। অথচ তোমাদের প্রতি বিশ্বাস রেখে আমরা কত প্রতারিত হয়েছি। অবশেষে শহরের অন্য মহিলাদের সংগে হিন্দাও ইসলাম কবুল করার জন্যে প্রিয়নবী (সঃ)-এর দরবারে গিয়ে হাযির হয়। তখন তার আপাদমস্তক ছিল কাপড় দিয়ে ঢাকা। প্রিয়নবী (সঃ)-এর সংগে তার কথোপকথনগুলো ছিল খুবই আকর্ষণীয়।

তুমি কি তোমার সন্তানদের কতল না করার ওয়াদা করেছো?

আমি তো আমার সন্তান হিসাবে অতি যত্নে লালন পালন করেছি। কিন্তু আপনি তাদের বদরের যুদ্ধে কতল করেছেন।

তুমি কি ব্যভিচার এবং অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে ওয়াদা করেছ?

যে রমণী স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে সে কী কখনো এমনটি করতে পারে?

তুমি কি চুরি না করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করেছ?

এবার হিন্দা ভীষণ রকম অভিভূত হয়ে পড়ে। সে অন্তর্স্থল থেকে অনুভব করতে পারে যে, ইসলাম কোন রাজনৈতিক শ্লোগান নয়, বরং ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। সে বলে উঠে—হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! চুরি করা সত্যই খারাপ, একটি অমার্জনীয় অপরাধ। তবু আপনি একবার ভেবে দেখুন, আমার স্বামী ভীষণ রকমের কৃপণ। সংসার পরিচালনা এবং নানাবিধ ব্যয়ভার বহন করার জন্যে মাঝেমধ্যে আমি স্বামীর কাছ থেকে অর্থ চুরি করেছি। হিন্দার কথায় রাসূলে করীম (সঃ) মৃদু হেসে বললেন, ঠিক আছে। এতটুকুতে কোন বাধা-নিষেধ নেই। (তারীখে তাবারী ১/১৬৪৩-৪৪; সুহাইলি ২/২৭৭)

বিজিত শহরের প্রতি প্রিয়নবী (সঃ)-এর সর্বশেষ আচরণের উল্লেখ করে এ অধ্যায়ের সমাপ্তি টানা যেতে পারে। যেদিন মক্কা অধিকৃত হল তার পরের দিনের কথা। শহরের সর্বত্র বিরাজ করছে পরিপূর্ণ শান্তি ও শৃংখলা। রাসূলে করীম (সঃ) জুমার নামাযের ইমামতি করলেন। সেদিন মক্কার অনেক পুতুল পূজারীও কৌতূহল বশে নামাযে অংশ নিল। নামায শেষে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পবিত্র কাবাঘরের চত্বরে সমবেত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। মক্কাবাসীরা তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি যা কিছু করেছে তিনি সে বিষয়ে তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি আরো স্মরণ করিয়ে দিলেন তাদের অন্যান্য অবৈধ অপকর্ম সম্পর্কে। অবশেষে তিনি বললেন, আজকের দিনে তোমরা আমার নিকট থেকে কেমন আচরণ প্রত্যাশা কর? অল্প সময়ের জন্যে বিরতি দিয়ে তিনি আবার বললেন ঃ

"আজকের দিনে তোমাদের উপর আর কোন দায়-দায়িত্ব নেই। যাও, তোমরা মুক্ত, তোমরা স্বাধীন।" (তাবারী ১/১৬৪২)

অল্প সময়ের মধ্যে মক্কা নতুন রূপ ধারণ করল। বস্তুতপক্ষে রাতারাতি সমগ্র মানুষ ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ল। অন্য কিছুই তাদের অন্তরকে এত ব্যাপক ও আন্তরিকভাবে জয় করতে পারত না। তারা ছিল একটি পরাভূত ও বিজিত দেশের অধিবাসী। কিন্তু দায়-দায়িত্ব ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির বেলায় তারা ছিল বিজয়ীদের সমান অংশীদার। আল্লাহ্‌র নবী যেখানে একটি দেশের বিজয়ী বীর, সেখানে তাঁর নিকট থেকে এর চেয়ে কম মহিমান্বিত এবং মর্যাদাপূর্ণ কিছু কি আশা করা যায়? ছোট একটি ঘটনার উদ্ধৃতির মধ্য দিয়েই এই নীতির আলোকপাত করা যেতে পারে। রাসূলে করীম (সঃ) খুতবা আরম্ভ করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মুয়াজ্জিন হযরত বিলাল (রাঃ) পবিত্র কাবা ঘরের ছাদে

আরোহণ করলেন। নামাযের জন্যে সেখান থেকে উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ তুললেন আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর।

আত্তাব ইবনে আসিদ নামের মক্কার এক পৌত্তলিকও জামা'আতে উপস্থিত ছিল। পাশে বসে থাকা একজন সংগীকে সে কানে কানে ফিসফিস করে বলল, "দেবতাকে ধন্যবাদ। আজ আমার পিতা জীবিত নেই। নইলে তাকেও পবিত্র কাবার চূড়া থেকে ভেসে আসা এই গর্দভ নিগ্রোর চিৎকার শুনতে হতো। কোন ক্রমেই তার পক্ষে এটা সহ্য ও সমর্থন করা সম্ভব হতো না।"

এই কথাগুলো বলার মিনিট কয়েক পরেই আত্তাব ইবনে আসিদ স্পষ্ট শুনতে পেলো সাধারণ ক্ষমা সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-র ঘোষণা। কথাগুলো শুনতেই আত্তাব ভীষণভাবে অভিভূত হয়ে পড়লো। সে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এগিয়ে গেলো সামনের দিকে। প্রিয়নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বলল, 'আমি আসিদের পুত্র আত্তাব। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই এবং আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল।'

নবী করীম (সঃ) বললেন, ঠিক আছে। আমি তোমাকে মক্কার গভর্নর হিসাবে নিয়োগ করলাম। একথা সবারই ভালভাবে জানা আছে যে, মক্কা বিজয়ের পর পরই তিনি মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর বাহিনীর একটি সৈন্যকেও মক্কা প্রহরার জন্যে রেখে এলেন না। অথচ তিনি মক্কা নগরীকে শাসন করার দায়িত্ব দিয়ে এলেন সদ্য ইসলাম কবূল করেছে এমন একজন মক্কাবাসীর হাতে। এ নিয়ে পরবর্তীতে কখনো তাঁকে দুঃখবোধ করতে হয়নি। বস্তুতপক্ষে এভাবেই মানুষের হৃদয় জয় করা যায়।

অধ্যায় ৬

হুনায়ন ও তায়েফের যুদ্ধ

(শাওয়াল ৮ম হিজরী/ডিসেম্বর ৬২৯)

হুনায়নের অবস্থান

এটা খুবই কৌতূহলের বিষয় যে, ইসলামের সেই প্রথম যামানাতেই হুনায়নের মত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রসিদ্ধ এই যুদ্ধক্ষেত্রের কথা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। অথচ কুরআনুল করীমের বর্ণনায়ও হুনায়নের বিবরণ স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। খ্যাতনামা ভূগোলবিদ এবং ঐতিহাসিকগণও হুনায়নের সঠিক স্থান নির্ধারণ করতে পারেননি। মাকরিজী (ইমতা) এবং আরো কয়েক-জন ঐতিহাসিকের মতে মক্কা থেকে ১ দিনের সফরের মাথায় হুনায়ন অবস্থিত। সে হিসাবে মক্কা থেকে হুনায়নের দূরত্ব প্রায় ১৫ মাইল। কারো কারো মতে মক্কা থেকে হুনায়নের দূরত্ব চারদিনের সফরের সমান। হুনায়ন অভিযানের সময় রাসূলে করীম (সঃ) মক্কায় অবস্থান করছিলেন। এখানে বসেই তিনি হুনায়ন অভিযানের আয়োজন এবং একে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। আবার কোন কোন ঐতি-হাসিক উল্লেখিত দুটি দূরত্বের মাঝামাঝি কোথাও হুনায়নের অবস্থানের কথা জানিয়েছেন।

হুনায়নের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত কারণ অনুসন্ধান করতে খুব বেশি দূর যেতে হবে না। হুনায়ন ছিল একটি জনবিরল এলাকা, এখানে লোকবসতি ছিল খুবই কম। এই অঞ্চল দিয়েই রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) এগিয়ে যাচ্ছিলেন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হাওয়াজিনদের মোকাবিলা করা। একদিন সাত সকালে মুসলিম বাহিনী যখন সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্যদিয়ে

নখলা
জাইরানাহ
মক্কা
কিরন
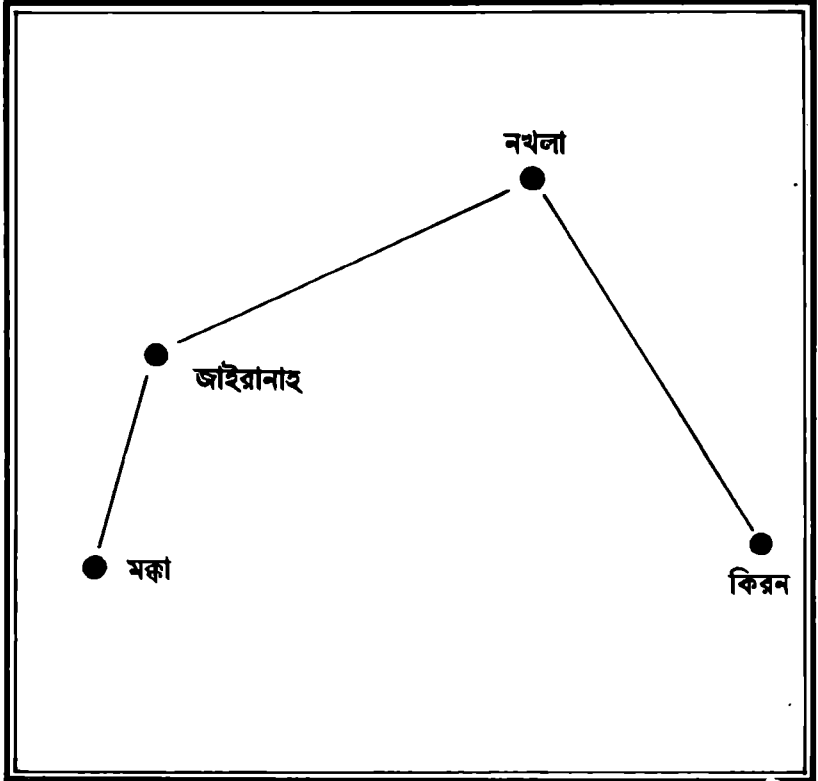
অতিক্রম করছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে একান্ত অপ্রত্যাশিত এবং অতর্কিতভাবে শত্রু সেনারা তাদের উপর হামলা চালায়। আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা-টির পূর্ব পর্যন্ত কোন দিক থেকেই হুনায়নের কোন গুরুত্ব ছিল না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হুনায়ন ছিল একটি নির্জন এলাকা। এখানে না ছিল পানি, না ছিল কোন চারণভূমি। ফলে এলাকাটির প্রতি ভাসমান বেদুঈনদেরও কোন আকর্ষণ ছিল না।

বিগত কয়েক বছর যাবত বিভিন্ন পণ্ডিত এই স্থানটি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন মরহুম শাকিব আরসালান, বা-সালামাহ্ এবং আরো অনেকে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, তাঁরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাদের অভিমত ও সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কোন সম্ভাবনা নেই। এসব পণ্ডিত সাধারণত মক্কা থেকে তায়েফ যাওয়ার প্রধান সড়ক পথে হুনায়নকে অনুসন্ধান করেছেন। এ বিষয়টিকে তাঁরা কখনো বিবেচনায় আনেননি যে, এটা ছিল মূলত একটি সামরিক অভিযান এবং শত্রু সেনারা যাতে তার আক্রমণ পরিকল্পনা সম্পর্কে আগেভাগে সতর্ক হওয়ার সুযোগ না পায় সেজন্যে নবীজী কখনো প্রচলিত পথ ধরে অগ্রসর হননি। বস্তুতপক্ষে এটা ছিল রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর একটি সাধারণ সমর কৌশল।

একাজের জন্যে বা-সালামাহ্ ছিলেন সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি। তিনি ছিলেন এ মাটিরই সন্তান (সউদী পার্লামেন্টের একজন সদস্য)। তিনি চার খণ্ডে রাসূলে করীম (সঃ)-এর একটি বৃহৎ জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর অবস্থা ছিল একজন পর্যটকের মত। এলাকাটি সম্পর্কেও ছিল তাঁর ব্যাপক চেনাজানা। তিনি লিখেছেন যে, এই ঐতিহাসিক স্থানটি অনুসন্ধান এবং আবিষ্কারের কাজে প্রচুর সময় কাটিয়েছেন। মক্কা থেকে সড়ক পথে নজ্‌দে যাওয়ার সময় প্রায় ১৫ মাইল দূরের একটি স্থানকে তিনি হুনায়ন বলে শনাক্ত করেছেন।

অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে আমিও সেই সড়ক পথে সফর করেছি। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমি সেখানে এমন কোন স্থানের সন্ধান পাইনি, যেখানে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ১২,০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনীর উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালানোর জন্যে শত্রু সেনারা ওঁৎ পেতে বসে থাকতে পারে। এই পরীক্ষার কাজটি চালানোর সময় ঘটনাক্রমে আমি যুলমাজাজের ঐতি-হাসিক কুয়ার কাছে চলে আসি। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এখানে বড়সড়

একটি বাৎসরিক মেলা বসত। কুরায়শ গোত্রের একটি যাযাবর দল এখানে বসবাস করে। এখানকার মেয়েরা অপূর্ব চিত্রের এবং সুরুচিসম্পন্ন নানা ধরনের পোশাক পরিধান করে। দেশের অন্য কোন যাযাবর মেয়েদের গায়ে এ ধরনের পোশাক পরিলক্ষিত হয় না। কোন প্রকার হিংসা বা ঈর্ষা ছাড়াই তারা একান্ত উদারভাবে আমাদের গাড়ির জন্যে পানি সরবরাহ করেছে। এই কুয়াটি মূলত আরাফাত থেকে উত্তরের শহর নজ্‌দে যাওয়ার বর্তমান মোটর সড়কের উপর অবস্থিত। অবশ্য মরুযাত্রীরা এ পথ দিয়ে বড় একটা যাতায়াত করে না। ১৯৩২ ও ১৯৩৯ সালের দিকে হিজাজ অঞ্চলে আমার প্রথম সফরকালে আমি হুনায়নকে শনাক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। একবার আমি গাধার পিঠে চড়ে কারা পর্বত হয়ে তায়েফ পর্যন্ত ৭০ মাইল সফর করেছি। যাত্রাপথে হুনায়ন, আওতাশ এবং হুনায়ন-এর যুদ্ধ প্রসংগে ইতিহাসে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ আবিষ্কার করাই ছিল এই সফরের উদ্দেশ্য। ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে আমার সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে। বাধ্য হয়ে বিষয়টি আমি আগামীদিনের গবেষকগণের উপর ছেড়ে দিয়েছি। আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে, তাঁরা এই উদ্যোগে আমার চেয়ে অধিকতর সফলকাম হবেন।

সম্ভবত তায়েফ শহরের ৩০ থেকে ৪০ মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে হুনায়ন অবস্থিত

সুলতান দ্বিতীয় আবদ আল হামিদের সময়ে হিজাজের রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ একটি মানচিত্র তৈরী করে। এই মানচিত্রের উপর একটি সাধারণ মন্তব্য করা যেতে পারে। খুব বেশি একটা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও এ মানচিত্রে একটি স্থানকে আওতাশ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই স্থানটি তায়েফ শহর থেকে উত্তর-পূর্ব কোণে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। আমার পক্ষে এ অঞ্চলটি সফর করা সম্ভব হয়নি। তবে আমার ধারণা মতে, সম্ভাব্য সকল স্থানের মধ্যে হুনায়নকে এতদঞ্চলে অনুসন্ধান করাই অধিকতর যুক্তিসংগত। নিম্নোক্ত কারণগুলোর জন্যে আমার মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

পূর্বেই এ ব্যাপারে মন্তব্য করা হয়েছে এবং প্রাচীনকালের প্রথিতযশা ঐতিহাসিকগণও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, (ইবনে হিশাম পৃঃ ৮৯৪ এবং অন্যরা) যেকোন অভিযানেই রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) বাহ্যত এমন পথ দিয়ে অগ্রসর হতেন যে, শত্রুসেনারা অনায়াসেই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যেত।

একটি মাত্র ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। তাবুক অভিযানের সময় যে কোন অভিযানেই তিনি সাধারণত অনেকখানি পথ ঘুরে আসতেন। বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করার পর হঠাৎ করেই তিনি লক্ষ্যস্থলের দিকে মোড় নিতেন। অবশ্য সেক্ষেত্রেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তিনি সব সময় বহুল ব্যবহৃত পথকে পরিহার করে চলতেন। তিনি অগ্রসর হতেন এমন সব পথ দিয়ে, যে পথে শত্রুরা খুব সামান্যই সন্দেহের অবকাশ পায়।

মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পরেই প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জানতে পারলেন যে, হাওয়াজিনের গোত্রসমূহ ইসলামী সাম্রাজ্য আক্রমণের ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে (প্রসংগত উল্লেখ্য যে, প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে তায়েফ শহরের উত্তর-পূর্ব কোণে বেশ খানিকটা দূরে এখনো হাওয়াজিনের যাযাবরেরা বসবাস করে থাকে)। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সংগে সংগে একজন গোয়েন্দা অফিসারকে পাঠিয়ে দিলেন হাওয়াজিনে। ছদ্মবেশে তিনি সেখানে কাটিয়ে দিলেন বেশ কয়েকটা দিন। অবশেষে ফিরে এলেন হাওয়াজিনদের অত্যাসন্ন আক্রমণ প্রস্তুতির সংবাদ নিয়ে। তারই প্রেক্ষিতে রাসূলে করীম (সঃ) দুশমনদের মাটিতে দুশমনদের মোকাবিলা করার জন্যে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

বলা হয়ে থাকে যে, মক্কা থেকে হুনায়নের দূরত্ব একদিনের সফরের সমান। আসলে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ শত্রু সেনারা মক্কার এত সন্নিকটে উপস্থিত হলো, অথচ মুসলমান গোয়েন্দা বাহিনী সে বিষয়ে কিছু জানতে পারেনি। এমন বক্তব্যকে খুব বেশি একটা সমর্থন করা যায় না। এমনকি মক্কা থেকে হুনায়ন চার দিনের পথ বলে যে মতবাদ রয়েছে তাও গ্রহণ-যোগ্য নয়। কারণ বিবদমান পক্ষের মধ্যে হুনায়নের যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল মাঝামাঝি স্থানে। তাছাড়া উটের পিঠে চড়ে মক্কা থেকে তায়েফ যেতে সময় লাগে মাত্র দু'কি তিন দিন। এমনকি মক্কা থেকে হাওয়াজিনদের অঞ্চল যদি চার দিনের সফরের মাথায় হয়ে থাকে এবং হাওয়াজিনেরা যদি অগ্রসর হতে থাকে মক্কার দিকে, তাহলে হুনায়নের যুদ্ধটি অবশ্যই মক্কা থেকে ৩০-৪০ মাইল দূরে সংঘটিত হয়েছিল।

বলা হয়ে থাকে যে, হুনায়নের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল আওতাশ পাহাড়ের সন্নিকটে। (ইবনে হিশাম পৃঃ ৮৪০) তবে বর্তমান প্রজন্মের মানুষেরা এ স্থানটির কথা একেবারেই ভুলে গেছে। খুব বেশি অর্থবহ না হলেও একটি বিবরণ থেকে জানা যায় যে, রাসূলে করীম (সঃ) হুনায়নের যুদ্ধের সময় দুশমনদের নিকট

থেকে সংগৃহীত মালামালের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্যে জায়রানাহ্-এ রেখে যান। পবিত্র মক্কা নগরীর উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত জায়রানাহ্—এ কথা সবারই জানা। রাসূলে করীম (সঃ) যখন দুশমনদের পশ্চাদ্ধাবন করেন, তখন তারা গিয়ে আশ্রয় নেয় দেয়াল দিয়ে ঘেরা তায়েফ শহরে।

হুনায়নের যুদ্ধ প্রসংগে জায়রানাহ্ নামটি এসে যাওয়ায় ধারণা করা হয় যে, মক্কার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকেই হুনায়নকে অনুসন্ধান করতে হবে। আরাফাত বা এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হুনায়নকে অনুসন্ধান করা নিরর্থক। যাহোক, বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, তায়েফের দিকে পলায়নপর শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করার সময় রাসূলে করীম (সঃ) নাখলা-ইয়ামানিয়াহ্-এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন এবং লিয়াহ্-এ পেঁাছেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৮৭২) জায়রানাহ্, নাখলা এবং কিরান একটি অর্ধবৃত্তাকার সৃষ্টি করেছে এবং লিয়াহ্ রয়েছে তায়েফের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এবং মক্কার ঠিক উল্টো দিকে। সুদূর অতীতকাল থেকে এ স্থানটি খুবই প্রসিদ্ধ এবং বর্তমানে তায়েফের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরতলি হিসাবে খুবই পরিচিত।

এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে যে, তায়েফ থেকে তিন দিনের সমপরিমাণ দূরের একটি অঞ্চলে এখনো হাওয়াজিনের যাযাবর গোত্র বসবাস করে। ১৯৩৯ সালে তায়েফে যারা আমার মেজবান ছিলেন তারাই এ ব্যাপারে আমাকে নিশ্চিত করেছেন।

যে পথে রাসূলে করীম (সঃ) অগ্রসর হয়েছিলেন

রাসূলে করীম (সঃ) যে পথে অগ্রসর হয়েছিলেন এবার আমরা সে পথ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। হাওয়াজিনের সৈন্যরা যাতে তায়েফবাসীদের সংগে মিলিত হতে না পারে সেজন্যে তিনি তাদের প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি মক্কা থেকে প্রথমে উত্তর দিকে এবং পরে উত্তর-পূর্ব কোণে অগ্রসর হলেন।

অর্ধবৃত্তাকারের একটি পথ অতিক্রম করার পর হুনায়নের নিকট মুখোমুখি হলেন শত্রুসেনাদের সংগে। এখানে শত্রুসেনাদের অতর্কিত আক্রমণ অপ্রত্যাশিত ছিল বলে প্রথম দিকে তারা সফলতা অর্জন করলো। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে রাসূলে করীম (সঃ) যে ব্যক্তিগত নজীর স্থাপন করলেন, তাতে করে মুসলমান

সৈন্যরা পুনরায় সংঘবদ্ধ হলেন। এবার তারা কেবলমাত্র প্রথমবারের আঘাত-কেই সামাল দিলেন না, বরং তাদের গতি হল অপ্রতিরোধ্য—শক্তি ও সাহসে তারা শত্রু সেনাদের ছাড়িয়ে গেলেন বহুগুণে। পালিয়ে যাওয়া ছাড়া হাওয়াজিন-দের তখন আর কোন বিকল্প ছিল না। ঘনিষ্ঠভাবে সন্নিহিত আঁকাবাঁকা উপত্যকার মধ্য দিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে তারা পেছনের দিকে ছুটল। স্পষ্টতই দুরূহ করে তুলল মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনকে। এই অভিযানের সময় হাওয়াজিনবাসীরা যে কেবলমাত্র তাদের ছেলেমেয়ে ও পুত্র-পরিজন নিয়ে এসেছিল তাই নয়, বরং তাদের সমস্ত ভেড়া-উটের পালকেও সংগে এনেছিল। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, তাদের এ ধরনের উদ্যোগের মূলে এ চিন্তা ছিলো যে, এগুলোই তাদেরকে বিজয় অর্জন অথবা মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে। কিন্তু সুযোগ্য ও সুশৃংখল মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলায় বাস্তবে তা ঘটলো না। মুসলিম বাহিনী হাওয়াজিনদের সব শিশু ও মহিলা-দের বন্দী করলো। শত্রু সম্পদ হিসাবে দখল করে নিল তাদের উট ও ভেড়ার পালকে। অবসর সময়ে বিলি-বন্টনের ব্যবস্থা নেয়া হবে এই চিন্তা করে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শত্রু সম্পদসমূহ মক্কার পথে জায়রানাহ নামক স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। একজন কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা হল এগুলো হেফাজতের দায়িত্বে। (ইবনে হাজার ইসাবাহ নং ২০৬৬) একই অর্ধবৃত্তা-কারের পথে অগ্রসর হয়ে তিনি পৌঁছে গেলেন তায়েফের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত লিয়াহ-এ এবং সেখানকার একটি দুর্গ ধ্বংস করে দেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৮৭২) প্রাচুর্য এবং বাগ-বাগিচায় সমৃদ্ধ এ অঞ্চলটি ছিল আর্থিকভাবে খুবই সমৃদ্ধ। এ অঞ্চলটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় তায়েফবাসীদের বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। তায়েফের এক প্রান্তের বিশাল বিস্তৃত ভূখণ্ড ছিল শিবির স্থাপন এবং সৈন্য পরিচালনার খুবই উপযোগী। এদিক থেকেই তিনি দেয়াল দিয়ে ঘেরা তায়েফ শহর অবরোধ করেন। ইবনে আব্বাস নামে পরিচিত বিশাল মসজিদের পাশেই এই যুদ্ধে শহীদদের কবর স্থান রয়েছে। এই কবর স্থান থেকেই মুসলিম বাহিনীর শিবির স্থাপনের জায়গাটি শনাক্ত করা যায়।

তায়েফ

ওয়াদি ওয়াজ্জ নামক একটি নদীর তীরে তায়েফ অবস্থিত। কেবলমাত্র বৃষ্টির পর নদীতে পানির প্রবাহ শুরু হয়। এই নদীটি দেয়াল দিয়ে ঘেরা তায়েফের প্রায় অর্ধেকটা পরিবেষ্টন করে আছে। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার

ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই শহরটিকে বলা যেতে পারে একটি গ্রীষ্মকালীন নিবাস স্থান। পবিত্র মক্কা থেকে তিনটি পথে এখানে আসা যায়। নিকটতম পথটি আরাফাতের মধ্য দিয়ে কারা পর্বতের উপর দিয়ে চলে গেছে। এ কারণে গাধা বা খচ্চর ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী এ পথ দিয়ে যাতায়াত করে না। এ পথে মক্কা থেকে মদীনার দূরত্ব প্রায় ৫০-৬০ মাইলের মত। পথটি অতিক্রম করতে সময় লাগে প্রায় ২০ ঘন্টা। বেলা শেষে কেউ মক্কা থেকে রওয়ানা করলে মাঝরাতে সে পৌঁছে যাবে কারা-এর পাদদেশে এবং এখানেই যাত্রার বিরতি দেবে। পরের দিন খুব সকালে সে আবার যাত্রা শুরু করবে ক্রমোন্নত পাহাড়ী পথ বেয়ে এবং দুপুরের মধ্যে সে পৌঁছে যাবে তায়েফ শহরে।

উষ্ট্রের পিঠে আরোহণ করে জায়রানাহ-এর মধ্য দিয়ে তায়েফ যাওয়ার আরেকটি পথ আছে। ব্যক্তিগতভাবে এ পথটি সম্পর্কে আমার জানা নেই। তৃতীয় পথটি ওয়াদি নামান এবং মাসিলের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। বর্তমানে এ পথটি ব্যবহৃত হচ্ছে মোটর সড়ক হিসাবে। দৈর্ঘ্যে এই পথটি প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ মাইল। এই পথ অতিক্রম করতে সময় লাগে প্রায় ঘন্টা তিনেক। এখানকার উপত্যকাগুলো সমতল এবং বেশ প্রশস্ত। এপথ দিয়ে যাতায়াতে কোন রকম অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতা নেই বললেই চলে।

প্রাচীন আরবের অন্যান্য শহরের মত তায়েফও মূলত গড়ে উঠেছিলো কতকগুলো গ্রামের সমন্বয়ে। একটি গ্রাম থেকে আরেকটি গ্রামের দূরত্ব ছিল দু-এক মাইল বা তার চেয়েও বেশি। প্রতিটি গ্রামে এক একটি গোষ্ঠী বা গোত্রের লোক বসবাস করত। প্রতিটি গ্রাম বা জনবসতির যেমন নিজস্ব কতগুলো বাগান ও আবাদী জমি ছিল, তেমনি ছিল কতগুলো দুর্গ এবং পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। ১৯৩৯ সালে শীতকালে পরিভ্রমণকালে এ ধরনের গ্রামগুলোর ধ্বংসাবশেষ এখানে দৃষ্টিগোচর হত। দেয়াল ঘেরা শহরের ঠিক নিম্নভাগের গ্রামগুলোর মধ্যে দিয়ে চলে গেছে ওয়াদি ওয়াজ্জ নদী। এই নদীর পানি দিয়ে এখানকার বাগান ও আবাদী জমির চাষাবাদ চলতো। প্রায় সারা বছরই নদীগর্ভ শুষ্ক থাকত কিন্তু এতদঞ্চলের বৃষ্টির পানি অবিলম্বে এবং অনায়াসেই ওয়াদি ওয়াজ্জ-এ এসে পড়তো। এ বৃষ্টির পানি বিধৌত এতদঞ্চলের ভূমি খুবই উর্বর এবং প্রাচীনকালে ব্যবহৃত কতগুলো টিউব অয়েলের প্রচলন এখনো এতদঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। সেচখালগুলোতে পানি সরবরাহ করা হয় টিউব অয়েলের সাহায্যে এবং এই পানি স্থানীয় বাগান ও আবাদী জমিগুলোতে সেচ কাজের জন্যে পর্যাপ্ত।

প্রাচীনকালে এতদঞ্চলের একজন গোত্র প্রধান পারস্য সম্রাটের একজন প্রাদেশিক শাসকের সহানুভূতি অর্জন করতে সমর্থ হয়। গোত্র প্রধানের সাহায্যার্থে প্রাদেশিক গভর্নর একজন প্রকৌশলী পাঠিয়ে দেন। শক্তিশালী ও মজবুত একটি দুর্গ তৈরী এবং আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাদিসহ দেয়াল পরিবেষ্টিত একটি শহর নির্মাণ করাই ছিলো তার উদ্দেশ্য।

আরবী শব্দ 'তায়েফের' আক্ষরিক অর্থ হল দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এটি মূলত একটি বিশেষণ। কিন্তু অচিরেই শহরটি এ নামে পরিচিত হয়ে যায়। (আঘানী খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯) শহর বাদ দিয়ে সামগ্রিকভাবে অবশিষ্ট অঞ্চলটিকে বলা হত ওয়াজ্জ। অবশ্য কখনো কখনো ওয়াজ্জ বলতে প্রাচীর বেষ্টিত তায়েফসহ গোটা অঞ্চলকেই বুঝাত। এখানকার ভূমির উর্বরতা অবশ্যই অন্যান্য অঞ্চলের লোকজনকে এ অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল এবং আদি অধিবাসীরা এতখানি উদার ছিল যে, তারা নবাগতদের মিত্র হিসাবে গ্রহণ করে। বস্তুতপক্ষে সে কারণেই ইসলামের সূচনা পর্বে আমরা তায়েফে বনু মালিক এবং আহলাফ নামের স্বতন্ত্র দুটি জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাই।

দেশজ ঐতিহ্য ও মতবাদ এবং বর্তমান সময়ে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে জানা যায় যে, লাত ও উজ্জা নামের মন্দির দুটি দেয়াল বেষ্টিত শহরের মধ্যে ছিল। ১৯৩৯ সালে আমাকে দেখানো হয়েছে যে, এর মধ্যে একটি স্থানে সরকারের একটি গেস্ট হাউস বা হোটেল রয়েছে। অপর স্থানে নির্মিত হয়েছে বিরাট একটি বেসরকারী ভবন।

তায়েফ শহরের বর্তমান দেয়ালটি তৈরী হয়েছে তুর্কী আমলে। দেয়ালের অংশবিশেষ অবশ্য পুরাতন দেয়ালের ভিত্তির উপর নির্মিত হয়েছে। তায়েফ অবরোধকালে যারা শহীদ হয়েছিলেন, রাসূলে করীম (সঃ)-এর জীবদ্দশায় সেখানে শহীদদের কবর দেয়া হয়েছিল, সে স্থানটিকে দেখান হয়েছে ইবনে আব্বাস নামের বড় মসজিদটির সন্নিকটে। এই কবর স্থানগুলো রয়েছে শহরের দেয়ালের ঠিক নিম্নভাগে। রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রধান কাতিব যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ)-কে পরবর্তী সময়ে এই কবরস্থানে দাফন করা হয়েছিল। ইবনে হিশাম (পৃঃ ৮৭২) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বর্তমানে যেখানে ইবনে আব্বাস মসজিদটি রয়েছে ঠিক সেখানেই রাসূলে করীম (সঃ)-এর শিবির স্থাপন করা হয়েছিল।

রাসূলে করীম (সঃ)-এর ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্রসমূহের বিবরণ

আরব ভূমিতে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত অঞ্চলের পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। সেক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের সূচনাপর্বে মুসলিম বাহিনী কোনো অঞ্চল অবরোধ করবে, এমন ঘটনা বড় একটা আশা করা যায় না। খায়বর দুর্গের পরে তায়েফে মুসলিম বাহিনীকে এমনি একটি অবরোধ ব্যবস্থায় যেতে হল এবং এটা ছিল তাঁদের জন্যে দ্বিতীয় ঘটনা। এ সময়ে তায়েফবাসীরা শহরের প্রতিরক্ষা বেষ্টনির মধ্যে থেকে যে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-কে তার মুকাবিলা করতে হল। খায়বর অবরোধের সময় মানজানিক পাথর ছোঁড়ার এক ধরনের কামান-এর আঘাতে মুসলিম বাহিনীকে খুবই বিপর্যস্ত হতে হয়। অতীতের এই অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তায়েফ অবরোধের সময় রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)ও পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র বা মানজানিক এবং আবরণযুক্ত গাড়ি বা এক রকম হস্তচালিত ট্যাংক (দাব্বাবাহ, দাবুর, আররাদাহ) ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা যায় (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৮৭২, তাবারী ১/১৬৭২) এবং দাব্বাবাহ বা ঢাকনাযুক্ত গাড়িটি খালিদ ইবনে সাইদ জরশ থেকে এনেছিলেন। উপরন্তু বালাযুরী আনসাব আল আশরাফ (১৩৬৬, কায়রো সংস্করণ) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তায়েফে যে গুলতি ব্যবহৃত হয়েছিল, সালমান ফারসী (রা) ছিলেন তার নির্মাতা। এবং ঢাকনাযুক্ত গাড়িটি খালিদ ইবনে সাইদ জরশ থেকে এনেছিলেন। যাহোক ইবনে সাদ-এর (২/১, পৃঃ ১১৪) বর্ণনা মতে দাউসী আত তুফায়েল ইবন আমর একটি ঢাকনাযুক্ত গাড়ি এবং এতদসংগে একটি পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র নিয়ে এসেছিলেন। এখানে দুটি বর্ণনার মধ্যে নামে তারতম্য থাকলেও প্রকৃত ঘটনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ প্রসংগে ইবনে হিশামের (পৃঃ ৮৬৯) বর্ণনায় একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেছেন যে, জায়লান ইবনে সালামাহ এবং উরওয়া ইবনে মাসউদ নামে তায়েফের তাকিফী গোত্রের দু' ব্যক্তি তায়েফের যুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি। কারণ তারা দু'জনেই ঢাকনাযুক্ত গাড়ি এবং পাথর ছোঁড়ার যন্ত্রের নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা লাভের জন্যে জরশ গিয়েছিল। সেখান থেকে যখন তারা প্রত্যাবর্তন করে তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।

এই একই ঘটনাকে ইবনে সাদ আরও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর বর্ণনার সংগে একথাও সংযোগ করেছেন যে, তখনো তারা অমুসলিম ছিল। কেবল মাত্র (তায়েফ অবরোধের) এই ঘটনার পর তারা

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার প্রস্তুতি নেয়। এর অর্থ কি এই যে, রাসূলে করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার লক্ষ্যেই তারা এ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রে নিজেদের সজ্জিত করেছিল? অবরোধকারী মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে অবশ্যই তারা পাথর ছোঁড়ার যন্ত্রটি ব্যবহার করতে পারত। কিন্তু ঢাকনাযুক্ত গাড়ির কি প্রয়োজন ছিল? এগুলোকে বড়জোর সম্মুখ আক্রমণে হাতাহাতি যুদ্ধে ব্যবহার করা যেত। হতে পারে যে, ভবিষ্যতে আকস্মিকভাবে কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে এ ধরনের অস্ত্রের (ঢাকনাযুক্ত গাড়ি) প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখেই অথবা তারা কেবল মাত্র শিক্ষার খাতিরেই এতদসংক্রান্ত শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশবাসীর পরিবর্তে অন্যদের নিকট এগুলো বিক্রি ও সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া।

রাসূলে করীম (সঃ) প্রসংগে বলা যেতে পারে যে, সম্ভবত তাঁর কাছেও একটি কি দুটি পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র ছিল। পূর্ববর্তী বছরে খায়বরে অভিযানের সময় যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী হিসাবে তারা এগুলো দখল করেছিলেন। সালমান ফারসী (রাঃ) যন্ত্রগুলোর মেরামত ও সংস্কার এবং এগুলোর অনুকরণে নতুনভাবে যন্ত্র তৈরি করতে পারতেন। তৎসত্ত্বেও এটা স্পষ্ট যে, তায়েফের মত এত বড় একটি শহর অবরোধের ক্ষেত্রে ছোট আকারের একটি কি দুটি পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র খুব বেশি একটা কার্যকর হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া তায়েফের প্রতিরক্ষার জন্যে রক্ষিবাহিনী বা মওজুদ খাদ্যের কোন কমতি ছিল না। বস্তুতপক্ষে সে কারণেই এ সব যন্ত্র ব্যবহার করে তায়েফকে আত্মসমর্পণের পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে শত্রুসেনাদের অবিরাম তীর বর্ষণ এবং উত্তপ্ত পেরেকের আঘাতেও অবরোধকারী মুসলিম বাহিনীর অশেষ ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৮৭৩) মুসলিম সেনাদের ব্যবহৃত ট্যাংকগুলো যে চামড়া দিয়ে আবৃত ছিল, উত্তপ্ত পেরেক সেগুলো ছিদ্র করে ফেলে এবং তায়েফের এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মুকাবিলায় বাইর থেকে শহরের প্রতিরক্ষা দেয়ালকে গুঁড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

যদিও হাতাহাতি যুদ্ধের জন্যে শত্রুসেনারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসার সাহস পেলো না, তবুও দুর্গ প্রাচীরের মধ্য থেকে তাদের তীর বর্ষণের কারণে মাঝে মধ্যেই অবরোধকারী মুসলিম বাহিনীকে ক্ষয়ক্ষতি পোহাতে হলো। বিশেষ করে রাতের বেলা যখন তারা শিবিরে খানিকটা অবসর অবস্থায় থাকত, তখনই

এই ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হত। ঐতিহাসিক বালাযুরী তাঁর আনসাব (১, ৩৬৭) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তায়েফ অবরোধের সময় রাসূলে করীম (সঃ)-এর সংগে কাঠ ও তক্তা ছিলো। তিনি এগুলোকে শিবিরের চারপাশে খাড়াভাবে স্থাপন করেছিলেন।

অবরোধ যখন দীর্ঘায়িত হল এবং আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না, রাসূলে করীম (সঃ) তখন তাদের উপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। শহরের প্রতিরক্ষা দেয়ালের বাইরে তায়েফের বেশ কিছু সংখ্যক গোত্র প্রধানের কতগুলো আংগুর বাগান ছিল। এগুলোতে খুবই উন্নতমানের এবং বিরল জাতের আংগুর উৎপন্ন হতো। রাসূলে করীম (সঃ) এ বাগানগুলো বিনষ্ট করার হুমকি দিলেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৮৭৩) শত্রু সেনারা এবার ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ল। আংগুর বাগানগুলোকে একেবারে বিনষ্ট না করে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করার জন্যে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট প্রস্তাব পাঠাল। প্রিয়নবী (সঃ) দেখলেন যে, বাগানগুলো ধ্বংস করে দিলেও এর মধ্যে তাৎক্ষণিক এবং কার্যকর কোন সুবিধা পাওয়া যাবে না। তাই তিনি বাগান ধ্বংস সংক্রান্ত আদেশ রহিত করলেন।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তায়েফবাসীদের উপর আরেকটি চাপ সৃষ্টি করলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন যে, শত্রুপক্ষের যে সব গোলাম বা দাস ইসলাম গ্রহণ করবে এবং আশ্রয় নেবে মুসলিম শিবিরে তাদেরকে মুক্ত ও স্বাধীন মানুষ হিসেবে গ্রহণ করা হবে। (ইবনে সাদ, ২/১ পৃঃ ১১৪-১১৫) এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে এ সময়ে এ জাতীয় অনেক ঘটনা ঘটে এবং অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এ আদেশটি একটি স্থায়ী বিধান হিসাবে ইসলামী আইন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এখানে অত্যন্ত কৌতূহলের সংগে তদানীন্তনকালের একটি সমর কৌশল সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে। রাসূলে করীম (সঃ) প্রতিরক্ষা দেয়ালের চারপাশে গাছের গুড়ি এবং কাঁটাযুক্ত নতুন ডালপালা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেন। রাত্রিকালীন আক্রমণ অথবা অন্য কোন উপলক্ষে শত্রুসেনাদের শহর থেকে বেরিয়ে আসা এবং শহরের মধ্যে জনশক্তি ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের অনুপ্রবেশে প্রতিরোধ করাই ছিল প্রিয়নবী (সঃ)-এর এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য। (ইবন সাদ, ২/১, পৃঃ ১১৪, ওয়াকিদী ; মাগাজী)

চল্লিশ দিন অবরোধের পর (ইবনে সাদ ২/১, পৃঃ ১১৫) রাসূলে করীম (সঃ) অবরোধ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলেন। অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং সম্মুখ সমরের পরিবর্তে রাজনীতিকে গ্রহণ করলেন হাতিয়ার হিসাবে। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ থেকে আমরা দেখতে পাব যে, অন্যান্য প্রক্রিয়া পদ্ধতির ব্যাপারে রাসূলে করীম (স)-এর সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাস ছিলো একান্তই যুক্তিসংগত।

জর়শ্ নামক স্থান শনাক্তকরণ

ইতিপূর্বে জর়শ্ নামক একটি স্থান সম্পর্কে আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু স্থানটি কি জর়শ্ না জুরাশ সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে হিশামের (পৃঃ ৯৫৪) মতে জুরাশ হল তায়েফের দক্ষিণে প্রতিরক্ষা দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটি শহরের নাম। আরবী পরিভাষায় এটিকে বলা হয় 'মদীনা মুঘ্লাকাহ,' যার আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় একটি অবরুদ্ধ শহর। ইয়েমেন বংশোদ্ভূত গোত্রসমূহের লোকজন এখানে বসবাস করত। আরব ভূগোলবিদগণের কাছে এলাকাটি খুব ভালভাবেই পরিচিত। তাঁরা স্থানটিকে উল্লেখ করেছেন ইয়েমেনের একটি অংশ হিসাবে। কিন্তু যে বিষয়টি আমাদের ভাবিয়ে তোলে তা এই যে, ছোট এবং প্রাচীন এই শহরটি অবশ্যই মক্কা ও মদীনা, এমনকি তায়েফের চেয়ে এতদূর অগ্রসর ছিল যে, এখানকার সমৃদ্ধ সমরাস্ত্র শিল্প-কারখানা ছিল গৌরবের বিষয়। এখানে যে কেবলমাত্র পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র, হস্তচালিত ট্যাংক এবং যুদ্ধ রথ (প্রাচীন কালে যুদ্ধের জন্যে ব্যবহৃত এক ধরনের বাহন) বেচাকেনা হত, তাই নয়, বরং লোকে এখানে এসে হাতে-কলমে এগুলোর নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। এরূপ চিন্তা করা যুক্তিপূর্ণ মনে হয় না যে, রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) যে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের ট্রান্সজর্দানিয়ার দূরবর্তী জরশে তার গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন।

অন্য মত এ রকম যে, জর্ শ্ রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত ট্রান্সজর্দানের অন্তর্গত একটি শহর। শিল্প-কারখানার জন্যে এটি ছিল একটি উপযুক্ত স্থান। এখান-কার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি অতীতের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের স্বাক্ষর বহন করে। (এমন কোন বিষয় অনুমান করা খুব একটা যুক্তিসঙ্গত হবে না যে, রাসূলে করীম [সঃ] অস্ত্র ক্রয়ের জন্যে জর্ শের মত প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন)। তাছাড়া বেদুঈন অঞ্চলে যুদ্ধ সরঞ্জাম রপ্তানী করার ব্যাপারে বাইজানটাইন সম্রাটের কঠোর বিধি-নিষেধ ছিল। তাছাড়া মাত্র কয়েক

মাস পূর্বে মু্তায় মুসলিম বাহিনীর সংগে বাইজানটাইন বাহিনীর একটি যুদ্ধ বাঁধে। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে বড় রকমের বিপর্যয় এবং ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এমতাবস্থায় জর্‌শ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের বিষয়টি ছিল মুসলমানদের জন্যে একটি অচিন্তনীয় ব্যাপার। উপরন্তু সুদূর তায়েফ পর্যন্ত এ সব অস্ত্র পরিবহন সমস্যার প্রেক্ষিতেও এটা সম্ভব ছিল না। কারণ জর্‌শ থেকে তায়েফ পর্যন্ত যেতে অথবা আসতে একমাসের অধিক সময় দরকার হত। আবার আমরা যদি এই ব্যাখ্যাকে বিবেচনার মধ্যে নিয়ে আসি যে, তায়েফবাসীরাও অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জর্‌শ-এ দূত প্রেরণ করেছিল, তাহলে সে স্থানটিতেও ট্রান্স জর্দানিয়ার জর্‌শের পরিবর্তে নিকটবর্তী কোথাও হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ মুসলমান রাষ্ট্রের তুলনায় তায়েফবাসীদের সংগতি ও সম্পদের পরিমাণ কম থাকায় দূরবর্তী অঞ্চল থেকে সমরাস্ত্র ক্রয় করা সম্ভব ছিল না।

প্রসংগক্রমে আরো স্মরণ করা যেতে পারে যে, রাসূলে করীম (সঃ)-এর যে সব প্রতিনিধি এ সব সমরাস্ত্র নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা ছিলেন ইয়ামনের আযদ গোত্রের অধিবাসী। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যভুক্ত জর্‌শের পরিবর্তে ইয়ামনের জুরাশ শহরে তাদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল এবং এরূপ ধারণা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। কারণ বাইজানটাইন এলাকায় মুসলমান-দের দেখা হতো সন্দেহের চোখে, সকলেই তাদের সংগে ব্যবহার করতো অবজ্ঞার সংগে। শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চায় হেজাজবাসীদের চেয়ে ইয়ামনবাসীরা ছিল অধিকতর অগ্রসর। তাদের ব্যাপারে এ রকম একটি ধারণা পোষণ করতে কোন সংকোচ জাগে না যে, তারা তাদের গ্রামের চারপাশে কেবলমাত্র একটি কাঁচা দেয়ালই গড়ে তোলেনি বরং অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই পেশা-গতভাবে ছুঁতার মিস্ত্রী ছিল। তারা নির্মাণ করতে পারত মানজানিক অর্থাৎ পাথর ছোঁড়ার কামান এবং যুদ্ধ রথ। হতে পারে যে, এ সব অধিবাসী ছিল য়াহূদী অথবা খৃস্টান ধর্মাবলম্বী।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর জীবনী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তিনি কখনো পেশাদার ছুঁতার বা মিস্ত্রী ছিলেন না। অথচ তিনিও একটি পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। এরপরও কি শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জুরাশ-বাসীদের কৃতিত্ব ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার অবকাশ আছে? অবশ্য ভারতীয় মুসলমান ঐতিহাসিক মরহুম আল্লামা শিবলী নুমানী জর্‌শকে ট্রান্সজর্দানিয়ার

একটি শহর হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি যে, নুমানী এ সব বিষয় বিবেচনার মধ্যে আনয়ন করেন নি। বস্তুত পক্ষে তিনি তাঁর সুবিশাল গ্রন্থে [সীরাতুন্নবী (সঃ) ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭, ২য় সংস্করণ] এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেননি, কেবলমাত্র প্রসংগক্রমে জর্‌শকে সিরিয়ার (ট্রান্স জর্দানিয়া) অংশ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

বিজিত হাওয়াযিন গোত্রের সংগে রাসূলে করীম (সঃ)-এর আচরণ

যাহোক রাসূলে করীম (সঃ) মক্কায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন। ফিরতি পথে তিনি জায়রানাহ-এ যাত্রা বিরতি করে। হুনায়ন এবং আউতাস থেকে সংগৃহীত শত্রু সম্পদ বিলি-বন্টন করে দিলেন মুজাহিদদের মধ্যে।

রাসূলে করীম (সঃ)-এর জন্মের সময় বিজিত হাওয়াযিন গোত্রের মহিলা হযরত হালিমা সাদিয়া (রাঃ) ছিলেন তাঁর দুধ-মা। হাওয়াযিনরা ভালভাবেই জানত যে, তারা যদি ইসলামের বিরোধিতা না করে তাহলে যে শিশুকে তারা লালন-পালন করেছে, সে শিশুকে দিয়ে তাদের ভয়ভীতির কোন কারণ নেই। একথা চিন্তা করেই তারা জায়রানাহ-এ চলে আসে এবং ইসলাম কবুল করে। অতঃপর রাসূলে করীম (সঃ) বললেন, বিগত সপ্তাহগুলোতে আমি যুদ্ধলব্ধ বিষয় সম্পদসমূহ বিলি-বন্টন করা থেকে বিরত থেকেছি। আমি একান্তভাবে প্রত্যাশা করেছি যে, তোমরা অবশ্যই অনুতপ্ত হবে এবং আমি তোমাদের পরিবার-পরিজন এবং পশুপাল তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারব। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। এক সময়ে যা কিছু তোমাদের মালিকানায় ছিল এখন তার অনেক কিছুই বিলি-বন্টন করা হয়ে গেছে। যাহোক, তোমাদের মেষপাল অথবা পরিবার-পরিজনদের মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নাও। দেখি আমি তোমাদের জন্যে কতদুর কি করতে পারি।

হাওয়াযিন গোত্র তাদের ছেলেমেয়ে এবং মহিলাদের বেছে নিল। রাসূলে করীম (সঃ) বললেন, তোমাদের পরিবার-পরিজনদের মধ্যে যারা আমার এবং আমার আপনজনদের ভাগে পড়েছে, তাদের আমি ফিরিয়ে দিলাম। যখন নামাযের জামা'আত শেষ হবে তখন অন্যদের সম্পর্কে আমাকে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করো।

নামাযের জামা'আত শেষ হলো। প্রিয়নবী (সঃ)-এর নির্দেশ অনুসারে হাওয়াযিন গোত্র কাজ করল। প্রিয়নবী (সঃ) পুনরায় ঘোষণা দিলেন যে, তিনি

এবং তাঁর পরিবার বর্গ যে সব নারী ও শিশুদের গ্রহণ করেছিলেন তাদের সকলকে স্বাধীন করে দিয়েছেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ) এবং প্রথম সারির অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম একে একে প্রিয়নবী (সঃ)-এর আদর্শকে অনুসরণ করলেন। তাঁদের দেখাদেখি অন্য সব মুসলমান সৈন্য বিনা মুক্তিপণে সব হাওয়াযিন মহিলা ও শিশুকে মুক্ত করে দিলেন। ব্যতিক্রম দেখা গেল কেবল মাত্র একটি কি দুটি গোষ্ঠীর সৈন্যদের বেলায়। তারা তাদের অংশে প্রাপ্ত মহিলা বা শিশুদের ফিরিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকলো। প্রিয়-নবী (সঃ) এদের সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের ভাগে প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ মানুষজনকে তোমাদের পরিত্যাগ করা উচিত। এর বিনিময়ে তোমরা সরকারী কোষাগার থেকে ক্ষতিপূরণ পাবে। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৮৭৭)

এর অর্থ দাঁড়ালো যে, তায়েফবাসীরা হাওয়াযিনে তাদের সর্বশেষ মিত্রদের হারালো। ইতিপূর্বে তায়েফের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। এবার অতি দ্রুত তার প্রসার ঘটতে থাকে। মক্কার বাজার ছিলো মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে। অথচ এটাই ছিল তায়েফের উৎপাদিত সামগ্রীর একমাত্র বেচাকেনার কেন্দ্র। সম্ভবত তায়েফের বাণিজ্য কাফেলা তাদের শহরের চতুর্সীমানার বাইরে যেতে পারছিল না। এমনকি তায়েফবাসীদের পক্ষে উকাজের মেলায় যাওয়ার সম্ভাবনা পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে যায়।

বস্তুতপক্ষে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পেঁাছে যে, তায়েফ অবরোধের পর এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তায়েফবাসীরা মদীনায় একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করল। ঘোষণা দিল যে, রাসূলে করীম (সঃ)-এর নিকট তারা আত্মসমর্পণ করেছে, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিকভাবে নিজেদের মুক্ত করেছে নিজেদের হাতে তৈরী লাত ও উজ্জা নামের পুতুলের দাসত্ব থেকে। তারা মর্মে মর্মে অনুভব করছে যে, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। ইবাদত-বন্দেগী একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।

রাসূলে করীম (সঃ) অবিলম্বে মুসলমান হিসাবে তাদের মেধা ও বুদ্ধি-মত্তাকে কাজে লাগালেন। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের ব্যবস্থাপনার জন্য তাদের মধ্য থেকে নির্বাচন করলেন গভর্নর এবং অন্যান্য কর্মকর্তা। মানুষের রক্তের প্রতি সম্মান এবং বিপর্যস্তদের প্রতি উদারতার যে বিজ্ঞজনোচিত নীতি রাসূলে করীম (সঃ) সদা সর্বদা উচ্চে তুলে ধরতেন, তাঁরা তারই অনুসরণ করল অতি নিষ্ঠার সাথে। এমনিভাবেই তাঁরা ইসলাম ধর্মের প্রচার ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় দেন।

অধ্যায় ৭

য়াহূদীদের সংগে যুদ্ধ

মদীনা থেকে য়াহূদী গোত্রসমূহের বহিষ্কার

মুসলমানদের সংগে য়াহূদীদের ব্যাপক বিষয়ে অভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তারা রাসূলে করীম (সঃ)-এর সংগে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেনি। এটা মনুষ্যত্বের জন্যে এক দারুণ দুঃখজনক ঘটনা। মুসলিম রাষ্ট্রের সংগে তাদের বিবাদের উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়ে এ প্রসংগে স্মরণ করা আবশ্যক যে, মদীনার য়াহূদী গোত্র বনু কায়নুকার সংগে রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রথম সামরিক সংঘাত বাধে। পেশাগতভাবে তারা ছিল স্বর্ণকার। তারা বসবাস করতো শহরের ঠিক মাঝখানে। সম্ভবত প্রসিদ্ধ 'সূক' অর্থাৎ বাজারের মাধ্যমে তারা নিয়ন্ত্রণ করতো শহরের বৈদেশিক বাণিজ্যকে। তাদের কোন আবাদী জমি ছিলো না। তবে তাদের কতগুলো দুর্গ সম্পর্কে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। এই দুর্গের মধ্যে থেকেই তারা প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অবরোধকে প্রায় দু'সপ্তাহের জন্যে ঠেকিয়ে রেখেছিল। যে কারণে যুদ্ধ বাধল (একজন মুসলিম মহিলাকে নির্লজ্জভাবে অসম্মান করা) এবং মদীনার অন্যান্য য়াহূদীর সংগে তাদের সম্পর্ক যে অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল, তার ফলে কেউ-ই বনু কায়নুকার সাহায্যে এগিয়ে এলো না। পরিণামে তারা নিঃশর্তভাবে নবীজীর কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং রাসূলে করীম (সঃ)ও তাদেরকে মদীনা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে ক্ষান্ত হলেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৪৬) এমনকি ইসলামের সেই প্রথম যুগেও অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীতে য়াহূদী-দের প্রস্থান বিষয়টি তদারকির জন্যে একজন বাস্তুত্যাগ 'অফিসার' নিয়োগ করেন। (তাবারী, ১/১৩৬১) রাসূল করীম (সঃ)-এর বাসভবন থেকে বনু কায়নুকার বসতি ছিল মাত্র কয়েক ফার্লং দূরে। তৎসত্ত্বেও অবরোধকালীন

সময়ে মুসলমানদের শহর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব একজন উপকর্মকর্তার উপর ন্যস্ত করেন।

পরের বছর বনু নাদির নামে মদীনার আরেকটি য়াহূদী গোত্র খুবই নিন্দনীয় একটি অপরাধে অভিযুক্ত হলো। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে যে একজন নবীর আগমন ঘটতে পারে এমন ধারণা ছিল য়াহূদীদের চিন্তার বাইরে। তাদের ধারণা ছিল একজন নবীর আবির্ভাব হবে বনি ইসরাঈল থেকে। বদরের প্রান্তরে মুসলমানদের বিজয় তাদের বিতৃষ্ণার সংগে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের সংযোগ ঘটায়। তাছাড়া দুষ্ট চরিত্রের য়াহূদী গোত্র বনু কায়নুকাকে মদীনা থেকে বিতাড়নের ফলে তাদের অন্তরে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তার কারণ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অপরাধমূলক কাজের জন্যে রাসূলে করীম (সঃ) কিছু কিছু য়াহূদীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এতে করে য়াহূদীরা ধৈর্যের শেষ সীমানায় গিয়ে পৌঁছে। ঐতিহাসিক বর্ণনানুসারে (মুসলিম শরীফ, ২১/৬২ এবং ১১৬; ৩৩/২২; আবু দাউদ শরীফ, ১৯/২৩; সামহুদী রচিত ওয়াফা আল-ওয়াফা গ্রন্থে আবদ ইবনে হুমাইদ এবং ইবন মারদুইহ্-এর উদ্ধৃতি, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৯৮) জানা যায় যে, তারা রাসূলে করীম (সঃ)-কে এই বলে অনুরোধ করে যে, "আপনি আপনার তিনজন সহচরসহ আমাদের এখানে আসুন। (৩০, আবু দাউদ) আমাদের তিনজন পুরোহিত ধর্ম সম্পর্কে আপনা-দের সংগে আলোচনা করবেন। তারা যদি আলোচনায় পরিতৃপ্ত হন, তাহলে আমরা সকলেই এক সংগে আপনার ধর্মে দীক্ষা নেব।" এ সব য়াহূদী পণ্ডিতেরা তাদের আলখাল্লার মধ্যে ধারাল ছোরা লুকিয়ে রাখে এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে হত্যা করার ফন্দি আঁটে।

বহু পূর্বে একজন য়াহূদীর সংগে আরব দেশীয় একজন মহিলার বিয়ে হয়ে-ছিল। তাঁর এক ভাই ছিলেন মদীনার এক আনসার। এই মহিলা অতি সংগো-পনে য়াহূদীদের ষড়যন্ত্রের খবর তাঁর ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। রাসূলে করীম (সঃ) বনু নাদির গোত্রের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর তাঁর কাছে এ গোপন ষড়যন্ত্রের খবর পৌঁছে। প্রিয়নবী (সঃ) তৎক্ষণাৎ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। পরের দিন সকালে মুজাহিদ বাহিনীসহ অভিযান পরিচালনা করলেন বনু নাদিরের বিরুদ্ধে। বনু নাদির ভুক্ত য়াহূদীরা বসবাস করতো মদীনার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে শহরতলিতে। তারা সংখ্যায় ছিল দুই কি তিন হাজারের মতো। রাসূলে করীম (সঃ) এমন একস্থানে শিবির স্থাপন করলেন যে, আরও দক্ষিণে

আওয়ালা নামক জায়গায় বসবাসরত বনু কুরায়যার য়াহূদীদের সংগে বনু নাদিরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বনু নাদির গোত্র অবরোধকালে রাসূলে করীম (সঃ) যে স্থানে তাঁবু গেড়েছিলেন, সে স্থানে নির্মিত 'আল-ফাদিখ' মসজিদটি এখনো তার স্মৃতি বহন করছে। উল্লেখ্য যে, আল-ফাদিখ মসজিদ, মসজিদে শাম্‌স নামেও পরিচিত।

অবরুদ্ধ য়াহূদীরা একটি মরূদ্যানে বসবাস করতো। খেজুর বীথির আড়ালে পুরোপুরি নিরাপদে থেকে তারা মুসলিম বাহিনীর উপর চড়াও হতে পারত। বলা হয়ে থাকে যে, সে কারণেই চামড়া বা কাপড়ের তৈরী তাঁবুর পরি-বর্তে রাসূলে করীম (সঃ)-এর জন্যে কাঠের তক্তা দিয়ে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল, শত্রু সেনাদের তীর বর্ষণ থেকে নিরাপত্তার জন্যে এটা দরকার ছিলো। (শামী, সীরাহ) কুরআনুল করীমেও এ বিষয়ে উল্লেখ আছে যে, মুসলমানগণ শত্রু সেনাদের বেশ কিছু খেজুর ও তালগাছ কেটে ফেলেন। সম্ভবত শত্রু সেনা-দের উপর আক্রমণ পরিচালনার জন্যেই এমনটি করতে হয়েছিল। প্রয়োজনীয় বিষয় সামগ্রীর সরবরাহ বন্ধ থাকায় অল্প সময়ের মধ্যেই শত্রু সেনাদের সমস্ত মওজুদ নিঃশেষ হয়ে গেল এবং তারা আত্মসমর্পণ করল। এবারও রাসূলে করীম (সঃ) তাদেরকে নিশ্চিন্তে দেশান্তরে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। সুযোগ দিলেন অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে যাওয়ার (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৫৩) এমনকি মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা ঋণী ছিলেন তাদের নিকট থেকে ঋণ উশুল করার অনুমতি দিলেন।

৬০০ উট নিয়ে তারা মদীনা ছেড়ে চলে গেল। (মাকরিজী, ইমতা খণ্ড ১, পৃঃ ১৮১; ইবনে সা'দ ২/১, পৃঃ ৪১) তাদের অধিকাংশই বসতি স্থাপন করলো খায়বর অঞ্চলে। এবং সম্ভবত স্বাভাবিক নিয়মেই তারা মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের ষড়যন্ত্রের পরিণতি এখানে বিবৃত করা হল। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, মদীনা পরিত্যাগের লজ্জা ও যন্ত্রণাকে তারা ঢাকা দেয়ার জন্যে উদগ্রীব ছিল। সে কারণেই তারা শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় বাদ্য বাজায়, গান গায়। (তাবারী ১, ১৪৫২; ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৫৩)

বনু কায়নুকার লোকেরা যে গ্রামটিতে বসবাস করতো, বর্তমানে (১৯৩৯) সে স্থানটিকে একটি সমতল ভূমির আকারে দেখা যাবে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু বনু নাদির গোত্রের লোকেরা পূর্বে যেখানে বসবাস

করতো, সেখানে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত কাব ইবনে আল-আশরাফ প্রাসাদের ধ্বংসা-বশেষ এখনো বিরাজমান। এই ধ্বংসাবশেষই ইসলাম-পূর্ব যুগে মদীনার সামরিক স্থাপত্য সম্পর্কে গবেষণার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে রেখেছে। লাভা দ্বারা গঠিত পূর্বাঞ্চলীয় সমতল ভূমির দক্ষিণ দিকে এবং ওয়াদি মুযায়নিব-এর সন্নিকটে যে স্থানটিকে বনু নাদির-এর আবাসভূমি বলে চিহ্নিত করা হয়, তার পাশে ছোট্ট একটি পাহাড় রয়েছে। এর উপরে কাব ইবনে আল-আশরাফ প্রাসাদের দেয়ালগুলো এখনো বিদ্যমান। পাথর দিয়ে নির্মিত এই দেয়ালগুলোর উচ্চতা প্রায় একগজ এক ফুট। প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগেই রয়েছে একটি কুয়া। এটা স্পষ্ট যে, অবরোধ এবং অন্যান্য দুর্যোগ সময়ে এই কুয়ার পানি দিয়ে তারা তাদের অভাব মিটাত। প্রাসাদের সম্মুখে এবং পাহাড়ের উপরে বৃহদাকার একটি চৌবাচ্চার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। চৌবাচ্চাটি চুনা পাথর দিয়ে তৈরী এবং অনেকগুলো অংশে বিভক্ত। অবশ্য প্রত্যেকটি অংশ পরস্পরের সংগে মাটি দিয়ে তৈরী পাইপ দ্বারা সংযুক্ত। সম্ভবত গবাদিপশুর পানি পান করানোর জন্যে এগুলো ব্যবহৃত হতো।

বনু কুরায়যা

রণ-চাতুর্য এবং রণ-কৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে আমরা মদীনার য়াহূদী বিশেষ করে বনু কুরায়যার সঙ্গে যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে খুব সামান্যই জানি। মদীনায় বসবাসরত য়াহূদী গোত্রগুলো ছিল আরবের বিভিন্ন গোত্রের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। তন্মধ্যে বনু কুরায়যা ভুক্ত য়াহূদীরা ছিল সর্বাধিক অনুগত ও বাধ্য। বনু নাদিরে ভুক্ত য়াহূদীরা তাদের উপর জুলুম-নির্যাতন চালাতো। সে কারণেই বনু নাদির গোত্রের কোন লোক বনু কুরায়যার কাউকে হত্যা করলে প্রচলিত প্রথা অনুসারে হত্যাকারীকে মাত্র অর্ধেক রক্তমূল্য দিতে হতো। কিন্তু রাসূলে করীম (সঃ) যখন মদীনায় এলেন তখন তিনি এই ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটালেন। অন্যান্য য়াহূদীর সংগে বনু কুরায়যাকেও দিলেন সমানাধিকার। তাদের অনেক সুযোগ-সুবিধা দিলেন। অথচ তাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধের লেশমাত্র ছিল না। বরং বনু নাদির ভুক্ত য়াহূদীদের সংগে যখন মুসলমানদের সংঘর্ষ বাঁধে এবং মুসলমানরা বনু নাদির ও বনু কুরায়যার মাঝামাঝি স্থানে শিবির স্থাপন করে, তখন পশ্চাৎ দিক থেকে বনু কুরায়যার লোকেরা মুসলমানদের আক্রমণ করার পাঁয়তারা শুরু করে। সে কারণেই বনু নাদির গোত্রকে অববোধ করার মাত্র

একদিন পরে তিনি অবরোধ তুলে নেন। তিনি সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা করেন বনু কুরায়যার বিরুদ্ধে। (বুখারী শরীফ, ৬৪/১৪, মুসলিম শরীফ ৩২/৬২, নাসায়ী শরীফ ১৭৬৬; আবূ দাউদ শরীফ ১৯/২৩) কিন্তু বনু কুরায়যার লোকেরা নিজেদের দুর্বলতা এবং অক্ষমতার কথা বিবেচনা করে শান্তির জন্যে বিনীত আবেদন জানায়। এবং বনু নাদিরকে সাহায্য না করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করে। রাসূলে করীম (সঃ) তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন। অতঃপর তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন বনু নাদির গোত্রের বিরুদ্ধে। অনন্যোপায় হয়ে তারাও তখন আত্মসমর্পণ করলো।

দু'বছর পরে মুসলমানদের সংগে মক্কাবাসীদের খন্দকের যুদ্ধের সময় বনু কুরায়যা আবার বিশ্বাসঘাতকতা করলো। ফলে স্বাভাবিক কারণেই মুসলমানরা তাদের সংগে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পথকে বেছে নিলেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় মদীনা অবরোধকারী মক্কাবাসীদের প্রস্থানের ঠিক পরের দিন রাসূলে করীম (সঃ) বনু কুরায়যাকে অবরোধ করার জন্যে অগ্রসর হলেন। কয়েক সপ্তাহ তারা মুসলমানদের অবরোধ প্রতিহত করলো। অবশেষে তারা নিরাশ হয়ে পড়লো এবং এই শর্তে আত্মসমর্পণ করলো যে, তাদের পছন্দমত একজন মধ্যস্থতাকারী যে সিদ্ধান্ত দেবেন, সে সিদ্ধান্তকেই তারা মেনে নেবে। রাসূলে করীম (সঃ)ও এই শর্তে রাজী হলেন। বনু কুরায়যার মনোনীত মধ্যস্থতাকারী সিদ্ধান্ত দিলেন যে, বাইবেলে য়াহূদীদের হাতে পরাস্ত শত্রুদের সংগে যে রকম ব্যবহার করার প্রতিবিধান রয়েছে মুসলমানদেরও য়াহূদীদের সংগে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় (ডিওটারোনোমী, ২০ ; ১৩-১৪)।

যুদ্ধ শেষে শত্রুর নিকট থেকে পাওয়া বনু কুরায়যা থেকে প্রাপ্ত গনীমতের মালের বিষয় সামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ জমা হলো বায়তুলমালে। শামী-এর বর্ণনা মতে এই সম্পদ সিরিয়া ও নজদ থেকে ঘোড়া ও অস্ত্র ক্রয়ের জন্যে ব্যয় করা হলো।

৬২৩ খৃস্টাব্দে বনু কায়নুকা যে কিভাবে মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়েছিল ইতিপূর্বে আমরা তা দেখেছি। এটা কৌতূহলের ব্যাপার যে, এর পর বিভিন্ন সময়ে মদীনা এবং অন্যান্য স্থানে তাদের প্রসংগ উত্থাপিত হয়েছে। প্রথমত তৃতীয় হিজরী মুতাবেক ৬২৪ খৃস্টাব্দে উহূদের যুদ্ধের সময় বনু কায়নুকা মুসলমানদের পক্ষে কুরায়শদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে এগিয়ে আসে। (ইবনে সা'দ, ২/১, পৃঃ ৩৪) অতঃপর বনু কুরায়যার সংগে মুসলমানদের যুদ্ধের

সময় তারা মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করে। (সারাখশী, মাবসুত দশম খণ্ড, পৃঃ ২৩) অবশ্য এ সব ঘটনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় না যে, তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। নিম্নের বিবরণ দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। খায়বরের যুদ্ধে বনু কায়নুকার লোকেরা মুসলমানদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করলেও (বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৫৩) অধিকৃত সম্পদে তাদের নিয়মিত কোন অংশ ছিল না। বরং তারা অমুসলিম হিসাবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের একটি অংশ পুরস্কার হিসাবে লাভ করে। তাছাড়া মুসলমানরা যখন খায়বর অবরোধ করে তখন অন্য যে সব গোত্র খায়বরের অপরাধী ভাইদের প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসেনি এবং তাদের পক্ষ অবলম্বন করেনি তাদেরকে রাসূলে করীম (সঃ) মদীনায় অবস্থানের এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

খায়বর এবং অন্যান্য স্থান প্রসংগ

১৯৬৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান পুস্তকটির যত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং তার ভাষা যাই হোক না কেন, তার সবগুলোতেই খায়বর সম্পর্কিত বিবরণ জনশ্রুতিমূলক তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে খায়বর সফর করা সম্ভব হয়নি বলে আমাকে ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। অনেকখানি সাহায্য পাওয়া গেছে কে, এস, টুইচেল প্রণীত সউদী আরবের কৃষি জরিপ রিপোর্ট থেকে। কে, এস, টুইচেল-এর লেখা ব্যক্তিগত পত্র দ্বারাও অনেকখানি উপকৃত হয়েছি। উপরন্তু খায়বর অঞ্চলের একটি খসড়া নকশাও তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। এ সব তথ্য ও প্রমাণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবে ব্যক্তিগত সফরের উপর ভিত্তি করে রচিত রিপোর্টের সংগে এর কোন তুলনা হয় না। ১৯৬১ সালে জুন মাসে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে একদিনের জন্যে আমি খায়বর সফর করি। বর্তমান সংস্করণের এই অধ্যায়টি ব্যক্তিগত সফরকালে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে।

মদীনা এবং খায়বরের উভয় স্থানই লাভা দ্বারা গঠিত সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। তবু দুটি স্থানের মধ্যে প্রচুর প্রভেদ রয়েছে। মদীনার ভূমি বিশাল বিস্তৃত ও সমতল। উটে চড়ে দৈর্ঘ্যে বা প্রস্থে এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে একদিন সফর করতে হয়। কিন্তু খায়বরে রয়েছে লাভা দিয়ে ঢাকা একটি মালভূমি। আকস্মিকভাবেই মালভূমির মধ্যভাগে নজরে পড়বে একটি গভীর

এ সড়ক দিয়ে গারী চালিয়ে
এবং হেজাজে যাওয়া যায়
লাভা দ্বারা গঠিত উচ্চ মালভূমি
ওয়াদি খায়বর
কাছুর মারহাব
আধুনিক শহর
উত্তর
বাগান সমূহ
লাভা দ্বারা গঠিত উচ্চ মালভূমি
ইয়াহুদীদের ধ্বংসাবশেষ
মদীনা ও সাদ আল-য়াসিদ
অভিমুখী পথ এবং ৫টি বাঁধ।
খায়বারের
মানচিত্র
(মানচিত্রটি জনাব কে, এম, টুইট
চেল কর্তৃক ১৯৫১ সালে অংকিত
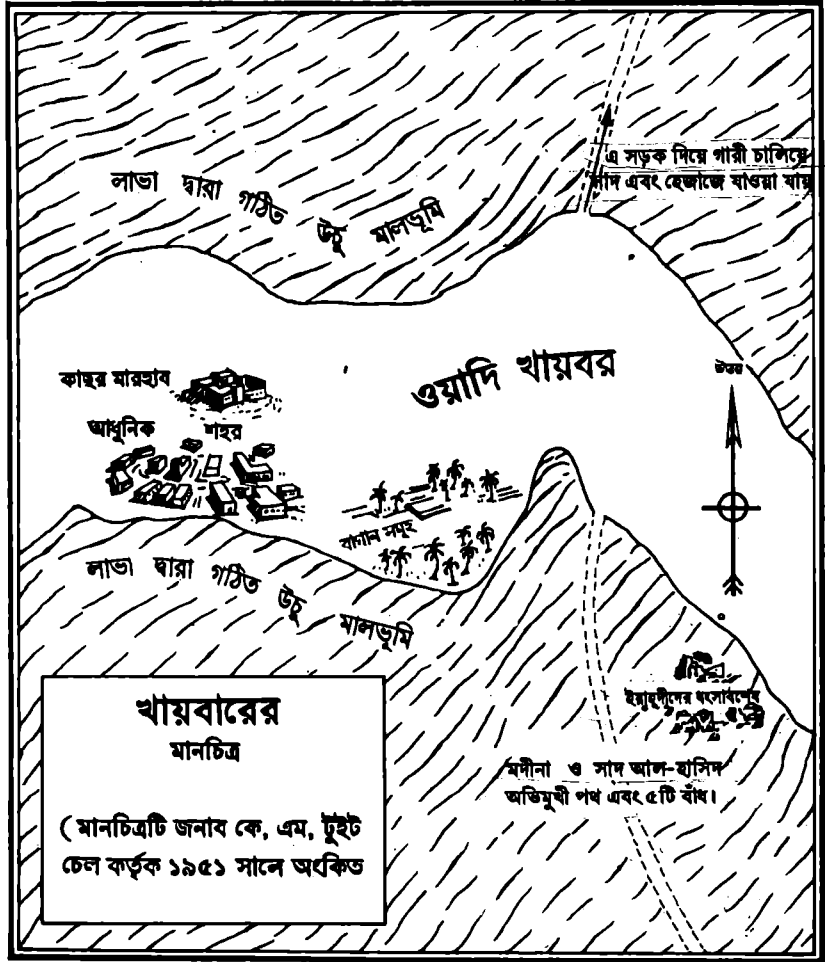
উপত্যকা। উপত্যকাটি প্রস্থে বড়জোর এক কিলোমিটার হবে। এতদঞ্চলে এটাই একমাত্র আবাদযোগ্য ভূমি।

মালভূমির একটি সমতল অঞ্চল দৈর্ঘ্যে প্রায় কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে অসংখ্য দালান-কোঠার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। যে কেউ এখানে-সেখানে কতগুলো ভূমিখণ্ড দেখতে পাবে। অতীতকালে হয়ত এগুলো চাষা-বাদ করা হতো। ভূগোলবিদ ইয়াকুত তার পুস্তকে খায়বর অঞ্চলে সাতটি দুর্গের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনে ইসহাক এবং ইবনে সাদ খুবই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মালভূমি এবং উপত্যকা উভয় স্থানেই অসংখ্য দুর্গ ছিল। ধ্বংসাবশেষগুলোই এ বক্তব্যের সত্যতার স্বাক্ষর বহন করে। ভূগোলবিদ ইয়াকুত সম্ভবত এটা বুঝতে চেয়েছিলেন যে, খায়বরে সামরিক অঞ্চলের সংখ্যা ছিল সাতটি। প্রতিটি অঞ্চলেই ছিল কতগুলো দুর্গ, আবাদী জমি এবং চারণভূমি। প্রকৃতপক্ষে মাকরিজীর এতদসংক্রান্ত বর্ণনাটি এভাবে এসেছে যে, 'নাইম দুর্গটি নাতাতে' অবস্থিত এবং সেখানে বিভিন্ন নামে আরো কতগুলো দুর্গ ছিল।

তুরস্ক, সিরিয়া এবং জর্দানের সংগে মক্কা, মদীনা, আরাফাত এবং আরও দক্ষিণাঞ্চলের স্থানগুলোর স্থলপথে সংযোগ রয়েছে। রাস্তাটি ভারী চমৎকার, পীচ দিয়ে ঢালাই করা। রাস্তাটি তাবুক ও খায়বরের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। আমরা বাদ আসর গাড়িতে চড়ে রওয়ানা হয়ে মাগরিবের নামাযের জন্যে মস্তবড় একটা গ্রামে এসে নামলাম। সেখানেই কাটিয়ে দিলাম গোটা রাত। আসলে এটা ছিল একটা উর্বর মরূদ্যান। এখানে সমতল ভূমির অর্ধেকটায় মিষ্টি পানির ব্যবস্থা বা উৎস রয়েছে। অবশিষ্টাংশের কুয়ার পানি বিস্বাদে ভরা এবং পান করার অযোগ্য। আমার অন্তরে ছিল ফাদাক আবিষ্কারের তীব্র আকাঙ্ক্ষা কিন্তু এতদঞ্চলে এ নামটি একেবারেই অপরিচিত। ফজরের নামাযের পর আবার আমাদের যাত্রা শুরু হলো। প্রায় ঘন্টা তিনেকের মাথায় আমরা পৌঁছে গেলাম খায়বরে। নতুন মোটর সড়কটি মদীনা থেকে শুরু করে উহূদকে বাম প্রান্তে রেখে বিমানবন্দর সন্নিকটস্থ 'আকুল' হ্রদের দিকে চলে গেছে। সেখান থেকে সড়কটি লাভা দ্বারা গঠিত এবং সুদূর প্রসারিত সমতলভূমি ও উপত্যকার মধ্যে প্রবেশ করেছে। এখানকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অপূর্ব এবং খুবই মনোহর। এই অঞ্চলটি অনেকটা লেবাননের মত। শুধু পার্থক্য এই যে, এখানে পানি বা সবুজ শ্যামল উদ্ভিদরাজির তেমন সমাহার নেই। এবং লাভা দ্বারা গঠিত এ সমতল ভূমি প্রায় খায়বর উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত।

মদীনা মনওয়ারা রওয়ানা হয়ে খায়বরের দিকে আসার সময় শহরে পৌঁছার ঠিক পূর্বক্ষণেই হাতের ডান দিকে একটি লম্বা রাস্তা নজরে পড়ে। এই রাস্তাটি নিয়ে যাবে অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ এবং অগণিত পানির বাঁধের কাছে। বর্তমানে পানির বাঁধগুলো জীর্ণ এবং ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় রয়েছে। হজ্জ যাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে সিরিয়া, তুরস্ক, যুগোশ্লাভিয়া এবং ফ্রান্স থেকে শত শত গাড়ি মক্কা মুয়ায্যমায় আসে। ফলে এক সময়ে যে খায়বর ছিল অবহেলিত, ম্যালেরিয়া কবলিত অঞ্চল হিসাবে যার অখ্যাতি ছিল, ক্রমান্বয়ে তা সমৃদ্ধ ও বর্ধিষ্ণুরূপ গ্রহণ করে। ফলে খায়বরের উপর ক্রমবর্ধমান শহরায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাব পড়ে। নির্মিত হয় নতুন নতুন ঘরবাড়ি। অবশ্য প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ-গুলো নির্মাণ কাজে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি। ফলে এগুলো নির্মূল করার অথবা পাথরগুলোকে পুনরায় ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়েনি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এখানে প্রাচীন দালান-কোঠার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। এগুলো কি সাধারণ ঘরবাড়ি, না দুর্গবেষ্টিত সেনানিবাস তা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে শনাক্ত করা সম্ভব নয়। এ অঞ্চলটি কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। মদীনা থেকে এ অঞ্চলের দূরত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটারের মতো। পূর্বে উটে চড়ে এ স্থানটি অতিক্রম করতে চারদিন দরকার হতো।

একটি গভীর উপত্যকা দ্বারা মালভূমিটি দু'টি অংশে বিভক্ত হওয়ার কারণে এটা স্বাভাবিক যে, এখানে অনেকগুলো ঝরনা ছিল। এই ঝরনার পানি দিয়েই তাল, খেজুর এবং অন্যান্য বাগান বা কৃষি খামারের সেচের কাজ চলতো। খায়বর সংক্রান্ত একটি প্রাচীন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এখানকার একটি খামারে খেজুর গাছের সংখ্যা ছিল ১২,০০০। এমনকি কতিবাহ নামক একটি মাত্র বাগানে ৪০,০০০ গাছ ছিল। (মাকরিজী ১, ৩২০) এখনকার বাগানের অবস্থা বিবেচনা করলেও বুঝা যায় যে, এই সংখ্যায় অতিরঞ্জনের কিছু নেই। উপত্যকার মধ্যে খেজুর বাগান পরিবেষ্টিত একটি খাড়া পাহাড় রয়েছে। অদ্যাবধি এই পাহাড়টি কাসর মারহাব নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, মারহাব ছিলেন খায়বরের প্রধান সরদারদের মধ্যে একজন। আন-নাতাত উপত্যকায় একটি দুর্গ আবিষ্কৃত হয়েছে। দুর্গের ঠিক নিম্ন ভাগেই রয়েছে একটি মসজিদ। খায়বর বিজয়ের পর রাসূলে করীম (সঃ) যে স্থানে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করেছিলেন, ঠিক সেখানেই নির্মিত হয়েছে এই মসজিদ। ইতিহাসের এই বর্ণনার সংগে সমসাময়িক কালের স্থান সম্পর্কিত বিবরণও

সংগতিপূর্ণ। এই বিরাট মসজিদটি এখনো সেখানে বিরাজ করছে। অবশ্য পাহাড়ের চূড়ায় মারহাবের দুর্গটির কোন অস্তিত্ব এখন আর নেই। সেখানে দেখা যাবে মাঝারি আকারের একটি বাড়ি। বাড়িটি বর্তমানে সউদী সরকারের দখলে রয়েছে। অবশ্য গোটা উপত্যকা অঞ্চলের মধ্যে এটিই সবচেয়ে স্বাস্থ্য-কর স্থান এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থানে অবস্থিত।

এখানে দু'টি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মালভূমির প্রান্ত সীমানায় এবং খায়বর উপত্যকার ঢালু রাস্তার ঠিক আগখানেই একটি মসজিদের ধ্বংসা-বশেষ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, এই মসজিদের সংগে জড়িয়ে আছে রাসূলে করীম (সঃ)-এর স্মৃতি। এটা খুবই যুক্তিসংগত যে, মদীনা থেকে আসার পর নবী করীম (সঃ) প্রথমে এই স্থানটি দখল করেন এবং এখানেই ছাউনি ফেলেন। কারণ, অবস্থানগত দিক থেকে এটি আধিপত্য বিস্তারের জন্যে খুবই উপযোগী। এ স্থানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এখান থেকে একজন অনায়াসেই উপত্যকার নিম্নভাগের লোকজনকে তীর বর্ষণ করে বিপর্যস্ত করতে পারে।

দ্বিতীয় বিষয়টিকে একটি যুক্তিনির্ভর অনুমান বলা যেতে পারে। পুরাতন কবরস্থানটি প্রাচীন এই মসজিদটির সন্নিকটে নয়। বরং এটি রয়েছে উপত্যকার নিম্নভাগে, শহরের প্রান্ত সীমানার অতি কাছাকাছি স্থানে। যেখানে রাস্তাটি পুনরায় মালভূমির দিকে উঠে এসে তাবুকের দিকে চলে গেছে ঠিক সেখানে। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে, মালভূমি দখল করার সময় সংঘটিত যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্ত মুসলমানদের কি হলো। তাঁদের কবরস্থানটি কি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? অথবা তাদের কি কবরস্থ করা হয়নি? যুদ্ধ শেষে তাদের সবাইকে কি এক সংগে নিয়ে আসা হয়েছে এবং বর্তমানে যেখানে কবরস্থান রয়েছে তাদের কবর দেয়া হয়েছে ঠিক সে স্থানে? যাহোক এটা খুবই স্বাভাবিক এবং যুক্তি সংগত যে, মুসলমানগণ মালভূমি বা উপত্যকার বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন সময়ে অভিযান পরিচালনা করেন। এমনকি তারা যুদ্ধ চালান একই সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে।

এবার রাসূলে করীম (সঃ)-এর আমলে ফিরে আসা যাক। আমরা দেখেছি যে, মদীনার বনু নাদির গোত্রের য়াহূদীদের বেশির ভাগই খায়বরের দিকে চলে যায়। সেখানে পৌঁছার পরপরই তারা মক্কা, গাতফান এবং অন্যান্য ইসলাম বিরোধী শক্তিকে সংগঠিত করার চেষ্টা চালায়। তারই ফলশ্রুতিতে খন্দকের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মদীনা অবরোধের সূত্রপাত ঘটে। মক্কাবাসীদের সঙ্গে হযরত

মুহাম্মদ (সঃ)-এর হুদায়বিয়ার চুক্তির ফলে খায়বরের ক্রমবর্ধমান সংকট মুকাবিলায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে অবাধ সুযোগ লাভ করেন। কারণ হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুসারে মুসলমানগণ তৃতীয় কোন পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে মক্কাবাসীরা নিরপেক্ষ থাকার ব্যাপারে উভয়পক্ষ সম্মত হয়। তদনুসারে খায়বরে অভিযানের সময় মক্কাবাসীদেরও নিরপেক্ষ থাকতে হলো। কিন্তু ফাযারা এবং গাতফান গোত্রসমূহ খায়বরে তাদের মিত্রদের সাহায্য করার জন্যে অবিচল থাকে। যখন তারা জানতে পারলো যে, রাসূলে করীম (সঃ) একটি সেনাবাহিনী নিয়ে খায়বরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, অমনি তারা চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীসহ খায়বরের দিকে ছুটে এলো। রাসূলে করীম (সঃ) তখন তাঁর কৌশল পাল্টে ফেললেন। তিনি এমনভাবে অগ্রসর হলেন যে, খায়বর যেনো তার লক্ষ্যস্থল নয় বরং তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন গাতফান এবং ফাযারা গোত্রের দিকে। খন্দকের যুদ্ধের সময় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের কারণেই যেন তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে প্রতিশোধমূলক এ অভিযান—এমনি তারা খায়বর থেকে প্রত্যার্তবন করে। পরিবার-পরিজন ও গবাদিপশুর প্রতিরক্ষাকল্পে ফিরে যায় স্বদেশে। নবী করীম (সঃ) যখন এ বিষয়ে নিশ্চিত হলেন যে, আর তারা দেশের বাইরে বেরুবে না, তখন তিনি খায়বরের বিরুদ্ধে যাত্রা শুরু করলেন।

ইতিপূর্বে তিনি গাতফান গোত্রের নিকট এ ধরনের একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, খায়বর অভিযানের সময় যদি তারা নিরপেক্ষ থাকে, তাহলে মদীনায় উৎপাদিত খেজুরের একটি ভাগ তাঁদের দিবেন। কিন্তু তখন তারা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। শামী তাঁর সীরাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, খায়বর বিজয়ের পর এই লোভী মানুষগুলো রাসূল (সঃ)-এর দরবারে এসে হাজির হয় এবং যে পরিমাণ খেজুর প্রদানের প্রস্তাব করেছিলেন তা দাবী করে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের এই অযৌক্তিক দাবী প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে বিতাড়ন করা হয়।

খায়বর অভিযান সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একদিন সকাল-বেলা খায়বরের অধিবাসীরা যখন নিত্যদিনের মত প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ক্ষেত-খামার এবং পশু চরানোর কাজে বেরিয়ে গেছে, ঠিক তখনই তারা দেখতে পায় যে, মুসলিম বাহিনী খায়বরের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা সেখান থেকে অতি দ্রুত প্রত্যাবর্তন করলো এবং প্রতিরক্ষাকল্পে তাদের দুর্গে অবস্থান নিলো।

মুসলিম ঐতিহাসিকগণের মতে প্রথমে নাঈম দুর্গ রাসূলে করীম (সঃ)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করে। সেখানে অবশ্যই একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ছিল। কারণ, বলা হয়ে থাকে যে, উপর থেকে বড় একটি পাথর মুসলিম বাহিনীর উপর নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং এই পাথরের আঘাতে একজন মুসলমান সৈন্য শাহাদাত লাভ করেন। কথিত আছে যে, স্থানীয় দুর্গগুলোর মধ্যে আবুল হুকায়ক পরিবারের কামুছ দুর্গটি ছিল সবচেয়ে বড়। নাঈম দুর্গের পরে কামুছ দূর্গ আত্ম-সমর্পণ করে। এর পরেই আসে আশ্-শিক এবং নাতাতের কথা। বলা হয়ে থাকে যে, উপত্যকার নিম্নভাগে আন-নাতাত অঞ্চলেই ছিল ইয়ামান বাসী একজন হিসাবীয়। সে হাতাহাতি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ইবনে হিশাম যুদ্ধের এই বিবরণটিকে এভাবে তুলে ধরেছেন যে, 'উশার' নামে সেখানে একটি বৃক্ষ ছিলো। বৃক্ষের ডালগুলো খুবই লম্বা এবং নিচু। বৃক্ষটি পত্র-পল্লবে এত ভরপুর ছিল দিনেও বৃক্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের মানুষ দৃষ্টিগোচর হতো না। মারা-হাব এবং তার মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বী হযরত আলী (রাঃ) অবিরাম গাছের চারপাশে ঘুরে ঘুরে একে অপরের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকেন। এবং একজনে যখন অন্যজনকে আঘাত করেন, তখন প্রতি আঘাতে গাছের একটি করে ডাল কেটে যায়। অবশেষে বৃক্ষের কাণ্ডটি অবশিষ্ট থাকে। এভাবেই দ্বৈত যুদ্ধ চলে আসে সমাপ্তির পর্যায়ে এবং ধরাশায়ী হলো মারহাব। তৎক্ষণাৎ মারহাবের ভ্রাতা ইয়াসির মুসলিম বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে দ্বৈত যুদ্ধের জন্যে অগ্রসর হলো। কিন্তু সেও অল্প সময়ের মধ্যে একজন মুসলমানের হাতে ধরাশায়ী হলো। প্রাচীন বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, ইয়াসির ছিল দার-বানী-কিসামাহ (বর্তমানে অপরিচিত)-এর স্বত্বাধিকারী। এটা স্পষ্ট যে, দার-বানী কিসামাহ ছিল একটি গোলাঘর এবং খাদ্য-সামগ্রীর একটি দোকান। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, দীর্ঘ অভিযানের ফলে মুসলিম বাহিনী যে সংকটের মধ্যে পরেছিলো, গোলাঘর বা খাদ্য গুদামটি দখলে আসায় তাদের সে অভাব কেটে যায়।

এর পরেই আস-আল কাতিবাহ-এর আত্মসমর্পণের পালা। সবশেষে পতন ঘটে আল ওয়াতেহ এবং আস মুসালিম দুর্গের। এজন্যে দুর্গ দুটিকে প্রায় দু'-সপ্তাহ যাবত অবরোধ করে রাখতে হয়েছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, খায়বরের প্রতিরক্ষাদলকে যখন একটি দুর্গ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হতো, তখন তারা আরেকটি দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিতো এবং সেখানে বসেই তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতো।

ইতিহাস গ্রন্থে অন্যান্য দুর্গ সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়েছে। মদীনা থেকে আসার সময় মালভূমির উপর প্রথমেই দেখা যাবে ওয়াজদাহ-এর দুর্গ। আস-সা'ব দুর্গটি ছিল যুবায়ের নামক এক য়াহূদীর অধীনে। ঐতিহাসিক শামীর মতে (সীরাহ ঃ খায়বর অধ্যায়) এই দুর্গের একটি ভূগর্ভস্থ গুপ্ত পথ ছিল। এ পথে দুর্গের অভ্যন্তরভাগের সংগে মালভূমির সীমান্তের একটি সংযোগ ছিল। স্থানীয় এক য়াহূদীর নিকট থেকে রাসূলে করীম (সঃ) এই গুপ্তপথ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন এবং অতি সহজে দুর্গটি দখল করার পর তিনি তাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেন। এমনকি পরবর্তী সময়ে অন্যান্য য়াহূদী মহিলার সংগে সেই য়াহূদীর স্ত্রী বন্দী হলেও তাকে তার স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দেন। (মাকরিযী ১, ৩১২) বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, কতগুলো দুর্গে পাথর ছোঁড়া কামান (মানজানিক) ছিলো। এগুলো দিয়ে অবরোধকারীদের উপর পাথর ছোঁড়া হতো। অবশ্য এ অভিযানের সময় ওগুলো খুব কমই কাজে লেগেছিলো। মাকরিযী উল্লেখ (১,৩১২) করেছেন যে, নাতাত অঞ্চলে একটি দুর্গ দখল করার সময় এ ধরনের একটি অস্ত্র মুসলমানদের দখলে আসে এবং নিয়ার দুর্গটি দখল করার সময় মুসলমানগণ এটি প্রয়োগ করেন। খাড়া পাহাড়ের যে শৃংগের উপর মার-হাবের দুর্গটি ছিলো তা সরেযমীনে পরিদর্শন করার পর ঐতিহাসিকগণের বর্ণনার সংগে আমার দৃঢ় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এই দুর্গটি দখল করার সময় তুমুল লড়াই হয়েছিলো। হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন এ যুদ্ধের অনন্য সাধারণ বিজয়ী বীর। কোন ঐতি-হাসিকই একথা উল্লেখ করতে ভুলেননি যে, যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের তীর বৃষ্টি, পাথর ও অন্যসব আক্রমণ থেকে নিজেকে প্রতিরক্ষার জন্যে হযরত আলী (রাঃ) দরজার একটি বিশাল পাল্লা ব্যবহার করেছিলেন। স্থানীয় একটি দুর্গের দরজা থেকে তিনি পাল্লাটি খুলে নিয়েছিলেন। কাসর মারহাব যখন মুসল-মানদের দখলে এলো তখন তিনি পাল্লাটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অথচ পাল্লাটি এত ভারী ছিল যে, আটজনে মিলেও পাল্লাটি উঠাতে পারেনি। পরবর্তীতে বীরোচিত এই অপূর্ব কাজটি পৌরানিক কাহিনীতেও রূপান্তরিত হয়। যারা সম্মিলিতভাবে পাল্লাটি জাগাতে পারেনি তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে যদি ৪০ এমনকি ৭০-এ উন্নীত করা হয়, তাহলেও এতে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে একদিন একজন মেষপালক খায়বর থেকে রাসূলে করীম (সঃ)-এর নিকট আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। বস্তুত পক্ষে সে ছিল একজন কালো ক্রীতদাস। ইবনে হিশাম (পৃঃ ৬৬৯-৬৭০) উল্লেখ করেছেন

যে, রাসূলে করীম (সঃ) তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, 'মেষপালকে তোমার য়াহূদী মালিকের নিকট ফিরিয়ে দাও। কারণ ইসলামে আমানত খেয়ানতের অনুমোদন নেই।' মেষপালক তখন মেষ ও ছাগলগুলোকে তাঁর মালিকের দুর্গের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যান। ঠিক দুর্গের কাছাকাছি আসতেই তিনি কৌশলে মেষ ও ছাগলগুলোকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলেন। ফলে স্বভাবগতভাবেই ওগুলো খোঁয়াড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। অতঃপর সেই কালো ক্রীতদাস একজন মুক্ত মানুষ হিসাবে মুসলিম শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর নাম ইয়াসার (মাকরিযী, ১, ৩১২-৩)। অল্প সময়ের কথোপকথনের পরই তিনি অত্যন্ত উৎসাহ ও আগ্রহের সংগে খায়বরবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন এবং এই যুদ্ধে তিনি শহীদের মর্যাদা লাভ করেন।

মাকরিযী তাঁর ইমতা (১, ৩২৫) গ্রন্থে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে রাসূলে করীম (সঃ)-এর চমৎকার একটি কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, য়াহূদীদের প্রতিরোধের অবসান এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তাদের নিকট থেকে আটককৃত বাইবেলের সমস্ত কপি পুনরায় তাদের নিকট ফিরিয়ে দেন।

ঐতিহাসিকগণের বর্ণনামতে খায়বর অভিযানে ১৬০০ সৈন্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিলো মুসলিম বাহিনী। ইবনে হিশাম এবং ইবনে সা'দ-এর বর্ণনা মতে তাদের অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল দুই শত। অবশ্য অন্য একটি বর্ণনায় ইবনে সাদ অশ্বারোহীর সৈন্যসংখ্যা ১০০ বলে উল্লেখ করেছেন। মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা যাই হোক না কেন (আল-ইয়াকুবীর দ্বিতীয় খণ্ড ৫৬) শত্রুপক্ষ এ যুদ্ধে ২০ হাজার সৈন্য সমাবেশ করেছিল। অবশ্য মাকরিযীর (১, ৩১০) বর্ণনা অনুসারে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১০,০০০। সৈন্য সংখ্যা ছাড়াও এ যুদ্ধে তাদের একটি বাড়তি সুবিধাও ছিল। তা হলো দুর্গের অভ্যান্তরভাগে থেকে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ। ইবনে সাদ উল্লেখ করেছেন যে—এই যুদ্ধে সর্বসাকল্যে মুসলিম বাহিনীর ১৫ জন শহীদ হন এবং খায়বরবাসীদের পক্ষে নিহত হয় ৯৩ জন।

কোন অঞ্চলকে ইসলামী রাষ্ট্রের সংগে সংযোজনের পর মুসলিম সরকারের এটা প্রাথমিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে, তাঁরা কেবলমাত্র নতুন নাগরিকদের ন্যায়সংগত স্বার্থ সংরক্ষণ করবে না, বরং তাদের অব্যাহত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা

দেবে। বলা বাহুল্য, মুসলিম শাসকগণ যত্নের সংগে এ দায়িত্ব যে পালন করেছেন তা নিম্নের বিবরণ দেখলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মদীনার বনু নাদিরের য়াহূদীদের একটি পৌর ট্রেজারী বা খাজাঞ্চিখানা ছিল। যুদ্ধ, রক্ত মূল্য এবং এ জাতীয় সাধারণ ও অপ্রত্যাশিত সংকট নিরসনের জন্যে এই অর্থ ব্যবহৃত হতো। বনু নাদির গোত্রের য়াহূদীরা যখন মদীনা ছেড়ে চলে যায় এবং খায়বর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে, তখন তারা এই ট্রেজারীকে সেখানে স্থানান্তর করে। খন্দক অবরোধের সময় এ সব য়াহূদীর ভূমিকা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সে কারণেই খায়বর দখলের পর হযরত রাসূলে করীম (সঃ) নতুন সরকার বা পৌর বিভাগের উপর সেই ট্রেজারীর হস্তান্তর দাবি করেন। য়াহূদী গোত্রের সবচেয়ে বয়স্ক অভিভাবক শপথ করে বললেন যে, উক্ত তহবিলের সমুদয় অর্থই যুদ্ধের সময় নিঃশেষ হয়ে গেছে। রাসূলে করীম (সঃ) উত্তরে বললেন—আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যদি দেখা যায় যে, আপনি মিথ্যা বলেছেন, তাহলে আপনি বেঁচে থাকারও নিরাপত্তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, পরবর্তীতে একজন স্থানীয় য়াহূদীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ট্রেজারীটি উদ্ধার করা হয়েছিল এবং তাকে ভোগ করতে হয়েছিল তারই স্বাভাবিক পরিণতি। মাকরিযী (১, ৩২০) উটের চামড়া দিয়ে তৈরি ব্যাগ ভর্তি মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাছাড়া শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে গোপন কথা ফাঁস করার প্রক্রিয়া পদ্ধতির অনুমোদন যোগ্যতা বলতে কি বুঝায়, এর ব্যাপকতা কতটুকু—সে সম্পর্কেও বিবরণ দিয়েছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ধ্বংসস্তুপের মাঝে লুকিয়ে রাখা কোষাগার আবিষ্কার করার পর প্রিয় নবী (সঃ) তাদের অন্যান্য গুপ্ত সামগ্রী খুঁজে বের করার উদ্যোগ নেন এবং তাদেরকে হালকা শাস্তি দেওয়ার পর আরও কিছু সম্পদ উদ্ধার করতে সমর্থ হন।

খায়বর অভিযানের উপর সবচেয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় মাকরিযীর রচিত 'ইমতা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে। এখানে কেবল মাত্র সমর সম্পর্কিত বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো। রাসূলে করীম (সঃ) মদীনা থেকে এসে প্রথমে নাতাত অঞ্চল আক্রমণ করলেন। প্রায় দশ দিন অতিবাহিত হলো। তবু তিনি সেখানে শিবির স্থাপন করলেন না। তিনি শিবির স্থাপন করলেন আর-রাজি নামক অধিকতর নিরাপদ এবং দূরবর্তী একটি অঞ্চলে। সেখানে তিনি

রাত যাপন করতেন, নাতাতে আসতেন শুধুমাত্র দিনের বেলায়। (পৃঃ ৩১১, ৩১২, ৩১৬)

অভিযানের শুরু থেকেই রাসূলে করীম (সঃ) আধ-কপালের শিরঃ পীড়ায় ভুগছিলেন। (পৃঃ ৩১১) খায়বর অভিযানে মুসলিম বাহিনীর সংকেত ধ্বনি ছিলো 'ইয়া মানসুর আমিত' অর্থাৎ হে বিজয়ী, মৃত্যুকে নিয়ে এসো। এখানকার মরূদ্যান ছিলো খুবই ঘন ও গভীর গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ। শত্রুর সংগে যুদ্ধ করার সুবিধার্থে তিনি বেশ কিছু তাল ও খেজুর গাছ কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার তিনি গাছগুলো বিনষ্ট করতে বারণ করেন। (পৃঃ ৩১১)

সেনাবাহিনীতে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। যুদ্ধের প্রথম দিনে প্রায় ৫০ জন মুসলমান সৈন্যের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। (পৃঃ ৩১২) সেনাবাহিনীতে ২০ জন মহিলা ছিলেন। অবশ্য তাঁরা কাজ করতেন সেবিকা হিসাবে। তাঁদের মধ্যে একজন অভিযান চলাকালীন সময়ে একটি সন্তান প্রসব করেন। (পৃঃ ৩২৬-৩২৭)

য়াহূদীরা তাদের মহিলা এবং শিশুদেরকে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তর করে। কিন্তু এস্থানটি যখন মুসলমানদের দখলে আসে তখন দু'হাজারেরও বেশি মহিলা ও শিশু যুদ্ধবন্দী হিসাবে মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়। (পৃঃ ৩১৯) শিকক অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের পর রাসূলে করীম (সঃ) আর-রাজি থেকে সেখানে শিবির স্থানান্তর করেন। নাতাত অঞ্চলের নাঈম নামক দুর্গটি অবরোধ করার সময় রাসূলে করীম (সঃ) একটির উপর আরেকটি বর্ম অর্থাৎ দুটি বর্ম পরিধান করেন। মাথায় ছিল একটি মিগফার এবং একটি বাইদাহ (শিরস্ত্রাণ জাতীয় আচ্ছাদন)। তাঁর সংগে ছিল একটি বর্শা ও একটি বর্ম। (পৃঃ ৩১৯)

যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে মুসলিম বাহিনীর খাদ্য-সামগ্রী নিঃশেষ হয়ে আসে। অমনি শুরু হয় মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট। একদিন তাঁরা তাঁদের দুটো ঘোড়া জবাই করে খেলেন। (পৃঃ ৩১৭) আরেকদিন আস-সাব দুর্গ থেকে প্রায় ২০/৩০টি গাধা বেরিয়ে পড়ে। মুসলমানরা গাধাগুলো ধরে ফেললেন। তারা গাধাগুলোকে জবাই করলেন এবং রান্না করার জন্যে আগুন জ্বালালেন। ঘটনাক্রমে রাসূলে করীম (সঃ) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং এই বলে একটি সাধারণ ঘোষণা দিলেন যে, সাময়িক বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে বিয়ে করা যেমন

নিষিদ্ধ, তেমনিভাবে গৃহ পালিত গাধা খাওয়াও নিষিদ্ধ। (পৃঃ ৩১৭) অবশেষে দুর্গটি যখন মুসলমানদের পদানত হলো, তখন একজন যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে পরিধেয় বস্ত্র ও মদও দেখতে পেল। (পৃঃ ৩১৯) আস-সাব-এর পরে নাতাত অঞ্চলে আজ-যুবায়ের ছিল সর্বশেষ দুর্গ। তিন দিন অবরোধ করে রাখার পর রাসূলে করীম (সঃ) দুর্গটি দখল করেন। (পৃঃ ৩১৯) কাতিবাহ দুর্গ দখল করার জন্যে দুর্গটিকে দুই সপ্তাহ অবরোধ করে রাখতে হলো। (পৃঃ ৩১৯) এটা সেই দুর্গ যার চারপাশে প্রায় ৪০ হাজার খেজুর ও তালগাছ ছিল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে একজনে পাঁচশ তীর, একশ বর্শা, চারশ তলোয়ার এবং এক হাজার বর্শা দেখতে পেল। (পৃঃ ৩২০) অন্য দুর্গগুলোরও ছিল একই অবস্থা। আস-সাব দুর্গ দখলের পর একটি মানজানিক (পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র), অনেকগুলো যুদ্ধরথ, খাদ্য-সামগ্রী, মদ, কাপড়, ভেড়া ও ছাগল, গরু, খচ্চর ইত্যাদি (পৃঃ ৩১৮-১৯) পাওয়া গেল। যুদ্ধের সময় যে ১৫ জন মুসলমান শহীদ হন, তাঁদের মধ্যে ৪ জন মুহাজির এবং ১১ জন আনসার (পৃঃ ৩২৯) শহীদ হলেন। মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৪০০। তাদের সংগে ঘোড়া ছিল ২০০। খায়বরের যুদ্ধের সময় এ বিধান জারি করা হলো যে—অশ্বারোহীকে অশ্বের খাদ্য-খাবার বাবদ ব্যয়ভার বহন করতে হয়, তাই যুদ্ধলব্ধ সম্পদে সে দ্বিগুণ অংশ পাবে। যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী বিলিবন্টনের ক্ষেত্রে প্রথমে সমস্ত সম্পদ ১৮টি ভাগে বিভক্ত করা হলো। অতঃপর সমস্ত সম্পদ ন্যস্ত করা হলো দলপতিদের উপর। তাদের প্রত্যেকে প্রায় ১০০ জন লোকের মধ্যে এগুলো বিলিবন্টনের ব্যবস্থা নিলেন। (পৃঃ ৩২৭) একজন য়াহূদী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। রাসূলে করীম (সঃ) নির্দেশ দিলেন যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে প্রাপ্ত গৃহপালিত সমস্ত মেষ ও ছাগল এই ব্যক্তি পাবে। (পৃঃ ৩২৯) স্পষ্টতই এখানে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে সরকারের অংশের প্রসংগটি এসে যায়—মোট যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ যাবে সরকারের বায়তুল মালে, অবশিষ্ট চার ভাগ বিলিবন্টন করা হবে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যগণের মধ্যে। মহিলাগণ যুদ্ধে অংশ নিলেও তারা নিয়মিত কোন অংশ পাবেন না। অবশ্য তারা উল্লেখযোগ্য উপহার-উপঢৌকন পাবেন।

খায়বর বাসীরা মূলত এ শর্তের ভিত্তিতে আত্মসমর্পণ করে যে, রাসূলে করীম (সঃ) তাদেরকে প্রাণে মারবেন না এবং তারা এক কাপড়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবে। যাহোক পরবর্তীতে নবীজী তাদেরকে সরকারের ঠিকাদার হিসাবে পূর্বের ঘর বাড়িতে থেকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তারা জমিজমা আবাদের ক্ষেত্রে অংশীদার হিসাবে কাজ করবে এবং জমিতে উৎপাদিত ফসলাদি সর-

কারের সংগে আধাআধি ভাগে ভাগ করে নিবে। রাষ্ট্র যে পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তের পরিবর্তন না করবে ততদিন পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকবে। পরবর্তী বছর-গুলোতে খায়বরের য়াহূদীরা মুসলিম প্রশাসন সম্পর্কে চমৎকার একটি অভি-জ্ঞতা অর্জন করে এবং বলতে থাকে যে, এ ধরনের ন্যায় বিচারের জন্যেই পৃথিবী বেহেশতে পরিণত হয়েছে। এর কোন পতন নেই। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান খাজনা আদায়কারীরা এই নীতি অনুসরণ করত যে, তারা উৎপাদিত ফসলকে দুটো সমান স্তরে বিভক্ত করতো। এই দুটো অংশের মধ্যে য়াহূদীদের পছন্দা-নুসারে যে কোন একটিকে নির্বাচন ও গ্রহণ করার অবাধ সুযোগ দিত।

অপর য়াহূদী সম্প্রদায়

তায়মা, ওয়াদি আল-কুরা এবং ফাদাকে কোন যুদ্ধ হয়নি। হলেও তা ছিল খুবই সামান্য। খায়বরবাসীরা যে শর্তে আত্মসমর্পণ করেছিল এ সব অঞ্চলের য়াহূদীরা এই একই শর্তে আত্মসমর্পণ করে। তায়মাতেই ছিল সামুয়েল ইবনে আদিয়া নামক প্রসিদ্ধ একটি দুর্গ। যে অভিযানের ফলশ্রুতিতে তায়মা মুসলিম বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করলো, সে অভিযান সম্পর্কে আমরা খুব বেশি একটা জানি না।

বছর দুয়েক পরে নবম হিজরীতে (৬৩০ খৃস্টাব্দ) তাবূক অভিযানের সময় বেশ কিছু সংখ্যক য়াহূদী অধ্যুষিত শহর আত্মসমর্পণ করে। এর মধ্যে ছিল আকাবা উপসাগরের তীরবর্তী শহর 'মকনা'। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গেলে এ সব গ্রাম সম্পর্কে উল্লেখ করার মতো কিছুই নেই। শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, এ সব গ্রাম ছিল য়াহূদী বসতিপূর্ণ।

অধ্যায় ৮

রাসূলে করীম (সঃ)-এর আমলে সামরিক গোয়েন্দা কার্যক্রম

পূর্বাভাস

রাসূলে করীম (সঃ)-এর আমলে বিভিন্ন অভিযানে মুসলিম বাহিনীর উপর্যুপরি বিজয় ঘটেছে অতি দ্রুততার সাথে, বলতে গেলে রক্তপাতহীনভাবে। ইতিহাসে এর পরিপূর্ণতা এসেছে কেবলমাত্র বিজয়ের গভীরতা এবং বিজিতদের মন-মানসিকতার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। রাসূলে করীম (সঃ) তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন ছোট নগর-রাষ্ট্র মদীনার একটি অংশে। সমগ্র আরব উপকূল জুড়ে তখন বিরাজ করছিল অরাজকতা, রাজনৈতিক বিশৃংখলা এবং জাতিগত বিবাদের বিভীষিকা। অথচ একটি দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই এই ছোট শহর মদীনা ৩০ লক্ষ বর্গ মাইল বিশিষ্ট একটি বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হলো। এই সাম্রাজ্যটি ছিল মূল রাশিয়াকে বাদ দিয়ে সমগ্র ইউরোপের সমান। সাম্রাজ্যের সর্বত্র তখন বিরাজ করছিল পূর্ণ শান্তি ও শৃংখলা।

অবিশ্বাস্য রকমের এই সাফল্য অর্জনের জন্যে নবী করীম (সঃ)-এর গোয়েন্দা তৎপরতাকে কোনক্রমেই খাটো করে দেখা যায় না। কলাকৌশলের শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা তিনি অনায়াসেই শত্রুপক্ষকে পরাভূত করতেন। শত্রু সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করে একান্ত অতর্কিতভাবে এবং শত্রুর অজ্ঞাতসারেই তাদের নিয়ে আসতেন নিজের আয়ত্তের মধ্যে।

ইতিপূর্বে এ বিষয়টির উপর কোন রকম আলোকপাত করা হয়েছে বলে মনে হয় না। সে কারণেই শিশু রাষ্ট্র মদীনায় তিনি যে কিভাবে এই তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা এবং গোয়েন্দা ও পাল্টা গোয়েন্দা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার আনুপুংখ বর্ণন করা সম্ভব নয়। যাহোক এখানে আমি এতদসংক্রান্ত তথ্যাবলী এবং কর্ম প্রক্রিয়া তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হিজরতের এক মাস পূর্বে হজ্জ মৌসুমে মীনা প্রান্তরে যখন আকাবার তৃতীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়, ঠিক তখনই ইসলামী রাষ্ট্রের পত্তন ঘটে। রাসূলে করীম (সঃ)-এর নেতৃত্বে ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার উদ্ভব হয় এ সময় থেকেই। রাসূলে করীম (সঃ)-এর সংগে মদীনার ৭২ জন মুসলমানের এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। তাদের মধ্যে দু'জন ছিলেন মহিলা। তারা সকলেই এ বিষয়ে শপথ গ্রহণ করেন যে, যদি তিনি তাঁর সহচরগণসহ মদীনায় হিজরত করেন, তাহলে তারা ভালমন্দ সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করবেন ও তাঁকে মেনে চলবেন। সাদা-কালো সকলের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেবেন, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনকে তারা যেভাবে রক্ষা করেন অনুরূপভাবে রাসূলে করীম (সঃ) এবং তার মক্কার সহচর-গণকেও রক্ষা করবেন। অবিলম্বে এই সামাজিক চুক্তির বাস্তবায়ন করা হলো, প্রতিষ্ঠিত হলো একটি নতুন সমাজ। মক্কার মুসলমানগণ হিজরত করে দলে দলে চলে এলেন এই নতুন আশ্রয় স্থলে। আকাবা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তখনো তিন মাস অতিক্রান্ত হয়নি। এরমধ্যে মক্কার অমুসলিমরা তাদেরই স্বদেশবাসী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু করে। বস্তুতঃপক্ষে এটা ছিল তাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। ইবনে হিশাম আকাবার চুক্তিকে যুদ্ধ চুক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৩০৪-৫) এখান থেকেই আমাদের মূল বর্ণনা শুরু।

হিজরতের সময়ে গোয়েন্দা কার্যক্রম

নগর-রাষ্ট্র মক্কার সমাজ ছিল গোত্রকেন্দ্রিক। হত্যাকারী এককভাবে হত্যা করলেও নিহত ব্যক্তি যে গোত্রের সদস্য, সে গোত্রের আক্রোশের মুখে সে (হত্যাকারী) তার সমগ্র গোত্রকেই বিপন্ন করে তুলতো। তাছাড়া মক্কার বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্পাদিত হতো সামরিক চুক্তি। এই চুক্তিগুলো সংশ্লিষ্ট গোত্র-গুলোর নিরাপত্তাকে আরও বাড়িয়ে দিত। সে কারণেই মক্কার অমুসলিমরা সিদ্ধান্ত নিল যে, প্রতিটি গোত্রের এক একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত একটি দলের উপর ন্যস্ত করা হবে রাসূলে করীম (সঃ)-কে হত্যার দায়িত্ব। ষড়যন্ত্রটি অভীষ্ট ফলদানে সক্ষম ছিল। কিন্তু সুবিন্যস্ত নহে। স্পষ্টভাবে এর প্রকৃতি এর গোপনীয়তা ফাঁস করে দিল এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সময় মত জানতে পারলেন এবং পলায়ন করে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে সমর্থ হলেন।

মক্কা নগরীতে রাসূলে করীম (সঃ)-এর বিন্দুমাত্র নিরাপত্তা ছিল না। তিনি কেবলমাত্র এ অপেক্ষায় ছিলেন যে, সহকর্মী মুসলমানদের স্বদেশ ছেড়ে মদীনায় চলে যাওয়ার পরই তিনি মদীনার উদ্দেশে পাড়ি জমাবেন। এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে নবী চরিত্রের একটি মহত বৈশিষ্ট্য। আকাবার চুক্তি সম্পাদনের পর পরই যদি তিনি মক্কা ছেড়ে চলে যেতেন, তাহলে মক্কায় অবস্থানরত মুসলমানদেরকে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো। কারণ বর্তমান সময়ে চরমপন্থী বলে পরিচিত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শাসকগণের চেয়ে মক্কাবাসীরা কোন অংশেই ভাল ছিল না। যাহোক, মক্কার মুসলমান-গণের অনবরত স্বদেশ ছেড়ে মদীনা চলে যাওয়ার কারণে দিনে দিনে তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ভীষণভাবে হুমকির সম্মুখীন হতে থাকে। তবু তিনি পুরুষোচিত প্রস্থানের চেয়ে এই হুমকিকেই অধিকতর পছন্দ করলেন।

বস্তুতঃপক্ষে ততদিনে সব মুসলমান মক্কা প্রস্থান করেন। এদিকে মক্কার কাফির-মুশরিকরাও রাসূলে করীম (সঃ)-কে হত্যার ফন্দি আঁটে। এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে রাসূলে করীম (সঃ) যে সিদ্ধান্ত দুদিন পূর্বে বা পরে নিতেন, তিনি তা এ সময়ে গ্রহণ করলেন।

তিনি আরেকটি ঝুঁকি নিলেন ঃ তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে তাঁর পরিবর্তে তাঁর জায়গায় রাতে ঘুমিয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন। বাইরে অপেক্ষ-মাণ হত্যাকারীদের অন্তরে যাতে কোন দ্বিধা-সংশয় না জাগে, সেজন্যে তিনি এ ব্যবস্থা নিলেন। রাসূলে করীম (সঃ)-এর সাথে মক্কাবাসীদের চরম শত্রুতা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন তাদের পরম বিশ্বাসভাজন। তারা তাদের বিষয়-সামগ্রীগুলো নিশ্চিন্তে নবীজীর কাছে মওজুদ রাখতো। রাসূলে করীম (সঃ) মক্কা ছেড়ে চলে গেলেও প্রকৃত মালিকদের নিকট তাদের গচ্ছিত সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করলেন হযরত আলী (রাঃ)-এর উপর এবং এভাবেই তিনি তাঁর মহান চরিত্রের আরেকটি স্বাক্ষর রেখে গেলেন।

এটা স্পষ্ট যে, দুপুর বেলা তিনি কুরায়শ মুশরিকদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে পারেন। অমনি তিনি চলে গেলেন তাঁর বন্ধু এবং চির জীবনের সংগী হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে। সেখানে বসেই শহর পরিত্যাগ, শহরের বাইরে সওর গুহায় আত্মগোপন, একজন পথ-প্রদর্শক নিয়োগ, উত্তেজনা প্রশ-মনের জন্যে তিন দিন সেখানে অবস্থান, অবশেষে অপ্রচলিত একটি পথ ধরে মদীনার দিকে অগ্রসর হওয়ার সব আয়োজন সম্পন্ন করেন। অতঃপর

তিনি ফিরে এলেন নিজের গৃহে। সেখানেই অবস্থান করলেন শেষ রাত অবধি। এটি ছিল চান্দ্র মাসের শেষের দিকের কোন এক রাত। নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে তিনি গৃহ ছাড়লেন, শত্রু পক্ষের অবরোধ অতিক্রম করে পূর্ব ব্যবস্থা অনুসারে তিনি পেঁৗছে গেলেন সওর গুহায়। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৩২৫-৬, বালাযুরী, আনসাব, ১/২৬১)।

কথিত আছে যে, রূকায়কা বিনতে আবি সায়ফি ইবনে হাশিম নাম্নী এক মহিলা নবীজীকে তাঁর গৃহে অবরোধের কথা বলে দিয়েছিল। এ মহিলা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর একজন চাচী। সে এই বলে খবর দিয়েছিল যে, আজ রাতে তারা তোমাকে তোমার শয্যায় হত্যা করবে। (ইবনে সাদ ৮/৭৫)

এখানে ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা আমাদের লক্ষ্য নয়। তাছাড়া এ ইতিহাস সকলেরই ভালভাবে জানা আছে। এখানে আমরা কেবলমাত্র গোয়েন্দা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য এবং পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করবো।

হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর ছোট ছেলে পরের দিন রাতে গুহায় এলেন, দিনের বেলা শহরে যা কিছু ঘটেছে, তাঁদেরকে সবিস্তারে তা জানিয়ে দিলেন। তিনি রাত কাটালেন সওর গুহায়। খুব ভোরে গুহা ছেড়ে চলে গেলেন। মক্কায় কাটিয়ে দিলেন সারাটা দিন, গভীর রাতে আবার চলে আসেন সওর গুহায়। এভাবেই কেটে গেল সওর গুহায় অবস্থানের তিনটি দিন। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর এক কন্যা নিয়ে আসতেন খাদ্য-খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

এভাবেই রাসূলে করীম (সঃ) মক্কার কাফির-মুশরিকদের গোয়েন্দা তৎপরতাকে ব্যর্থ করে দিলেন।

বদর যুদ্ধের সময় গোয়েন্দা কার্যক্রম

রাসূলে করীম (সঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) হিজরত করেননি। তখনো তিনি মক্কায় অবস্থান করছিলেন। সম্ভবত একজন ব্যবসায়ী এবং ব্যাংকার হিসাবে তায়েফ এবং মদীনাসহ বিভিন্ন স্থানের সংগে ছিল তার ব্যাপক যোগাযোগ। তিনি সব সময় রাসূলে করীম (সঃ)-কে চিঠি লিখতেন। তাঁকে অবগত করতেন মক্কার ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে। নিম্নে উল্লেখিত ইবনে সাদের উদ্ধৃতি থেকেই এর স্বাক্ষর পাওয়া যায়। কুরায়শ বাণিজ্য কাফেলা যখন সিরিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করে, তখন রাসূলে করীম (সঃ) মক্কা হতেই কাফেলার গতি-

বিধি সম্পর্কে জানতে পারেন এবং কাফেলার গতিরোধ করার জন্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। (ইবনে সাদ ২/১, পৃঃ ৪) অন্যত্র উল্লেখ আছে যে, রাসূলে করীম (সঃ) মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে ইয়ানবু বন্দরের পথ ধরে সুদূর যুল উশায়রা পর্যন্ত যান। অতঃপর সিরিয়া পর্যন্ত এই বাণিজ্য কাফেলাকে অনুসরণ করার জন্যে দু'জন গুপ্তচর পাঠিয়ে দেন। এরা ছিলেন হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ (রাঃ) এবং সাইদ ইবনে যায়েদ (রাঃ)। তাদের বলে দিলেন যে, বাণিজ্য কাফেলা যেখানে যাবে, যেখানে থাকবে, তাঁরাও সেখানে যাবেন এবং অবস্থান করবেন এবং রাসূলে করীম (সাঃ)-কে অবহিত করবেন তাদের প্রত্যাবর্তনের সময় সম্পর্কে। তাঁরা তাই করলেন। কিন্তু যখন তাঁরা মদীনায় ফিরে এলেন তখন দেখলেন প্রিয়নবী (সঃ)-এর নিকট অন্যান্য সূত্রের মাধ্যমে বাণিজ্য কাফেলার উপস্থিতির খবর পৌঁছে গেছে। ততক্ষণে তিনি শহর থেকে রওয়ানা হয়ে গেছেন।

বাণিজ্য কাফেলা উত্তরের শহর সিরিয়া থেকে আসছিল। মক্কা ছিল তাদের গন্তব্যস্থল। কিন্তু উত্তর দিকে না গিয়ে রাসূল (সঃ) রওয়ানা হলেন দক্ষিণে মক্কার পথ ধরে বদরের দিকে। এটা স্পষ্ট যে, সময় মত বাণিজ্য কাফেলাকে ধরার জন্যে এটাই ছিল নিশ্চিত পথ। তাছাড়া উন্মুক্ত ও সমতল প্রান্তর অপেক্ষা বদরের পার্বত্য অঞ্চলে শত্রুকে কাবু করা অধিকতর সহজ ছিল।

রাসূলে করীম (সঃ) বদরের উদ্দেশে মদীনা ত্যাগ করার সময় সেখানে বাসবাস এবং আদী নামে আগাম দুজন গুপ্তচর পাঠিয়ে দিলেন। শত্রু পক্ষের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল এঁদের কাজ। (ইবনে সাদ ২/১, পৃঃ ৭)

পথিমধ্যে শত্রু সম্পর্কে সঠিক সংবাদ পাওয়ার জন্যে তিনি সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। (তাবারী ১,১৩০২) দেখা গেছে যে, কখনো কখনো তিনি বাহিনী ছেড়ে দূরে চলে গিয়েছেন। ঘুরে বেড়িয়েছেন পার্বত্য পথে। একবার তিনি একজন বুড়ো লোকের সাক্ষাৎ পান এবং বাণিজ্য কাফেলা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করেন। বুড়ো লোকটি জবাবে বললো, বাণিজ্য কাফেলা সম্পর্কে সে জানে। তবে প্রশ্নকর্তার পরিচয় কি এবং কোথা থেকে সে এসেছে এ বিষয়ে না জানা পর্যন্ত সে কোন জবাব দেবে না।

রাসূলে করীম (সঃ) বুড়োকে কথা দিলেন। তখন বৃদ্ধ বেদুঈন বলল, তার জানামতে বাণিজ্য কাফেলাটি অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক জায়গায় ছিল।

যে তাকে সংবাদটি দিয়েছে সে যদি মিথ্যা না বলে থাকে তাহলে বর্তমানে বাণিজ্য কাফেলা অবশ্যই অমুক অমুক স্থানে থাকবে। বেদুঈন তাঁর বক্তব্যের সংগে একথাও জুড়ে দিলো যে, সে জানতে পেরেছে মুহাম্মদের সেনাবাহিনীও অমুক অমুক সময়ে অমুক অমুক স্থান হতে রওয়ানা করেছেন। সংবাদদাতা যদি মিথ্যা না বলে থাকেন তাহলে এ সময়ে তিনি অবশ্যই অমুক অমুক জায়গায় থাকবেন। বলা বাহুল্য, বৃদ্ধ বেদুঈনের কথাগুলো ছিল খুবই সত্য।

পূর্ব ওয়াদা অনুসারে রাসূলে করীম (সঃ) বললেন, আমরা এসেছি প্রস্রবণ অঞ্চল থেকে। বেদুঈন জিজ্ঞাসা করলো কোন্ প্রস্রবণ থেকে। ইরাক! ইরাক শব্দের অর্থ হলো প্রবাহমান পানির প্রস্রবণ।

বদরের কাছাকাছি আসার পর রাসূলে করীম (সঃ) সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার জন্যে আবারো দুজন উষ্ট্রারোহীকে পাঠিয়ে দিলেন। (তাবারী, ১. ১২৯৯—১৩০৫) পানি খাওয়ার ভান করে তারা চলে গেলেন বদর পল্লীর অভ্যন্তরভাগে। ঝরনার পাশে দাঁড়িয়ে দুটি কুমারী মেয়ে কথা বলছিল। তাঁরা আঁড়ি পেতে মেয়ে দুটির কথোপকথন শুনলেন: একটি মেয়ে বলছে, অল্প সময়ের মধ্যেই বাণিজ্য কাফেলা এসে পেঁছিবে। আমি তাদের কাজকর্ম করে দেব। বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পাব তা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করব। গুপ্তচর দুজনের জন্যে এ কথাটুকুই ছিল যথেষ্ট। তৎক্ষণাৎ তারা প্রিয় নবী (সঃ)-এর কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁকে জানালেন যে, শত্রুরা এখনো বদরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেনি। তদনুসারে রাসূলে করীম (সঃ)-ও স্থির করে নিলেন তাঁর কর্মকৌশল।

মক্কার বাণিজ্য কাফেলা জেনে গিয়েছিল যে, সিরিয়ায় যাত্রার সময়ই রাসূলে করীম (সঃ) তাদের গতিরোধ করার জন্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং ঝটিকা আক্রমণ মুকাবিলার ব্যাপারে তারা একেবারে অপ্রস্তুত ছিল না। বদরের পার্বত্য উপত্যকা অঞ্চলে প্রবেশ করার পূর্বে কুরায়শ নেতা আল-হুনায়ন-এর মোড়ে কাফেলাকে থামান। নিজেই রওয়ানা হয়ে গেল বদরের দিকে। এখানকার পথঘাট এবং এতদঞ্চলের লোকজন সম্পর্কে দলনেতা আবূ সুফিয়ানের ভাল জানাশোনা ছিল। সে সরাসরি বদরে চলে এল এবং খবরা-খবর সম্পর্কে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করল। বেদুঈনরা জানাল যে, নতুন কোন ঘটনা ঘটেনি। তবে কিছুক্ষণ পূর্বে শুধুমাত্র দুজন উষ্ট্রারোহী পানি পান করার জন্যে এসেছিল। আবূ সুফিয়ান তাদের চলার পথ ধরে অগ্রসর হলো এবং কিছু দূর

যেতেই সে উটের মল দেখতে পেলো। মলের একটি অংশ হাতে নিয়ে নাড়া-চাড়া করতেই মলের মধ্যে খেজুরের বীচি দেখতে পেল। অমনি সে চিৎকার করে বলে উঠল, আল্লাহ্‌র কসম! অবশ্যই এটা স্থানীয় কোন উটের মল নয়। নিশ্চয়ই এ মল মদীনার মরূদ্যানে চড়েছে এমন কোন উটের। এরা অবশ্যই হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর গুপ্তচর। তড়িঘড়ি করে আবু সুফিয়ান ফিরে গেল কাফেলার কাছে। জরুরী ভিত্তিতে সামরিক হস্তক্ষেপ এবং সাহায্যের অনুরোধ জানিয়ে মক্কায় দূত প্রেরণ করল। বদরের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করার পথ পরিত্যাগ করে সে অগ্রসর হলো সমুদ্র উপকূল দিয়ে এবং এক নাগাড়ে দুরাত পথ চললো। এমনিভাবেই সে অব্যাহতি পেল সম্ভাব্য দুর্যোগের হাত থেকে। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪২৮)

কুরায়শ বাণিজ্য কাফেলার পালিয়ে যাওয়ার পর রাসূলে করীম (সঃ) বদরের পল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে স্থানীয় গোত্রগুলোর সংগে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি জানতে পারলেন যে, কুরায়শদের সেনাবাহিনীও এগিয়ে আসছে বদরের দিকে। তিনিও তাদের মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ইতিমধ্যে মক্কার সেনাবাহিনীর দুজন লোক পানি সংগ্রহের জন্যে আসে। ঘটনাক্রমে তারা মুসলিম বাহিনীর একটি দলের হাতে ধরা পড়ে। বন্দীদ্বয়কে যখন রাসূলে করীম (সঃ)-এর নিকট আনা হলো, তখন তিনি নামায পড়ছি-লেন। সেখানে উপস্থিত অফিসারগণ বন্দীদের পরিচয় জানতে চাইলেন। তারা জানান যে, তারা কুরায়শ বাহিনীর জন্যে পানি বহন করে থাকে।

অফিসারগণ বললেন—না, তোমরা মিথ্যা কথা বলছো। আসলে তোমরা আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার লোক। অতঃপর তারা শাস্তি দিয়ে কথা বের করার চেষ্টা করলেন।

মারধর করতেই তারা নিজেদেরকে আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার লোক বলে স্বীকার করে। কিন্তু যখনই তাদেরকে শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখনই তারা নিজেদেরকে কুরায়শ বাহিনীর লোক বলে পরিচয় দেয়। রাসূলে করীম (সঃ) নামায আদায় করার পর ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টির উপর মনোযোগ দিলেন। তিনি সংগী-সাথীদেরকে বললেন যে, এত দীর্ঘ সফরের পর বাণিজ্য কাফেলাকে পণ্যসামগ্রীসহ এক জায়গায় রেখে দেওয়া হবে এবং পানি বহন-কারীদেরকে পানি নেওয়ার জন্যে বদরের মত এত নিকটবর্তী অঞ্চলে যে প্রেরণ

করা হবে—পরিস্থিতি এমন কোন ঘটনাকে সমর্থন করে না। অতঃপর তিনি বন্দীদেরকে কুরায়শ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে তারা বলল, এ সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। রাসূলে করীম (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, আহারের জন্যে তারা প্রতিদিন কতগুলো উট যবেহ করে?

তারা বললো, একদিন ১০টি যবেহ করলে পরের দিন ৯টি যবেহ করে। রাসূলে করীম (সঃ) অনুমান করলেন যে, তাদের সংখ্যা ৯০০ থেকে ১০০০-এর মধ্যে হবে। বস্তুত পক্ষে কুরায়শ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৯৫০। (ইবনে সাদ, ২/১, পৃঃ ৯)

উহূদের যুদ্ধ এবং অন্যান্য অভিযানের গোয়েন্দা তৎপরতা

কারকারাত আল-কুদর অভিযানের সময় রাসূলে করীম (সঃ) শত্রু পক্ষের কয়েকজন মেষপালককে বন্দী করেন এবং গোত্রের অবস্থান সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

গাতফানে অভিযানের সময় মুসলিম বাহিনীর একটি দল যুল কাস্‌সা-এর নিকট তালাবাহ্ গোত্রের একজন লোকের সাক্ষাৎ পান। তাঁরা তাকে রাসূলে করীম (সঃ)-এর কাছে হাজির করেন। তাঁর নাম জাবর। তিনি প্রিয়নবী (সঃ)-কে শত্রু সম্পর্কে সমস্ত কথা বলে দেন এবং নিজে ইসলাম গ্রহণ করেন।

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ছিল মক্কার পুঁজিবাদী য়াহূদীদের জন্যে একান্তই অপ্রত্যাশিত এবং খুবই অস্বস্তিকর। কাব ইবনে আল-আশরাফ ছিল য়াহূদী গোত্র বনু আন-নাদিরের একজন সর্দার। সে জরুরী ভিত্তিতে মক্কা সফর করে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে মক্কাবাসীদের উত্তেজিত করে। তাছাড়া তাদেরকে সর্বতোভাবে সাহায্য প্রদানেরও নিশ্চয়তা দেয়।

গুপ্তচরের মাধ্যমে যথা সময়ে এ খবর রাসূলে করীম (সঃ)-এর কাছে পৌঁছে যায়। অনতিবিলম্বে তিনি ছোট একটি বাহিনী বনু নাদিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাঁরা গোত্রপ্রধানকে হত্যা করলেন তার নিজের গৃহে। এভাবে তিনি গোড়াতেই নিঃশেষ করে দিলেন অনিষ্টের আশংকাকে। (ইবনে কাসীর, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬)

মক্কাবাসীরা যখন বদরের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করল, সমবেত করল তাদের লোক-লস্কর ও বিষয়-সামগ্রীকে,

সংঘবদ্ধ করল মিত্র গোত্রসমূহকে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-র চাচা আব্বাস তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তিনি মদীনায় রাসূল (সঃ)-এর কাছে আদ্যোপান্ত বিষয় উল্লেখ করে পত্র লিখলেন। অর্থাৎ মক্কার কোন ঘটনাই তাঁর অগোচরে থাকলো না। (ইবনে সাদ, ২/১ পৃঃ ২৫)

যখন অনুমান করা হলো যে, শত্রুরা অবশ্যই মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এসে গেছে, তখন রাসূলে করীম (সঃ) তাদের সন্ধানে দুজন গুপ্তচর পাঠালেন। তাঁরা খবর নিয়ে এলেন যে, মক্কাবাসীরা ইতিমধ্যে পেঁৗছে গেছে, মদীনা অতিক্রম করে তারা চলে গেছে আরো উত্তরে এবং শিবির স্থাপন করেছে উহুদ পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম কোণে আল উরাইদে। সেখানেই তাদের উটগুলোকে চারণ করতে দেখা গেছে। অতঃপর প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল-হুবাবের ইবন আল মুনজির নামক একজন গুপ্তচরকে পাঠালেন। তিনি শত্রু শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং তাদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে এলেন। (ইদিম, পৃঃ ২৫-২৬)

প্রিয়নবী (সঃ) খবর পেলেন যে, সুফিয়ান ইবনে খালিদ আল-হুযায়লী উরানা এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসরত তার গোত্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের সংহতি বিনষ্ট করার জন্যে সৈন্য সংগ্রহ করছে। রাসূলে করীম (সঃ) তখন তার বিরুদ্ধে সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। (ইদিম, পৃঃ ৩৬)

ইত্যবসরে একজন বণিক ব্যবসাসামগ্রী নিয়ে মদীনায় আসে। সে জানাল যে, আনমার এবং তালাবাহ গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘ-বদ্ধ হচ্ছে। ......রাসূলে করীম (সঃ) তখন তাদের শায়েস্তা করার জন্যে ধাতুর রিকা অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। (ইদিম, পৃঃ ৪৩)

বনু মুসতালিক গোত্রটি ছিল খুবই শক্তিশালী। আল হারিস ইবনে দিরার ছিল তাদের প্রধান সর্দার। সে তার গোত্রের লোকজন এবং যাদের উপর তার প্রভাব ছিল তাদের সকলকে মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়ার জন্যে উদাত্ত আহবান জানাল। তারাও তার আহবানে সাড়া দিয়ে ব্যাপক প্রস্তুতির কাজে উঠেপড়ে লেগে গেল। রাসূলে করীম (সঃ)-এর কাছে যখন এই সংবাদ পেঁৗছল তখন তিনি বুরায়দা ইবনে আল-হুসায়ব আল-আসলামীকে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। বুরায়দা ইবনে আল হুসায়ব মুসলমান হলেও তিনি ছিলেন আল মুসতালিক গোত্রের বাসিন্দা। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি

সংগ্রহ করার পর তিনি মুসলিম শিবিরে ফিরে এলেন। রাসূলে করীম (সঃ) তখন যথাবিহিত ব্যবস্থা নিলেন। ফলশ্রুতিতে তিনি অর্জন করলেন মস্তবড় এক বিজয়। (ইদিম, পৃঃ ৪৫)

খন্দকের যুদ্ধের সময় গোয়েন্দা তৎপরতা

মক্কা এবং মদীনা থেকে সিরিয়া ও মেসোপোটেমিয়ার মধ্যে বাণিজ্য কাফেলার যাতায়াতের ক্ষেত্রে দুমাতুল জান্দাল ছিল একটি সংযোগস্থল। রাসূলে করীম (সঃ) সংবাদ পেলেন যে, এখানে কাফির-মুশরিকদের শক্তিশালী একটি বাহিনী অবস্থান করছে। তারা মদীনা মুখী বাণিজ্য কাফেলাকে হয়রানি তো করছেই উপরন্তু মদীনা আক্রমণেরও পাঁয়তারা করছে। (মাসূদী, তানবিহ পৃঃ ২৪৮) এ সংবাদের প্রেক্ষিতে রাসূলে করীম (সঃ) শক্তিশালী একটি বাহিনী-সহ দুমাতুল জান্দালের পথে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু মাঝপথ থেকেই তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৬৮)

অনুমান করা হয় যে, মক্কায় অবস্থানরত মুসলমান গুপ্তচরেরা মদীনা অবরোধের ব্যাপারে মক্কাবাসীদের পরিকল্পনার কথা রাসূলে করীম (সঃ)-কে জানিয়ে দেন। তাঁরা এ সংবাদ প্রেরণ করেন যে, মিত্র শক্তির সহযোগিতায় মক্কাবাসীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার সৈন্য সমবেত করছে। পরে মদীনা থেকে এ সংবাদ রাসূলে করীম (সঃ) যেখানে শিবির স্থাপন করছিলেন, সেখানে জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করা হলো।

তাড়াহুড়া করে মাঝপথে রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আরেকটি ব্যাখ্যা এই যে, গাতফান এবং ফাযারা গোত্রগুলোর মধ্যে কুরায়শদের বেশ কিছু মিত্র ছিল। দুমাতুল জান্দাল অভিযান উপলক্ষে রাসূলে করীম (সঃ) যেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন এই গোত্র দুটি ঠিক সেখানেই বসবাস করতো। সম্ভবত প্রিয়নবী (সঃ) তাদের নিকট থেকেই আসন্ন মদীনা আক্রমণ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন এবং সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। কুরায়শ ও তাদের মিত্রদের আগমন এবং নগর-রাষ্ট্র মদীনা অবরোধ করার পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ পরিখা খননের জন্যে তাঁর হাতে সময় ছিল খুবই সামান্য।

মুসলমানগণ পালাক্রমে দিনরাত পরিখাটি পাহারা দেন। একবার রাতের বেলা মুসলিম বাহিনীর দুটি দলের দুদিক থেকে আসার সময় পরস্পরের সংগে সংঘাত বাঁধে। অতঃপর সংকেত ধ্বনি ব্যবহারের মাধ্যমে তারা পরস্পরকে

শনাক্ত করতে পারেন। কিন্তু ততক্ষণে বেশ কিছু রক্ত ঝরে গেছে। এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে বিষয়টি রাসূলে করীম (সঃ)-এর গোচরে আনা হয়। (মারঘিনানী, দাখিরাহ)

মিত্রশক্তির মদীনা অবরোধ দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে তাদের এবং উট-ঘোড়াগুলোর খাদ্য-খাবারের মওজুদ নিঃশেষ হয়ে আসে। তখন তারা য়াহূদীদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করার প্রয়াস চালায়। তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে হুয়াই ইবনে আখতাব বিশটি উট বোঝাই করে বার্লি, খেজুর, ফলফলাদি এবং পশুর খাবার প্রেরণ করে। কিন্তু এগুলো মুসলিম বাহিনীর প্রহরা দলের হস্তগত হয়। (শামী, সিরাহ)

কুরায়শ ও মুশরিকদের সম্মিলিত শক্তি সম্মুখ সমরের মাধ্যমে মদীনা দখল করতে ব্যর্থ হয়ে য়াহূদীদেরকে মদীনার অভ্যন্তরে থেকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও আক্রমণ করার জন্যে উত্তেজিত করতে শুরু করে। ধীর গতিতে হলেও অত্যন্ত স্থির লক্ষ্য নিয়েই তারা য়াহূদীদেরকে এ পথে প্ররোচিত করতে থাকে। এ ব্যাপারে যখন মুসলমানদের মধ্যে সংশয়ের উদ্রেক হয় তখন রাসূলে করীম (সঃ) তথায় একটি বিশেষ প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। নির্দেশ দিলেন যে, বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কিত গুজবের মধ্যে কোন সত্যতা পেলে তারা তা প্রকাশ করবে না। গুপ্ত প্রতিনিধিদল দেখতে পেলেন যে, তাঁরা যতটুকু সন্দেহ করেছিলেন, বাস্তব অবস্থা তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর।

এবার রাসূলে করীম (সঃ) মিত্র গোত্রগুলোর মধ্যে সন্দেহ এবং মতানৈক্য সৃষ্টির উদ্যোগ নিলেন। সবেমাত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এমন একজন মুসলমানের উপর এ গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হলো। প্রথমেই তিনি মদীনার য়াহূদীগোত্র কুরায়জার নিকট গেলেন। তাদের বললেন, "এটা নিশ্চিত নয় যে, এ যুদ্ধে কুরায়শরা সর্বতোভাবে সাফল্য অর্জন করবে। যদি তারা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে তোমরা এককভাবে মুহাম্মদ (সঃ)-এর মুকাবিলায় নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবে না। সুতরাং প্রথমে তোমরা মুসলমানদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার ব্যাপারে নিশ্চিত হও এবং যে পর্যন্ত তোমরা তাদের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে পুরোপুরি আশ্বস্ত না হও, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মক্কাবাসীদের পক্ষ অবলম্বন করা থেকে বিরত থাক। আমার ধারণা মতে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার পূর্বে মক্কাবাসীদের নিকট থেকে

জিম্মী দাবি করা হবে তোমাদের জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ।” কুরায়জার য়াহূদীরা গুপ্তচরের এই পরামর্শের মধ্যে যথার্থতা খুঁজে পেল।

অতঃপর তিনি গাতফান, কুরায়শ এবং মিত্র বাহিনীর শিবিরে গেলেন। তাদের এই বলে পরামর্শ দিলেন যে, তাঁর জানা মতে য়াহূদীরা মুহাম্মদের সংগে একটি গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তারা চাচ্ছে মিত্র গোত্রসমূহের কিছু সংখ্যক শীর্ষস্থানীয় নেতাকে আয়ত্তে এনে তাদেরকে মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাতে তুলে দিতে। এটা তারা করবে য়াহূদী মুসলমান ঐক্যের প্রতীক হিসাবে। সুতরাং তোমরা সাবধান হও। আমি বরং তোমাদের এ পরামর্শ দেব যে, তোমরা ‘সাব্বাত’ দিবসে য়াহূদীদেরকে বিদ্রোহ করতে বল। কারণ সেদিন অতর্কিত এবং অপ্রত্যাশিতভাবেই য়াহূদীরা মুসলমানদেরকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবে।

এরপর গুপ্তচর মুসলিম শিবিরে ফিরে আসেন এবং আরো কিছু গুজব ছড়িয়ে দেন। বিশেষ করে তিনি একথা রটিয়ে দেন যে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অংগীকার হিসাবে য়াহূদীরা জামিন বাবদ মিত্র গোত্রের কাছে কিছু সংখ্যক শীর্ষস্থানীয় নেতাকে দাবি করেছে। কোন এক ব্যক্তি যখন রাসূলে করীম (সঃ)-এর নিকট এ গুজবের খবর পৌঁছে দিল, তখন তিনি বললেন যে, হয়তোবা আমরা নিজেরাই তাদেরকে এমনটি করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম।

মাস’উদ আন নাম্মাম নামের এক লোক রাসূলে করীম (সঃ)-এর এ মন্তব্য শুনে ফেলে। অমনি সে ছুটে যায় কুরায়শ শিবিরে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কথাগুলোকে সে আবূ সুফিয়ানের কাছে হুবহু পৌঁছে দেয়। (বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্যে ইবনে হাজার-এর ইসাবাহ নং-৩০৭৪ দেখা যেতে পারে) ইতিমধ্যে য়াহূদী প্রতিনিধিদল মিত্র গোত্রসমূহের শিবিরে চলে আসে এবং কোন অবস্থাতেই তারা য়াহূদীদের পরিত্যাগ করবে না। এ ধরনের অংগীকারের স্বপক্ষে জামিন দাবি করে। গুপ্তচরের প্রচার অভিযানে ভাল ফল পাওয়া গেল। মিত্র গোত্রসমূহ য়াহূদীদের কাছে জামিন তুলে দিতে অস্বীকার করলো। উল্টো তারা পবিত্র ‘সাব্বাত’ দিবসেই অসম্মানজনক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্যে য়াহূদীদের নিকট দাবি জানাল। এভাবেই মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশ্য পুরোপুরিভাবে অর্জিত হলো। (ইবনে হিশাম, তাবারী, ইবনে সাদ)

কুরায়শরা মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যূহকে ভেংগে দেয়ার জন্যে দুতিন বার দুর্বার আক্রমণ চালায়। কিন্তু তাদের সে প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এরপর থেকে তারা আর কখনো সম্মুখ ভাগ দিয়ে আক্রমণ করার মত সাহস পেল না। অবশ্য তারা রাতের বেলা অব্যাহতভাবে টহলদার বাহিনী পাঠাতে থাকে। কোন দুর্বল মুহূর্তে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানদের কব্জায় আনাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এমনিভাবে দশ দিনেরও বেশি সময় ধরে কুরায়শরা দিনরাত চব্বিশ ঘন্টার জন্যে মুসলমানদের অবরোধ করে রাখে। (ইবনে সাদ ২/১, পৃঃ ৪৯)

রাতের বেলা প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ এবং শৈত্যের কারণে অবরোধের শেষ মুহূর্তগুলো ছিল খুবই দুর্যোগপূর্ণ। সেই দুর্যোগের মধ্যে রাসূলে করীম (সঃ) একজন বিশেষ গুপ্তচরকে বহু দূরে শত্রু শিবিরের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন যে, তিনি একাকী যাবেন এবং শত্রুদের অবস্থা সম্পর্কে জানাবেন। গুপ্তচর দেখতে পেলেন যে, পর্বত প্রমাণ বিরক্তি নিয়ে কুরায়শ বাহিনী মক্কায় ফিরে যাচ্ছে। তারা মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের ভয়ে ২০০ অশ্বারোহীকে নিয়োগ করেছে পশ্চাৎরক্ষী দল হিসাবে। এই দলের নেতৃত্বে রয়েছেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আস। গুপ্তচর যথাসময়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং রাসূলে করীম (সঃ)-কে জানিয়ে দিলেন গোটা ব্যাপারটা। বলে রাখা আবশ্যক যে, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামন ছিলেন সেই বিশেষ গুপ্তচর।

হুদায়বিয়া এবং ছোটখাট অন্যান্য অভিযানে গোয়েন্দা তৎপরতা

শত্রুসেনাদের শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে আক্কাশাহ ইবনে মিহসানকে একটি অভিযানে প্রেরণ করা হলো। শত্রুসেনারা এ অভিযানের সংবাদ জেনে যায় এবং তাদের সমস্ত জনশক্তি ও পশুপালসহ পালিয়ে যায়। সেনাপতি তখন সুজা ইবনে ওয়াহাবকে গুপ্তচর হিসাবে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি উষ্ট্রের পদচিহ্ন ধরে শত্রু সেনাদের অনুসরণ করতে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি শত্রুপক্ষের বেশ কিছু সংখ্যক লোকের মুখোমুখি হলেন এবং তাদের পরাভূত করলেন। অতঃপর শত্রুসেনাদের নিরাপত্তা প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়ে তাদের সব পশুপালকে খুঁজে বের করলেন। এভাবেই মুসলমান সেনারা ২০০ উট লাভ করলেন এবং বন্দী শত্রুসেনাদের ধন্যবাদের সংগে মুক্ত করে দিলেন। মাকরিযীর (১, ২৬৪) বর্ণনা অনুসারে বনু আসাদ অঞ্চলের ঘামর নামক স্থানে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়।

বনু সুলাইম গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত শাস্তিমূলক অভিযানে নেতৃত্ব দেন যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ)। অভিযানের সময় তারা একজন মহিলাকে বন্দী করেন এবং সেই মহিলা গোত্রের লোকজনের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করে দেয়। এ অভিযানে মুসলিম বাহিনী বনু সুলাইম গোত্রের লোকজন বন্দী করে এবং যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী হিসাবে অর্জন করে উট ও মেষপাল।

(ইবনে সাদ, ২/১, পৃঃ ৬২)

ফদক-এর বিরুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)-এর অভিযানটি ছিল শাস্তিমূলক। এ অভিযানের সময় 'হামাজ' নামক লোকালয়ে শত্রুপক্ষের একজন লোককে বন্দী করা হয়। তাকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রদানের নিশ্চয়তা দেওয়া হলে সে তার গোত্রের লোকজন কোথায় আছে তা প্রকাশ করে দেয়। এ অভিযানে মুসলিম বাহিনী ৫০০ উট এবং ২০০০ ভেড়া ও ছাগল লাভ করে।

(ইদিম, পৃঃ ৬৫)

একবার মুসলিম বাহিনীর একটি দল সাফল্যের সংগে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার পর প্রত্যাবর্তন করে। এবং দলের প্রত্যেকেই দাবি করে যে, সে-ই শত্রুপক্ষের সর্দারকে হত্যা করেছে। তখন রাসূলে করীম (সঃ) তাদের প্রত্যেকের তলোয়ার পরীক্ষা করে দেখলেন এবং একটি তলোয়ারের গায়ে হজম হয়ে যাওয়া খাবারের চিহ্ন দেখতে পেলেন। তখন তিনি ঘোষণা দিলেন যে, যে এই তলোয়ারের মালিক সেই শত্রু সর্দারকে হত্যা করেছে। (ইদিম, পৃঃ ৬৬)

ষষ্ঠ হিজরী মুতাবিক ৬২৭ খৃস্টাব্দে পবিত্র হজ্জ উপলক্ষে মক্কা অভিমুখে যাত্রার সময় রাসূলে করীম (সঃ) আগাম একজন গুপ্তচর পাঠিয়ে দিলেন। হুদায়বিয়ার অভিযানটি এ সময়ে সংগঠিত হয়। রাসূলে করীম (সঃ) যখন মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন তাঁকে শত্রু সম্পর্কে গোপন সংবাদ দেওয়া হলো। বলা হলো যে, কুরায়শরা তাঁর আগমন সংবাদ সম্পর্কে জেনে গেছে। তারা দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে রাসূলে করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যাপারে। এমনকি আহাবিশের মিত্র গোত্রসমূহের সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার ব্যাপারেও ব্যবস্থা করে রেখেছে। রাসূলে করীম (সঃ) পরামর্শ পরিষদের সভা আহ্বান করলেন। আলোচনা করলেন কুরায়শদের এ সব অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মিত্রদের বসতিগুলোর উপর আক্রমণ করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে। কারণ এতে করে যে কেবলমাত্র কিছু বিষয়-সম্পদ অনায়াসেই মুসলমানদের

হস্তগত হবে তাই নয়, বরং যারা ইসলামের শত্রুদেরকে অনুরূপ সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করছে এটা হবে তাদের জন্যে মস্তবড় একটি শিক্ষা। সর্বশেষে তিনি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর অভিমতের প্রতি সম্মতি জানিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে হজ্জের ধর্মীয় অভিযান অব্যাহত রাখলেন। (বুখারী শরীফ ৬৪ ঃ ৩৭, ইবনে কাসীর, ইতিহাস ৪ ঃ ১৭৩) কুরায়শদের নিকট থেকে নিজের গতিবিধি গোপন রাখার জন্যে এরপর থেকে তিনি একটি অপ্রচলিত পথ ধরে অগ্রসর হলেন। (ইবনে কাসীর ৪/১৬৫)

খায়বরের যুদ্ধে গোয়েন্দা তৎপরতা

রাসূলে করীম (সঃ) খায়বরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় জানতে পারলেন যে, গাতফানের লোকেরা খায়বরে তাদের মিত্রদের সাহায্যার্থে সেখানে চলে গেছে। রাসূলে করীম (সঃ) তখন তাঁর গতিপথ পরিবর্তন করলেন। মনে হচ্ছিল যে খায়বর নয়, গাতফানই যেনো এ অভিযানের লক্ষ্যস্থল। এ মর্মে একটি সংবাদও চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন। অমনি গাতফানের লোকেরা তাদের অরক্ষিত পরিবার-পরিজন এবং সম্পদের টানে নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন করে। পরবর্তীতে খায়বর অভিযানের সময় তারা আর কখনো সেখান থেকে নড়াচড়া করার সুযোগ পেলো না। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৭৫৭-৭৫৮, তাবারী ১/১৫৭৫-১৫৭৬)

শত্রুপক্ষের একজন লোকের নিকট থেকে রাসূলে করীম (সঃ) খায়বর দুর্গের ভূগর্ভস্থ পথ সম্পর্কে গোপন সংবাদ জানতে পারেন। অতি সহজে খায়বর দখলে এটা অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল। (শামী, সীরাহ)

খায়বর বিজয়ের পর রাসূলে করীম (সঃ) সাধারণ কোষাগারের তত্ত্বাবধায়ককে অতিরিক্ত সমস্ত সম্পদ হস্তান্তর করার জন্যে বললেন। প্রিয়নবী (সঃ)-কে জানানো হলো যে, কোষাগারে কোন সম্পদ মওজুদ নেই। নবীজী তখন তত্ত্বাবধায়ককে ছেড়ে দিলেন। সংগে সংগে এ সতর্কবাণীও শুনিয়ে দিলেন যে, পরে যদি সম্পদ পাওয়া যায় তাহলে মিথ্যা কথা বলার অভিযোগে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে। পরবর্তী সময়ে রাসূলে করীম (সঃ) একজন য়াহূদীর নিকট থেকে জানতে পারলেন যে, তত্ত্বাবধায়ককে মাঝে-মধ্যেই একটি ধ্বংসস্তূপের পাশে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফিরা করতে দেখা গেছে। তদনুসারে সে স্থানে তল্লাশি চালিয়ে কোষাগারের সম্পদ পুনরুদ্ধার করা হয়

এবং পূর্বের দেওয়া সতর্কবাণী অনুসারে তত্ত্বাবধায়ককে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, আর গোপন সংবাদদাতাকে দেওয়া হয় পুরস্কার। (ইবনে হিশাম. পৃঃ ৭৬৩)

হুনায়ন ও তায়েফ অভিযান এবং মক্কা বিজয়কালে গোয়েন্দা তৎপরতা

মক্কাবাসীরা শান্তিচুক্তির শর্ত ভংগ করলো। রাসূলে করীম (সঃ) ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। মদীনার একজন মুসলমান মক্কায় অবস্থানরত তার কিছু সংখ্যক বন্ধুবান্ধব এবং বিশ্বস্ত লোককে এ মর্মে একটি পত্র লিখল যে, রাসূলে করীম (সঃ) বড় রকমের একটি অভিযানের জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন এবং এ অভিযান মক্কার উদ্দেশ্যেও হতে পারে। প্রিয়নবী (সঃ) এ গোপন সংবাদ জেনে গেলেন। যে মহিলা একাকী একটি উটের পিঠে চড়ে অত্যন্ত সন্দেহজনকভাবে পত্রটি নিয়ে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা করেছিল, তাকে ধরার জন্যে হযরত আলী (রাঃ)-কে একটি ঘোড়াসহ পাঠিয়ে দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই হযরত আলী (রাঃ) তাকে ধরে ফেললেন এবং পত্রটি দিয়ে দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এ ধরনের কোন পত্রের কথা সে অস্বীকার করলো। সবশেষে যখন তাকে বলা হলো যে, পত্রটি না দিলে তার দেহ তল্লাশি করা হবে, তখন সে চুলের খোঁপা থেকে পত্রটি বের করে দিল। হযরত আলী (রাঃ) যথা নিয়মে পত্রটি রসূল (সঃ)-এর নিকট পেশ করলেন। (ইবনে হিশাম, পৃঃ ৮০৮)

রাসূলে করীম (সঃ) যখন মক্কায় ছিলেন তখন তিনি খবর পেলেন যে, হাওয়াজিন বাসীরা মুসলিম সাম্রাজ্যে লুটতরাজের পাঁয়তারা করছে। সেখানে থাকতেই একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে তৎক্ষণাৎ হাওয়াজিনে পাঠালেন। গোয়েন্দা কর্মকর্তা শত্রুদের মধ্যে কয়েকটি দিন কাটালেন এবং প্রয়োজনীয় খবরাদি নিয়ে নবীজীর কাছে ফিরে এলেন।

হাওয়াজিনে অভিযানের সময় শত্রুপক্ষের একজন গুপ্তচর মুসলিম শিবিরে প্রবেশ করে। সেখানে সে অনেক কিছু দেখে এবং অনেক গোপন কথা শুনে ফেলে। অতঃপর সেখান থেকে সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। গুপ্তচরের সন্দেহজনক আচার-আচরণ প্রিয়নবী (সঃ)-এর নজরে পড়ে এবং তাকে অনুসরণ করার জন্যে সাথীদেরকে নির্দেশ দেন। অবশেষে তাকে বন্দী করা হলো এবং বিচারে প্রিয়নবী (সঃ).তার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিলেন। (বুখারী শরীফ, ৫৬ ঃ ১৭৩, আবু দাউদ ১৫ ঃ ১১০)

সাধারণ কতগুলো বিষয়

তখনো নাজ্‌দ, মক্কা, খায়বর এবং আওতাস (হাওয়াজিনের নিকটবর্তী দেশ) মুসলিম বাহিনীর দখলে আসেনি। অথচ এ সব অঞ্চলে রাসূলে করীম (সঃ)-এর এজেন্ট বা নিজস্ব লোক ছিলেন। তারা অতি সংগোপনে নিয়মিত প্রিয়নবী (সঃ)-এর কাছে পত্র লিখতেন (আল-খাত্তানী, আল-তারাতিব, আল-ইদারিয়াহ, ১/৩৬২—৩৬৩)

সে আমলেও এমন কিছু ঘটনা ছিল যেগুলোকে 'ফিফথ কলাম' বা পঞ্চম বাহিনী বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বালাযুরীর (আনসাব ১/২১০) প্রসংগ টেনে বলা যেতে পারে যে, মক্কার দু'জন মুসলমান যুবকের উপর তাঁদের পরিবারের সদস্যরা ভয়ানক রকমের অত্যাচার-উৎপীড়ন চালাত। তারা যুবকদের বন্দী করে রেখেছিলো নিজেদের গৃহে। তৃতীয় হিজরী সনের দিকে রাসূলে করীম (সঃ) মদীনা থেকে একজন গুপ্তচরকে সেখানে প্রেরণ করেন। তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি মক্কায় যাবে। সেখানে অমুক নামে একজন স্বর্ণকারকে দেখতে পাবে। সংগোপনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সে একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান। তুমি তাঁর গৃহে আত্মগোপন করবে। সেখানে থেকেই বন্দীদের সংগে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। বস্তুতপক্ষে রাসূলে করীম (সঃ)-এর এ মিশন পুরোপুরি সফল হয়েছিল।

কুতবাহ অভিযানকালে একজন শত্রু মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো। যেই তাকে শত্রু সম্পর্কে খবরাখবর দেয়ার জন্যে বলা হলো, অমনি সে বোবা হওয়ার ভান করলো। রাসূলে করীম (সঃ)-এর নির্দেশে তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হলো। কিন্তু শীঘ্রই সে নিজের গোত্রের লোকজনকে সতর্ক করার জন্যে একটি বিশেষ সংকেতে চিৎকার করে উঠলো। অতঃপর তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হলো। (ইবনে সাদ ২/১, পৃঃ ১১৭)

নিজের গতিবিধিকে গোপন রাখার জন্যে রাসূলে করীম (সঃ) সব সময় এমনভাবে চলাফেরা করতেন যাতে শত্রুসেনাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। যেমন কোন অভিযানে বেরিয়ে প্রথম কয়েকদিন তিনি ভুল পথে অগ্রসর হলেন, তারপর হঠাৎ করেই দৃঢ়পদে এগিয়ে গেলেন লক্ষ্যস্থলের দিকে।

তাবুক অভিযানকালে রোমান সম্রাটের মুখোমুখি হওয়ার সমূহ আশংকা ছিল এবং এটা ছিল খুবই দুশ্চিন্তার ব্যাপার। সে কারণে কেবলমাত্র এ অভি-

যানের সময়েই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগণকে আগাম অবহিত করা হয়েছিল। (ইবনে সাদ ২/১, পৃঃ ১১৯) বলে রাখা আবশ্যক যে, নাবাতিনের যে বাণিজ্য কাফেলা মদীনার দিকে আসছিল, তাদের নিকট থেকেই রাসূলে করীম (সঃ) হেরাক্লিয়াসের মুসলিম সাম্রাজ্য অবরোধের প্রস্তুতির খবর জানতে পেরেছিলেন। এ খবরের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি তাবুকে অভিযান চালিয়ে ছিলেন। (মাকরিযী, ইমতা ১/৪৪৫)

সামরিক গোয়েন্দা কার্যক্রমের আইনগত বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি কথা

এতক্ষণ আমরা যুদ্ধের সময়ের গোয়েন্দা তৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। অনুরূপভাবে যখন যুদ্ধবিগ্রহ থাকে না, সর্বত্র বিরাজ করে শান্তি ও শৃঙ্খলা তখনো এই তৎপরতাকে অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

যুদ্ধাবস্থায় শত্রুকে হত্যা করা বিধিসংগত। সে কারণেই শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা ধরা পড়লে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কোন সমস্যা নয়। প্রকৃতপক্ষে গুপ্তচরকে অবস্থা বিশেষে গুরু দণ্ড বা লঘু দণ্ড দেওয়া যেতে পারে। এমনকি ভবিষ্যতে ভালভাবে চলার প্রতিশ্রুতিতে তাকে মুক্ত করে দেওয়া যায়। তবে এতদসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার দায়িত্ব অধিনায়কের উপর ন্যস্ত। প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের জন্যে কখনো কখনো বন্দী গুপ্তচরকে শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে এবং কারো তরফ থেকেই এ অধিকার প্রত্যাখ্যান করার কথা নয়। অনুরূপভাবে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে গোয়েন্দার বিপদের আশংকা থাকা সত্ত্বেও নিজের সুবিধার্থে কেউ-ই গোপনে তথ্য সংগ্রহ বা গোয়েন্দা গিরির সুযোগ ত্যাগ করতে চায় না।

মুসলমান আইনবেত্তাগণের মতে, যখন শান্তি-শৃংখলা বিরাজ করে তখন পুরুষ এবং মহিলা গুপ্তচরের সংগে আচার-আচরণের ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ে ঠিক একই ধরনের ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য। অবশ্য তারা বেশ জোর দিয়েই এ কথাও বলেছেন যে, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের কোনক্রমেই গুরুদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করা উচিত নয়। অবশ্য মুসলিম আইনবেত্তাগণের মধ্যে একটি গোষ্ঠী এ মতবাদও পোষণ করে থাকেন যে, (ইসলাম ধর্মে) অবিশ্বাস করা যতটা মারাত্মক বা তিরস্কারের যোগ্য, গোয়েন্দাগিরিটা ততটা নয় এবং গুপ্তচরকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করা অনুচিত। কারণ ইসলাম একজন অমুস-লিমকে বিদেশী হিসাবে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের সুযোগ দেয়। আইনের

দৃষ্টিতে মুসলমানদের সংগে তারা পূর্ণ সমতা ভোগ করে থাকে এবং তাদের গ্রহণ করা হয় সংরক্ষিত অধিবাসী হিসাবে। কিন্তু এ সব আইনবেত্তা একথাটি বিবেচনায় আনেন না যে, একজন শান্তিকামী অমুসলিম প্রজা অপেক্ষা একজন গুপ্তচর গোটা মুসলিম রাষ্ট্রের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে। অবশ্য গুপ্তচরদেরকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান না করার ব্যাপারে যদি কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহলে এ ধরনের কোন চুক্তির সংগে সমঝোতা রক্ষায় ইসলামী রাষ্ট্রের কোন অসুবিধা হবে না।

এ ব্যাপারে কোন রকম দ্বিমত হতে পারে না যে, গোয়েন্দা হিসাবে সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তির উপযুক্ত বিচার হবে এবং আত্মরক্ষার জন্যে তাকে সকল প্রকার সুযোগ দেওয়া উচিত। যুদ্ধের সময় বিরাজমান সংকটের কারণে হয়তো আদালত বা বিচারকার্য সংক্ষিপ্ত হতে পারে। কিন্তু ইসলামী বিচার ব্যবস্থা আইনানুগ পদ্ধতি এবং উপযুক্ত বিচার ব্যতীত কাউকে শাস্তি প্রদানের বিষয়টি কখনো অনুমোদন করে না।

রাসূলে করীম (সঃ)-এর সময়ের নৌযুদ্ধ

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর সময়ে ইসলামী নৌবাহিনী সম্পর্কে বর্ণনা করার মত বিশেষ কিছু নেই। তথাপি এ কথা সত্য যে, সামুদ্রিক যুদ্ধ বিগ্রহ এবং নৌ-অভিযান সমূহের একেবারেই কোন অস্তিত্ব ছিল না, এমন নয়। বর্তমানের আলোচনা থেকে বেসামরিক নৌযাত্রাকে বাদ দেওয়া হবে। এর মধ্যে রয়েছে মক্কার মুসলিম শরণার্থীদের আবিসিনিয়া অভিমুখে নৌযাত্রা অথবা আশারী-দের নৌপথে ইয়ামেন হতে মদীনা হয়ে জারে যাত্রা অথবা তামীম আদায়রী-এর দুঃসাহসিক অভিযান ইত্যাদি। সহীহ মুসলিম শরীফে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

নৌযুদ্ধের প্রথম উল্লেখ আমরা দেখতে পাই অষ্টম হিজরীতে। ইবনে আসকির রচিত 'হিস্টরী অব দামাসকাস' গ্রন্থের (১৯৫১ সংস্করণের প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা ৩৯৪) মুতার যুদ্ধ প্রসংগে নিম্নে বর্ণিত ঘটনার বিবরণ রয়েছেঃ রাসূলে করীম (সঃ)-এর একজন সাহাবী ছিলেন আশার গোত্রের অধিবাসী। তিনি বলেন যে, রাসূলে করীম (সঃ) তাকে এক বিশেষ অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি একটি নৌকার সাহায্যে আলিয়া (আধুনিক আকাবা) পৌঁছেন। সেখানে তিনি যায়দ ইবনে হারিসার সেনাবাহিনীর বালকাতে আগমন এবং

সেখানে বাইজানটাইন বাহিনী ও তাদের আরব মিত্রদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবার খবর পান। তিনি কালক্ষেপণ না করে রণক্ষেত্রে পৌছেন এবং সংগী সাথী-সহ মুসলিম বাহিনীর পক্ষে মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত হন। ঘটনার অবশিষ্টাংশ এ স্থলে খুব প্রাসংগিক হবে না। যাহোক এতে জানা যায় যে, রাসূলে করীম (সঃ) নৌপথে অতিরিক্ত বাহিনী প্রেরণ করে স্থলপথে মূতায় প্রেরিত মূল বাহিনীকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন।

অপর ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইবনে সা'দ এবং আরো অনেকে। ইমতা গ্রন্থের প্রণেতা মাকরিযীর মতে ঘটনাটি ঘটে নবম হিজরীতে ৬৩০ খৃস্টাব্দে। আমরা জানতে পারি যে, রাসূলে করীম (সঃ) ৩০০ সৈন্যের একটি দলকে আলকামা ইবনে মুজাজ্জিজ-এর অধীনে রবিউল আখির মাসে (জুন) মক্কার সমুদ্র উপকূলে প্রেরণ করেন। সুয়াইবা বন্দরের অধিবাসীরা কিছু সংখ্যক নিগ্রোকে কয়েকটি নৌকায় দেখতে পায়। আলকামা তার দলবল-সহ একটি দ্বীপে অবতরণ করেন। তখন নিগ্রো দস্যুরা পালিয়ে যায়। অতঃপর মুসলিম সেনারা প্রত্যাবর্তন করে।

পরিশেষে বলা আবশ্যক যে, কুরআন মজীদে (৩০ : ৪১) যুদ্ধের বিবরণ রয়েছে। যুদ্ধের মাধ্যমে মানুষ যে বিপদ ডেকে আনে তার উল্লেখ রয়েছে সূরা 'রূমে'। নৌদস্যুতার উল্লেখ ইসলাম-পূর্ব যুগের ঘটনার সহিত জড়িত এবং কুরআনে সমুদ্র সম্পর্কে আরও বহু উল্লেখ রয়েছে। এ পুস্তকের কলেবরে তা উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। মুসলিমদের নৌযুদ্ধ সম্পর্কে হাদীসেও বহু উল্লেখ রয়েছে। রাসূলে করীম (সঃ) আগামী দিনের ঘটনাবলী সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এ হাদীসগুলো প্রধানত সে সব ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে রচিত। সে হাদীসগুলো এস্থলে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়।

অধ্যায় ৯

রাসূল (সঃ)-এর আমলে মুসলিম রাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ

এই পুস্তকটি একজন অপেশাদার লেখকের লেখা। আলোচনার পরিসরও সীমিত তবু রাসূলে করীম (সঃ)-এর যামানায় সমর বিভাগ কিভাবে গড়ে উঠেছিল, এর কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হতো সে বিষয়ের প্রতি সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেই বর্তমান আলোচনাকে অর্থপূর্ণভাবে সমাপ্ত করা যেতে পারে।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মদীনায় আগমন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করার পরই মুসলিম রাষ্ট্র অত্যন্ত কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে। গোড়ার দিকে সেখানে কোন সামরিক সংগঠন ছিল না। আক্রমণ অথবা প্রতিরক্ষা-মূলক উদ্দেশ্যও ছিলো অনুপস্থিত এবং এটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মদীনায় কোন রাষ্ট্রীয় কাঠামো ছিল না। ফলে রাসূলে করীম (সঃ)-এর পক্ষে সমর বিভাগের সংস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া রাসূল (সঃ) বিজয়ী বীর হিসাবে মদীনায় আসেননি। অথবা তাঁর নগর রাষ্ট্রের সংগে মদীনা এবং এর বিরাজমান প্রশাসনকে সংযুক্ত করার উদ্দেশ্যও ছিল না। বরং তিনি মদীনায় এসেছিলেন সহায়-সম্বলহীন অবস্থায়। বলতে গেলে একজন উদ্বাস্তু হিসাবে। তিনি মদীনায় এসে চরম বিশৃঙ্খলা, বিবাদ-বিসংবাদ এবং অরাজকতা প্রত্যক্ষ করেন। সে কারণেই তিনি নগর রাষ্ট্র ধরনের একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। স্থানীয় জনগণ তাঁর এই প্রস্তাবে সর্বতোভাবে সম্মতি জানান। কিন্তু তাঁকে সবকিছুই সৃষ্টি করতে হয় একেবারে নতুনভাবে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলো দূর করতে হলো অবিরত প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতার আলোকে।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাসূলে করীম (সঃ)-এর মদীনায় উপস্থিতিকালে সেখানে বিরাজ করছিল চরম বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা। অথচ ছয় মাস অতিবাহিত

হতে না হতেই তিনি সেখান থেকে তাঁর এবং নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পাঠাতে সমর্থ হলেন।

স্থায়ী সৈন্য বাহিনীর বিকল্প ব্যবস্থা

তখন মদীনায় কোন স্থায়ী সৈন্য বাহিনী না থাকলেও প্রত্যেক মুসলিমই ছিলেন মুজাহিদ। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছেঃ আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে, নিধন করে ও নিহত হয়। (৯/১১১) বলা বাহুল্য, কুরআনুল করীমে এ ধরনের আরও অনেক আয়াত রয়েছে। এর ফলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ স্থায়ী সৈন্য বাহিনীর সম্ভাবনাময় যোদ্ধায় পরিণত হয়। প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করে সামরিক প্রশিক্ষণে। বস্তুতপক্ষে ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও তারা সামরিক প্রশিক্ষণ নিতো। সরকারও সম্ভাব্য সকল উপায়ে এ ব্যবস্থার প্রসারে উৎসাহ জোগাতেন। অনুপ্রাণিত করতেন মানবিক ও নৈতিকভাবে। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি তা থেকে এটা যথেষ্ট যে, কুরআন মজীদে কেবলমাত্র আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমোদন রয়েছে। অবশ্য প্রতিরোধমূলক যুদ্ধও এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে যে, "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর ; কিন্তু সীমালংঘন করো না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না। যেখানে তাদের পাবে হত্যা করবে। (২ঃ১৯০-১৯১)। যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদের যারা আক্রান্ত হয়েছে..." (২২ঃ ৩৯-৪১)। উপরের আয়াতে করীমার দ্বিতীয় অংশে শত্রুকে হত্যা সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা বর্তমানে যে রাষ্ট্রের সংগে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে সে রাষ্ট্রের যুদ্ধরত অধিবাসীদের বেলায় প্রযোজ্য হবে। কুরআনুল করীমের অন্য যে সব আয়াতে শত্রুকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, তা মূলত এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অভিযানসমূহের জন্যে সৈন্য সংগ্রহ পদ্ধতি

বিভিন্ন অভিযানের জন্যে সৈন্য সংগ্রহ পদ্ধতি ছিলো নিম্নরূপঃ রাষ্ট্রের প্রধান এবং সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে রাসূলে করীম (সঃ) একটি অভিযানের জন্যে কি পরিমাণ সৈন্য বা মুজাহিদ দরকার হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেন। অবশ্য এ ব্যাপারে কখনো কখনো পরামর্শ করতেন বিশ্বস্ত

এবং অভিজ্ঞ সহচরগণের সাথে। অতঃপর তিনি এ ব্যাপারে ঘোষণা দিতেন। যারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অভিযানে যেতে প্রস্তুত থাকতেন তারা একটি রেজিস্টারে নাম লিখতেন। এটা স্পষ্ট যে, রাসূলে করীম (সঃ) নিয়মিত নামায সমাপনান্তে মসজিদে নববীতে বসেই এতদসংক্রান্ত ঘোষণা দিতেন। সৈন্যদের তালিকাভুক্তির জন্যে রেজিস্টার খাতাটিও সংরক্ষিত হতো মসজিদে। পূর্ব থেকেই অভিযানের লক্ষ্যস্থল সম্পর্কে কেউ কিছু জানতে পারত না। প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্যের তালিকাভুক্তির পর, রাসূলে করীম (সঃ) একজন অধিনায়ক নিয়োগ করতেন। অতি সংগোপনে তাঁকেই তিনি বলে দিতেন যুদ্ধ সংক্রান্ত সমস্ত নির্দেশাবলী। জানিয়ে দিতেন সামরিক আচার-আচরণের কথা, নিয়ম-কানুন ও বিধি বিধানগুলো। কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে, অধিকতর গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষার তাগিদে রাসূলে করীম (সঃ) অধিনায়কের হাতে গালা দিয়ে আটকানো চিঠি প্রদান করেছেন। বলে দিয়েছেন যে, "উঁচু ভূমির দিকে অগ্রসর হও। অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলের দিকে না গিয়ে উল্টো দিকে অগ্রসর হও। এভাবে তিন দিন চলার পর চিঠি খুলবে এবং চিঠিতে উল্লেখিত নির্দেশ অনুসারে কাজ করবে।" স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সৈন্যে-রই নিজস্ব সাজ-সরঞ্জাম থাকতো। প্রয়োজনের সময় সরকারের তরফ থেকে সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা হতো।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, মক্কায় পৌত্তলিকদের তথা মুশরিকদের বাণিজ্য পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রাথমিক সামরিক অভিযানগুলো পরিচা-লিত হয়েছিল। একবার হস্তক্ষেপ করার সংগে সংগে দেখা দিলো তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। অব্যাহত গতিতে চলতে থাকলো সামরিক তৎপরতার ধারা। অবস্থা এমন হলো যে, কখনো কখনো এক মিনিটের নোটিশে বাহিনী পাঠাতে হলো। অবশ্য এ সব অভিযান ছিল ছোট ধরনের। এ গুলোর জন্যে মসজিদে নববীতে প্রতিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্র প্রধানের বাসভবনের সন্নিকটে অবস্থিত আসহাবে সুফফার আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল যথেষ্ট। সুফ্ফার অধিবাসীরা ছিলেন ভীষণ ধার্মিক এবং উদ্যমী। সাধারণভাবে তাঁরা ছিলেন খুবই গরীব। চাষাবাদে, ব্যবসা-বাণিজ্যে বা বিষয়-সম্পদের সংগে তাঁদের কোন সংযোগ বা আকর্ষণ ছিল না। নেহায়েৎ বেঁচে থাকার তাগিদে যৎসামান্য উপার্জনের জন্যে তাঁরা কিছু কিছু কাজকর্ম করতেন। তাঁরা সময় কাটাতেন জ্ঞান অন্বেষণে, ইবাদত-বন্দেগীতে এবং আধ্যাত্মিক জীবন সাধনায়। দিনে অথবা রাতে যে কোন মুহূর্তে নবী করীম (সঃ) তাদেরকে যে কোন কাজের জন্যে ডাকতে পারতেন।

অপরদিকে সুফ্ফার সদস্যগণও নবীজী যে নির্দেশ দিতেন তৎক্ষণাৎ তা পালন করার জন্যে তৈরী থাকতেন।

হাদীস শরীফের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন অভিযানে অংশ নেয়ার জন্যে সাহাবায়ে কেরাম বিশেষ রেজিস্ট্রী বইয়ে নাম লিখাতেন। (বুখারী শরীফ, জিহাদ অধ্যায় ১৪০, মুশলিম শরীফ, হজ্জ অধ্যায় ৪২৪) কখনো কখনো তাঁরা এত বেশি সংখ্যায় নাম লিখাতেন যে, পূর্বের সমস্ত তালিকা ছাড়িয়ে যেতো। (বুখারী শরীফ, মাগাজী, অধ্যায় ৭৯, মুসলিম, তাওবাহ ৫৩-৫৫) এই বর্ণনাটি তাবুক অভিযান প্রসংগে বর্ণিত হলেও কেবলমাত্র তাবুক অভিযানের সময়ই এমনটি ঘটেনি। সম্ভবত অন্যান্য অভিযানে, যেমন মক্কা অভিযানের সময়ও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এ সময় রাসূলে করীম (সঃ) শত্রু পক্ষকে হতবুদ্ধি করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহর এবং গোত্রে এ সংবাদ প্রেরণ করেন যে, "স্বল্প সময়ের নোটিশে মুসলিম বাহিনীর সংগে যোগ দেওয়ার জন্যে তৈরী থাক। তিনি মদীনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে আঁকাবাঁকা পথ ধরে অগ্রসর হন। যাত্রাপথে বিভিন্ন গোত্রের নির্বাচিত সৈন্যরা দলে দলে রাসূলে করীম (সঃ)-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সংগে যোগ দেয়। এভাবেই মুসলিম বাহিনী বিশাল আকার ধারণ করে এবং স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় রেজিস্টারে তালিকা-ভুক্ত সৈন্য সংখ্যা ছিল চিন্তার বাইরে।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন

ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবে এ ধরনের একটি রেওয়াজ প্রচলিত ছিল যে, একটি অভিযানে সেনাবাহিনী যত সম্পদ দখল করবে তার এক-চতুর্থাংশ চলে যাবে প্রধান সেনাপতির ভাগে। তাছাড়া সাধারণ লুটতরাজের পূর্বে যা কিছু আটক করা হতো এবং সম্পদের যে অংশ ভাগবাটোয়ারা করা সম্ভব হতো না তাও চলে যেতো প্রধান সেনাপতির অধিকারে। মদীনায় উপস্থিতির পর পরই রাসূলে করীম (সঃ)-কে এ ব্যাপারে নতুন বিধান জারি করতে হলো। তাঁর জারিকৃত বিধি ব্যবস্থাগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

শত্রুর নিকট থেকে আটক করা বিষয়-সম্পদ পুড়িয়ে ফেলার ব্যাপারে বাইবেলে যে বিধান ছিল তিনি তা রহিত করেন। (ডিউটারোনোমী, ত্রয়োদশ অধ্যায় ১৬) তিনি বন্ধ করে দিলেন আটক করা সম্পদের প্রধান সেনাপতির

অংশ প্রাপ্তির ব্যাপারে ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবের প্রচলিত প্রথাকে। এরপর থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে একজন সাধারণ সৈনিক যা পান, প্রধান সেনাপতিও তাই পেয়ে থাকেন। উপরন্তু তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অংশকে কমিয়ে দেন। এটাকে স্থির করে দেন এক-চতুর্থাংশের পরিবর্তে এক-পঞ্চমাংশ। অবশিষ্ট যা থাকে অর্থাৎ পাঁচ ভাগের চার ভাগকে বিলিবন্টন করে দেন অভিযানে অংশ-গ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে। যুদ্ধলব্ধ সম্পদে সরকারের অংশ কমিয়ে সৈন্য-দের অংশ বৃদ্ধি করায় নির্দলীয় পেশাদার যোদ্ধারা হয়তো এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। সম্ভবত তারা ইসলামের শত্রুদের পক্ষ অবলম্বন করার পরিবর্তে রাসূলে করীম (সঃ)-এর পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করার প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে। সে কারণেই মুসলমানদের বিভিন্ন অভিযানে অনেক অমুসলিম যোদ্ধা সক্রিয় অংশ-গ্রহণ করে। রাসূলে করীম (সঃ) আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক আইনের সংস্কার করেন। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ব্যক্তিগতভাবে আটক করা হতো। একজনের আটক করা সম্পদে অন্য সংগী-সাথীদের কোন হিসাব থাকতো না। ফলে যোদ্ধারা আইন-শৃঙ্খলার পরিবর্তে বিষয়-সম্পদ আটক করার প্রতি বেশি আগ্রহশীল থাকতো। তারা সেনাবাহিনী, গোত্র বা সমাজের স্বার্থকে উপেক্ষা করে ব্যক্তি স্বার্থকে বড় করে দেখতো। তদস্থলে মুসলিম আইন এ বিধান চালু করলো যে, যুদ্ধলব্ধ সমস্ত সম্পদ কেন্দ্রীয়ভাবে মওজুদ করা হবে এবং সেনাবাহিনীর সকল সৈন্যদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করা হবে। একজন যোদ্ধা ব্যক্তিগতভাবে কি পরিমাণ সম্পদ আটক করলো তা বিবেচ্য বিষয় নয়। অথবা একজন যোদ্ধার যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে প্রকৃতই যুদ্ধ করা, যুদ্ধের ময়দানে রিজার্ভ বাহিনীর একজন সদস্য হিসাবে অবস্থান গ্রহণ অথবা সেনা নায়কের নির্দেশে অন্য কোন দায়িত্ব পালন এ বিষয়গুলো ছিল একেবারেই গৌণ।

কোন অভিযানের সময় যদি যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রু সম্পদ আটক করা হয় তাহলে ঐ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ ভাণ্ডারে জমা হবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ যে সরকারী ভাণ্ডারে জমা হবে তা থেকে কারা উপকৃত হবেন সে সম্পর্কে কুরআনুল করীমে স্পষ্ট বিধান রয়েছে। বলা হয়েছে য়াতীম, দরিদ্র এবং যুদ্ধে শাহাদাত-প্রাপ্ত যোদ্ধার পরিবার বর্গের এই সম্পদ ভোগের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই অগ্রাধিকার থাকবে। (দ্রঃ ৮ঃ ৪১) কিন্তু রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিষয়টি কোন-ক্রমেই অবহেলা করা যায় না। সে কারণেই রাষ্ট্রের নিয়মিত রাজস্ব আয়

এবং যুদ্ধলব্ধ অনিয়মিত ও সাময়িক আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণকে রাসূল (সঃ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্যে নির্ধারণ করে দেন। কুরআনুল করীমে (৯ঃ ৬০) বাজেট তৈরীর মূল রীতিনীতিগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর সামরিক প্রস্তুতির বিষয়টিকে রাষ্ট্রের রাজস্ব ব্যয়ের খাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ আশ শায়বানী শরাহ আস্ সিয়ারুল কবীর গ্রন্থে এ বিষয়ে চমৎকার একটি বিবরণ দিয়েছেন। (দ্বিতীয় খণ্ড ২৫৫-৬) তাঁর বর্ণনা থেকে মোটামুটি স্থায়ী প্রকৃতির সামরিক বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে জানা যায়। পরবর্তী সময়ে মুসলিম রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সংগে সংগতি রেখে খলীফা হযরত উমর (রাঃ) এ বিভাগটিকে সুসংগঠিত করেন এবং এ বিভাগটি 'দিওয়ান' হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করে। শায়বানীর বর্ণনাটি মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

এই আইনের ভিত্তি এখান থেকে এসেছে যে, বনু মুসতালিক অভিযানের সময় রাসূলে করীম (সঃ) মাহমিয়া ইবনে জায্ আয্ যুবায়দীকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করেন। তাছাড়া মাহমিয়ার উপর অর্পণ করেন সরকারের পাওনা এক-পঞ্চমাংশের দেখাশুনার দায়িত্ব। রাষ্ট্রের নিয়মিত রাজস্ব আয়কে পৃথক করা হলো এবং সেগুলোর খরচের খাতও ছিল ভিন্ন। তাছাড়া শত্রুদের নিকট থেকে যে বিষয়-সম্পদ আটক করা হতো সেখান থেকে কারা সুবিধা পাবে তাও নির্ধারিত ছিল। রাসূলে করীম (সঃ) রাজস্ব অর্থ থেকে য়াতীম, বৃদ্ধ এবং অসহায়দের সাহায্য দিতেন। কিন্তু একজন য়াতীম যখন যৌবনে পা রাখতো এবং সামরিক বিভাগে কাজ করতো তখন সে রাজস্ব ভাণ্ডারের পরিবর্তে সামরিক বিভাগ থেকে সাহায্য পেত। কিন্তু বয়োঃপ্রাপ্তির পর সামরিক বিভাগে কাজ করলে সে রাষ্ট্রের রাজস্ব থেকেও কোন অর্থ গ্রহণ করতে পারতো না। তখন তাকে নিজেকে নিজের জীবিকা উপার্জন করতে বলা হতো।

অবশ্য রাসূলে করীম (সঃ) কখনো কারও আবদার উপেক্ষা করতে পারতেন না। একবার দুজন লোক তাঁর কাছে এলো এবং বনু মুসতালিকের যুদ্ধের সময় সরকার যুদ্ধলব্ধ সম্পদের যে এক-পঞ্চমাংশ অর্জন করেছিল তা থেকে সাহায্য দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করলো। রাসূল (সঃ) উত্তরে বললেন, যদি তোমরা ইচ্ছা পোষণ কর তা হলে তোমাদের কিছু দেব। তবে তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, যারা ধনী ও সক্ষম এবং যাদের উপার্জন করার সামর্থ্য আছে এই সম্পদ থেকে তাদের সুবিধা গ্রহণের কোন অধিকার নেই।

যুদ্ধের উপকরণ

রাসূলে করীম (সঃ)-এর আমলে যুদ্ধের সময় নিম্নে উল্লিখিত অস্ত্রসমূহ ব্যবহৃত হতো বলে জানা যায়। অবশ্য এ তালিকাকে কোনক্রমেই পূর্ণাংগ বলা যাবে না। অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে তীর ও ধনুক, বর্শা ও বল্লম, তলোয়ার, মানজানিক বা পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র, ঢাকনাযুক্ত এবং চালান উপযোগী বিভিন্ন ধরনের গাড়ি, ঢাল, বর্ম। কখনো কখনো নিগ্রোরা বিশেষ ধরনের কতগুলো অস্ত্র ব্যবহার করতো। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, উহুদের যুদ্ধের সময় ওয়াহশী অনেক দূর থেকে অতি দ্রুত ঘূর্ণায়মান একটি অস্ত্র নিক্ষেপ করে রাসূলে করীম (সঃ)-এর চাচা হামজা (রাঃ)-কে শহীদ করেছিল। উপরে যে আবরণযুক্ত গাড়ির কথা বলা হয়েছে সেগুলো দেয়াল ধ্বংস বা ভেংগে ফেলার কাজে ব্যবহৃত হতো। সৈন্যরা ঢাকনাযুক্ত গাড়ির মধ্যে থেকে খনন কার্য চালাতো এবং গাড়ির ঢাকনা তাদেরকে শত্রু সেনাদের তীর, বর্শা ও পাথরের আঘাত থেকে নিরাপদে রাখতো। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, রাসূল (সঃ) কেবলমাত্র সেনা শিবিরের চারপাশে পরিখাই খনন করেননি বরং শত্রুর প্রতি পাথরের কৃত্রিম বস্তুও নিক্ষেপ করেছিলেন। এমনকি শত্রুকে লক্ষ্য করে কাঁটা-যুক্ত গাছের ডালপালা ছোঁড়ার ব্যবস্থাও তাঁর ছিলো। মুসলমানদের আক্রমণ করতে আসা শত্রু সেনাদের চলাচলকে বিপদসংকুল করে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য। সে আমলে রাত্রিকালীন আক্রমণের কৌশলও তাদের জানা ছিল।

একটি স্থানীয় কারখানা থেকে প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র সরবরাহ পাওয়া যেতো। বিদেশ থেকে বিশেষভাবে রোমান সাম্রাজ্য থেকে এ সমস্ত যন্ত্রপাতি আনার ব্যাপারে বাধা-নিষেধ ছিল। এতদসত্ত্বেও কখনো কখনো সম্ভব হলে এগুলো বিদেশ থেকে আমদানী করা হতো। লৌহ কর্মের জন্যে বনু আই-কাইন গোত্রের সুখ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত। ইয়াসরীবের তীরও ছিল খুবই প্রসিদ্ধ। তলোয়ারের ক্ষেত্রে সিরিয়ার মাশরাফী এবং ভারতের মুহান্না ছিল সকলেরই পছন্দনীয়।

যুদ্ধ প্রাণী হিসাবে ঘোড়া ছিল ভারী চমৎকার। আক্রমণ এবং পশ্চাদ-পসারণের কাজে ঘোড়ার ব্যবহার ছিল সবচেয়ে বেশি। উট ব্যবহৃত হতো মানুষ এবং মাল-সামানা পরিবহনের কাজে। এর সংখ্যাও ছিল পর্যাপ্ত। উটের শক্তি, অসাধারণ কতগুলো গুণাবলী এবং সহিষ্ণুতা আরব বাহিনীকে

অস্বাভাবিক গতিশীলতা দান করে। এই গতি পার্শ্ববর্তী রোমান এবং পারস্য বাহিনী অপেক্ষা দ্রুত ছিলো।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুসলিম বাহিনীর অস্ত্রের মওজুদ ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠেছিলো। এর উৎস ছিলো দুটি—যুদ্ধের সময়ে শত্রু সম্পদ আটক এবং বাজার থেকে ক্রয়।

প্রশিক্ষণ

রাসূলে করীম (সঃ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করতেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কতগুলো বাস্তব ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। মানুষ এবং পশুগুলোর মধ্যে হরহামেশাই দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। এ সব অনুষ্ঠানে রাসূলে করীম (সঃ) ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতেন এবং নিজ হাতে পুরস্কার বিতরণ করতেন। মদীনার মসজিদে আস-সাবাক বা দৌড়ের মসজিদ অদ্যাবধি তার স্মৃতি বহন করছে। এখানে বসেই তিনি দৌড় প্রতিযোগিতা এবং কোন্ ঘোড়াগুলো বিজয়ী হয় তা অবলোকন করতেন। তিনি তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যবস্তু ভেদ করার মতো বিষয়ের অনুশীলনের উপরও সার্বক্ষণিক গুরুত্ব আরোপ করতেন।

রাসূলে করীম (সঃ)-এর জীবনীকারগণ আরো কতগুলো অনুশীলনের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে পাথর নিক্ষেপ, কুস্তি এবং এজাতীয় আরো কতগুলো বিষয়। সাঁতারেও যথেষ্ট উৎসাহিত করা হয়েছে। এমনকি বাল্য বয়সে রাসূল (সঃ) নিজেও সাঁতার শিক্ষা করেন।

প্রশাসন

প্রকৃত অথবা সম্ভাব্য শত্রু সম্পর্কে প্রয়োজনীয় খবরা-খবর সংগ্রহ করার জন্যে একটি তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা চালু করেন। বিভিন্ন শত্রু শিবিরের সংবাদ-বাহক এবং গোয়েন্দাদের মাধ্যমেও তিনি সংবাদ সংগ্রহ করতেন।

অভিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতার আলোকে অধিনায়ক নির্বাচন করা হতো। ব্যক্তির কঠোরতা ও সাধনার পরিবর্তে সামরিক দক্ষতাই ছিল এক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয়। প্রতি অভিযানেই অধিনায়ক পরিবর্তন করা হতো। ফলে মুসলিম বাহিনীতে অভিজ্ঞ এবং সামর্থ্যবান অফিসারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

রাসূলে করীম (স) যখন নিজে কোন বাহিনী পরিচালনা করতেন, তখন তাঁর সংগে একটি মিলিটারি কাউন্সিল থাকতো। কাউন্সিলের সংগে আলাপ-আলোচনা করেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। সেনাপতিগণের প্রতি তাঁর নির্দেশগুলোর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠতো পূর্ণ বিচক্ষণতা। তাছাড়া ধর্মের আত্মিক এবং পার্থিব উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি যে শিক্ষা দিতেন—যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়গুলো ছিল সেই শিক্ষার সংগে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, অপ্রয়োজনীয় রক্তপাতকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণের বিবরণীতে এসব নির্দেশাবলীর অনেকগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে।

রাসূলে করীম (সঃ) প্রচার কার্যক্রমের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। আরবরা ছিল কবিতা প্রিয় বিশেষ করে ব্যংগ-বিদ্রূপাত্মক কবিতাগুলোর জনপ্রিয়তা ছিল সবচেয়ে বেশি। এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেই রাসূল (সঃ) ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিভাবান কবিদের সরকারীভাবে নিয়োগ করতেন। এ প্রসংগে তার একটি প্রসিদ্ধ হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে, হাসান ইবনে সাবিত যখন তাঁর মেধাকে ইসলাম এবং নবীর সেবায় নিয়োগ করলো, তখন সর্গীয় চেতনা তার কবিতাগুলোকে আরো জীবন্ত করে তুললো। তাঁর কবিতাগুলো শত্রুকে বিচলিত করতো তীর অপেক্ষা আরো তীব্র ও তীক্ষ্ণভাবে।

এটা সুস্পষ্ট যে, রাসূলে করীম (সঃ)-এর সামরিক জীবনে মানবিক আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ, সাধারণ মানুষের অনুসরণ-যোগ্য একটি জীবন পদ্ধতি রচনা করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। প্রসংগক্রমে এখানে কখনো শত্রুকে ক্ষমা করা কখনো আবার শাস্তি প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। শত্রুকে ক্ষমা করে দেওয়ার অসংখ্য ঘটনার মধ্যে ইতিপূর্বে আমরা মক্কা বিজয়ের সময় মক্কাবাসীদের সংগে যে তিনি কিরূপ ব্যবহার করেছেন তা উল্লেখ করেছি। দেখেছি যে, শত্রুকে ক্ষমা করে দেওয়ার ফলাফল ছিল খুবই চমকপ্রদ। এখানে আরেকটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার একটি অভিযানে রাসূলে করীম (সঃ) মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। শত্রুপক্ষকে ছত্রভংগ করে দেওয়ার পর একদিন তিনি বিশ্রাম করছিলেন। আশে-পাশে সংগী-সাথী কেউ ছিলেন না। নিকটস্থ পাহাড়ের গোপন স্থান থেকে শত্রু সেনাপতি তাকে দেখতে পায় এবং খোলা তলোয়ার হাতে অতি সংগোপনে রাসূলে

করীম (সঃ)-এর কাছে চলে আসে। ইমাম বুখারী, ইবনে হিশাম, তাবারী এবং ইবনে হাজম-এর মতে আর-রাজী অভিযানের সময় ঘটনাটি ঘটে এবং শত্রু-পক্ষের সেনাপতি ছিলেন গাওরাত ইবনে আল হারিস আল মুহারিবী। অবশ্য ইবনে সা'দ, বালাযুরী এবং মাকরিজীর বর্ণনা অনুসারে জুআমর অভিযানের সময় ঘটনাটি ঘটেছিল এবং দু-তুর ইবনে আল হারিস ছিল শত্রুপক্ষের সেনা-পতি। ব্যক্তি বা স্থানের নাম যাই হোক না কেন, শত্রু পক্ষের সেনাপতি প্রিয়-নবী (সঃ) -এর কাছে এসে চিৎকার করে বললো, "ওহে মুহাম্মদ! এমন কে আছে যে, এখন আমার হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করে?" লোকটির গলাফাটা চিৎকারে প্রিয়নবী (সঃ) জেগে উঠেন এবং শান্তভাবে জবাব দিলেন, "মহান আল্লাহ্।" প্রিয়নবী (সঃ)-এর এমন শান্তভাব এবং পরম বিশ্বাস বেদুঈন সেনাপতিকে এতোখানি বিচলিত করলো যে, সে রীতিমত কাঁপতে শুরু করে। কাঁপতে কাঁপতে এক সময় তার হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ে। তখন রাসূলে করীম (সঃ) সেই তলোয়ারটি তুলে নিয়ে বললেন, "এখন বলো, আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে?" জবাব এলো 'কেউ না'। প্রিয়নবী (সঃ) তাকে ক্ষমা করলেন এবং তলোয়ার ফিরিয়ে দিলেন। এ ঘটনাটি বেদুঈন সেনাপতিকে এতোখানি বিমোহিত করলো য, তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম কবুল করলেন এবং নিজ থেকেই নতুন দীনের প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। অবশ্য এ সব ক্ষেত্রে প্রিয়নবী (সঃ) কুরআন মজীদের সেই মহান নীতিকে অনুসরণ করতেন—ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরংগ বন্ধুর মতো (৪১ ঃ ৩৪)। এটাকে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ বলা যেতে পারে। অন্যান্য যুদ্ধের মতো এখানেও কখনো সফলতা, কখনো বা ব্যর্থতার ঝুঁকি নিতে হয়। কখনো কখনো রাসূলে করীম (সঃ) শত্রুর অজান্তেই এ ধরনের ঝুঁকি নিতেন। ইবনে আল জাওজী বর্ণনা করেছেন যে, সালামাহ্ ইবনে আল আকওয়া একবার ফাযারা গোত্রের একটি অশ্বারোহী দস্যু দলের পশ্চাদ্ধাবন করেন। তাও আবার একাকী এবং পায়ে হেঁটে। রাসূলে করীম (সঃ) কিছু সংগী-সাথীসহ তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার পূর্বেই সালামাহ্ তাদের নিকট থেকে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির অর্ধেকটা পুনরুদ্ধার করেন। এদিকে দস্যুরাও অবসাদ ও পিপাসায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নিঃশেষ হয়ে আসে তাদের শক্তি। সালামাহ্ প্রিয়নবী (সঃ)-এর নিকট একটি অশ্বের জন্যে আবেদন করেন এবং ওয়াদা করেন যে, দস্যুদের গোটা দলকেই তিনি নির্মূল করে

দেবেন। জবাবে রাসূলে করীম (সঃ) বললেন, তুমি তাদের পরাস্ত করেছ; সুতরাং তাদেরকে প্রশ্রয় দাও। (আল ওয়াফা, পৃঃ ৬৯৬) এবার এমন একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক যখন ক্ষমা প্রদর্শনের পরও তেমন একটা সুফল পাওয়া যায় নি। ঘটনাটি আবূ আজজাহকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল। বদরের যুদ্ধের সময় তাকে বন্দী করা হয়েছিলো। সে এতটা গরীব ছিল যে, মুক্তিপণ পরিশোধ করতে পারছিলো না। তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে এমন কোন সচ্ছল বন্ধু-বান্ধবও তার ছিল না। রাসূলে করীম (সঃ) দয়াপরবশ হয়ে এ চুক্তিতে মুক্ত করে দিলেন যে, সে আর কোন দিন ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নেবে না। কিন্তু সে তার ওয়াদার বরখেলাপ করে ইসলামের বিরুদ্ধে উহূদের যুদ্ধে অংশ নেয়। পুনর্বার তাকে বন্দী করা হলো। এবার রাসূলে করীম (সঃ) উক্ত বন্দীকে হত্যা করার বিধান দিলেন। (ইবনে হিশাম পৃঃ ৪৭১, ৫৫৬, ৫৯১) শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত ঘটনাগুলোর মধ্যে উকবাহ ইবনে আবূ মু'আইত-এর ঘটনাটিও উল্লেখ করা যেতে পারে। সে ছিল ইসলামের একজন ঘোরতর শত্রু। সারাক্ষণ সে প্রিয়নবী (সঃ)-কে ত্যক্ত বিরক্ত করার তালে থাকতো। এমনকি সে বিভিন্ন সময়ে প্রিয়নবী (সঃ)-কে হত্যা করার পাঁয়তারা করতো। বদরের যুদ্ধের সময় সেই উকবা ইবনে আবূ মু'আইত মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো। রাসূলে করীম (সঃ)-এর নির্দেশে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। (ইবনে হিশাম) রাসূলে করীম (সঃ)-এর সুন্নত থেকে ফকীহ এবং সামরিক অধিনায়কগণ এই শিক্ষা পেলেন যে, অবস্থার প্রেক্ষিতে কাউকে ক্ষমা বা শাস্তি দেওয়ার সুযোগ তাদের আছে।

মুজাহিদগণ এমন এক অপ্রতিরোধ্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন যে, তাদের কাছে যুদ্ধ শুধু পেশাগত দায়িত্ব পালনই ছিলো না, বরং তা ছিলো তাদের নিকট ঈমানী দায়িত্ব। তাঁরা একে গ্রহণ করতেন নিজস্ব ও ব্যক্তিগত অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে।

যুদ্ধ অভিযানের প্রাক্কালে এবং যুদ্ধ চলাকালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মুজাহিদগণের নিকট আল্লাহ্ কর্তৃক ওয়াদাকৃত আখিরাতের পুরস্কারের কথা ঘোষণা করতেন। চরমতম যুদ্ধের সংকট মুহূর্তে সৈনিকদের সামনে তুলে ধরতেন ব্যক্তিগত সাহসিকতা ও বীরত্বের নিদর্শন। তাঁর বিশ্বস্ত সাহাবায়ে কিরামের আবেগময় ও হৃদয়গ্রাহী ঘটনাসমূহ ইতিহাসের পাতায় ভাস্বর হয়ে রয়েছে। মাহমুদ গানদুয নামে এক অবসরপ্রাপ্ত তুর্কী সামরিক

অফিসার বন্ধু তার পুস্তকে প্রিয়নবী (সঃ)-এর সমর কৌশলের সংগে আধুনিক সমরকৌশল নীতির একটি সূক্ষ্ম তুলনামূলক বিবরণ দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আধুনিক সমর নীতির তথাকথিত 'মসকোম্‌স' (Mosscomes)-এ যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে প্রিয়নবী (সঃ)-এর সমর নীতির। মসকোম্‌স-এর অর্থ হলো গতিশীলতা, প্রতিরক্ষা, অতর্কিত আক্রমণ, নিরাপত্তা, সহযোগিতা, নির্দিষ্ট লক্ষ্য, জনশক্তি, বাহিনীর যথাযথ ব্যবহার এবং সরলতা। (Mosscomes-এ হয় ঃ M—movement অর্থাৎ কৌশলপূর্ণ গতি-বিধি, O—offensive অর্থাৎ আক্রমণাত্মক, S—Surprise অর্থাৎ অতর্কিতে আক্রমণ, S—Security অর্থাৎ নিরাপত্তা, C—cooperation অর্থাৎ সহযোগিতা, O—Objective অর্থাৎ লক্ষ্য, M—Mass অর্থাৎ জনশক্তি, E—economy of force অর্থাৎ সেনাশক্তির মিতব্যয়, S—Simplicity অর্থাৎ সারল্য)। তিনি আরো বিবরণ দিয়েছেন নবী করীম (সঃ)-এর পরিস্থিতির মূল্যায়ন প্রক্রিয়া, ক্ষিপ্রতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি এবং সেনাবাহিনী পরিচালনার নেতৃত্ব কৌশল সম্পর্কে। যে সমস্ত উপাদান ও তথ্যাদি পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে তুলে ধরা হয়েছে তা থেকে একজন সাধারণ পাঠক সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, সমর-নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মহানবী (সঃ) যা করেছেন, আধুনিক সমর বিদ্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও পারদর্শী একজন সমর নায়কও তারচেয়ে অধিকতর উন্নত কিছু করতে পারবেন না। রাসূলে করীম (সঃ)-এর যুদ্ধ পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা ছিলো না। তিনি কোন প্রশিক্ষণও নেননি। তবু তাঁর জীবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যে, চরম দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মুকাবিলায় তিনি সমর বিজ্ঞানের যে নীতি অনুসরণ করেন তা খুবই চমকপ্রদ। বিশেষ করে উহুদ ও হুনায়নের যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে তিনি যেভাবে যুদ্ধের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, পরিস্থিতিকে নিয়ে এসেছিলেন মুসলমানদের অনুকূলে তা সমর ইতিহাসে একটি বিরল দৃষ্টান্ত। আর সে কারণে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এবং কোনরকম অতিরঞ্জন ব্যতিরেকে নবী করীম (সঃ) ঘোষণা দিতে পেরেছিলেন যে—'আমি শত্রুকে পরাজিত করেছি শুধুমাত্র ভয়ের সঞ্চার করে যা এক মাসের সফরে যেয়ে পৌঁছেছে। ইসলামের ইতিহাসের যুদ্ধ-গুলোতে রক্তপাত হতো খুবই সামান্য। কিন্তু এগুলো ছিল সিদ্ধান্তমূলক। এর প্রভাব থাকতো খুবই সুদূর প্রসারী। আর যুদ্ধের পরে ব্যাপক পরিবর্তন আসতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন যুদ্ধ আর দেখা যায় না। ইসলামের নবীর যুদ্ধ পরিকল্পনা ও পরিচালনার পশ্চাতে শোষণ

বা পররাজ্য গ্রাস ও প্রভুত্ব স্থাপন করা কোন উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তার লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র জরাগ্রস্ত মানবতাকে পুনরুজ্জীবিত ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা। এই মহান আদর্শের আলোকে ইসলামের 'যুদ্ধ'সমূহের মহত্ত্বকে বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিশ্লেষণ করতে হবে সেই মহামানবকে যিনি আদর্শ যুদ্ধের একটি নমুনা তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে।

ইফাবা. (রা.) ৯০-৯১/অঃ সঃ ৪৩১০—৫২৫০/৩১-১-৯১ ইং